পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শাহীন সামাদ

লাকি আখন্দ

এম আর আখতার মুকুল

মোহাম্মদ রফিক

কামাল লোহানী

আবদুল জব্বার

নাসরিন আহমেদ

মৃণাল ভট্টাচার্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

ডালিয়া নওশীন

রফিকুল আলম

তপন মাহমুদ

ফকির আলমগীর

বুলবুল মহালনবীশ

মোতাহের হোসেন

তিমির নন্দী

বেলাল মোহাম্মদ

আসাদ চৌধুরী

আবুল কাশেম সন্দ্বীপ

কাজী হাবিব উদ্দিন আহমদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মুস্তাফা মনোয়ার

সিকান্দার আবু জাফর

ফয়েজ আহমেদ

আবদুল গাফফার চৌধুরী

নির্মলেন্দু গুণ

কাদেরী কিবরিয়া

ইন্দ্রমোহন রাজবংশী

অজিত রায়

জয়ন্তী লালা

প্রবাল চৌধুরী

কল্যাণী ঘোষ

নমিতা ঘোষ

আপেল মাহমুদ

সমর দাস

মাধুরী চ্যাটার্জী

সুবল দাশ

মলয় গাঙ্গুলী

শেখ সাদী

মান্না হক

মকছেদ আলী সাঁই

রূপা ফরহাদ

রঙ্গলাল দেব চৌধুরী

আলী যাকের

সৈয়দ হাসান ইমাম

আশফাকুর রহমান

সুজেয় শ্যাম

শহিদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন শব্দসৈনিক

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে এ শব্দ সৈনিকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিকামী মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস উজ্জীবিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১
Poultry Rearing and Farming -1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

কৃষিবিদ মো: শাহজাহান কবির
কৃষিবিদ পবন কুমার সরকার
মুহাম্মদ কামরুল হাসান ভূইয়া
মির্জা মোহাম্মদ তৌহিদুল করিম

শেখ শাহবাজ রিয়াদ (প্যাডাগগ)
প্রকৌশলী মো: এনায়েত করিম (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

কৃষিবিদ মো: মুনজুর হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২২

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে : প্রমা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, মোগলনগর, তুষারধারা-১৩৬২, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৩টি ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর পোল্ট্রি	১-৩৪
দ্বিতীয়	ব্রয়লার মুরগি পালন	৩৫-৭৪
তৃতীয়	ব্রয়লার মুরগির খাদ্য	৭৫-১০৫
চতুর্থ	ব্রয়লার মুরগির রোগ-ব্যাধি	১০৬-১৩৬
পঞ্চম	ব্রয়লার বিপণন	১৩৭-১৫০
দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	লেয়ার মুরগি পালন	১৫৩-১৯১
দ্বিতীয়	লেয়ার মুরগির খাদ্য	১৯২-২১৬
তৃতীয়	লেয়ার মুরগির রোগ-ব্যাধি	২১৭-২৮৯
চতুর্থ	ডিম উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন	২৯০-৩১৭
	তথ্য উৎস	৩১৮

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১
Poultry Rearing and Farming -1

প্রথম পত্র (বিষয় কোড : ৮০১৩)
নবম শ্রেণি

অধ্যায়-১

হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর পোল্ট্রি

(Health, Safety and Ethics for Poultry)

যেকোনো পোল্ট্রি ফার্মে নিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। পোল্ট্রি ফার্ম পরিচালনার সময় সতর্কতার সাথে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার না করলে দুর্ঘটনার যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। দুর্ঘটনার কারণে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্ঘটনা কবলিত একজন দক্ষ কর্মী আহত বা নিহত হলে তার পরিবার, দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজ করার সময় সকল দুর্ঘটনা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক কর্মীর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। ফার্মের দক্ষ কর্মী এবং যন্ত্রপাতি উভয়ই মূল্যবান সম্পদ। দক্ষ কর্মীগণ সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে বিভিন্ন কার্মে কাজ করে মানসম্মত লাভজনক ডিম ও মাংস উৎপাদন করবে এটাই কাম্য। অন্যথায় সতর্কতার অভাবে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মীদের দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি ও ফার্মের ক্ষয়ক্ষতি অলাভজনক উৎপাদনের কারণ হয়, এটা আমাদের কাম্য নয়। **"Safety First."** কাজের পূর্বে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় যেকোনো দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- Occupational Safety and Health (OSH) নীতি এবং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা অনুশীলন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারব
- OSH ও Hezard সনাক্ত করতে এবং এর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব
- জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারব
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নীতি ও কার্যপ্রণালী চিহ্নিত করতে পারব

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারব
- পেশাগত কাজে সম্ভাব্য Hezard & Risk চিহ্নিত করতে পারব।

১.১ পোল্ট্রি ওয়ার্কশপে সতর্কতাসমূহ (Poultry workshop warning):

আমাদের আশেপাশে অনেক পোল্ট্রি ফার্ম দেখতে পাই। এই ধরনের ফার্মগুলো হতে পারে লেয়ার ফার্ম, ব্রয়লার ফার্ম, টার্কি ফার্ম, ডাক ফার্ম। এই সকল ফার্ম গুলোতে হ্যান্ড টুলস, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইনকুবেটর, মিট কাটার মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকে যা ফার্মে ব্যবহার করা হয়। ফার্ম বা ওয়ার্কশপে প্রবেশ হতে শুরু করে ত্যাগ করা পর্যন্ত কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিরাপদে কাজ করা ও নিরাপত্তা রক্ষায় এসব নিয়ম সতর্কতার সাথে মেনে চলা প্রয়োজন।

চিত্র- ১.১ পোল্ট্রি ওয়ার্কশপে সতর্কতাসমূহ

ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? ওয়ার্কশপগুলোতে নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ আছে কী?

চিত্র- ১.২ পোল্ট্রি ওয়ার্কশপে সতর্কতাসমূহ

ছবি দেখেই বুঝতে পারছ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কাজ করার আগে ও পরে কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে।

১.২ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধিসমূহ

১.২.১ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারাসমূহঃ

ধারা- ৫১ ও বিধি-৪০: কর্মক্ষেত্রের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোন নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোনো জঞ্জাল হতে সৃষ্ট দূষিত বাষ্প হতে মুক্ত রাখতে হবে এবং বিশেষ করে-

(ক) প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিঁড়ি, যাতায়াতের পথ হতে প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ও আবর্জনা ঢাকনা দেওয়া বাক্সে অপসারণ করতে হবে, যাতে উক্ত আবর্জনা দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিস্তার করতে না পারে; ধাতব পদার্থ, উৎকট গন্ধময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা ও মেডিকেল আবর্জনা ভিন্ন ভিন্ন বাক্সে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রের মেঝে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন অবস্থা ভেদে এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে পানি দ্বারা ধুইতে হবে এবং প্রয়োজনে ধোয়ার কাজে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। অবস্থাভেদে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে ভিজা কাপড় দ্বারা মেঝে ধুয়ে দিতে হবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে কোনো মেঝে এমনভাবে ভিজে যায় যে, এর জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ধারা ৫১(গ) বিধি ৪২ অনুযায়ী কর্মকক্ষ ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে-

(১) উক্ত মেঝে অবশ্যই অভেদ্য পদার্থ (Impervious material) দ্বারা নির্মিত হতে হবে;
(২) উক্ত মেঝের নির্মাণ কৌশল ঢালু বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোনো তরল পদার্থ মেঝেতে জমে থাকতে না পারে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ-
(১) রং অথবা বার্নিশ করা থাকলে, প্রতি তিন বছরে অন্ততঃ একবার পুনরায় রং বা বার্নিশ করতে হবে।
(২) রং অথবা বার্নিশ করা এবং বহি:র্ভাগ মসৃণ হলে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্ততঃ একবার ধারা- ৫১(ঘ) বিধি ৪৩ অনুযায়ী পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্ততঃ একবার চুনকাম বা রং করতে হবে, এবং (ঙ) দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করার তারিখ ধারা ৫১(ঘ) বিধি- ৪৪ অনুযায়ী ফরম- ২০ ব্যবহার করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

ধারা- ৫২ ও বিধি-৪৫ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা থাকতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয় সেখানে এক্সজস্ট ফ্যান (Exhaust Fan) স্থাপন করা যাবে, যাতে সেখানে কর্মীগণ মোটামুটি আরামে কাজ করতে পারেন, এবং যাতে কর্মীগণের স্বাস্থ্য হানি রোধ হয়; আরও শর্ত থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (Dry & Wet) ব্যবস্থা থাকলে বায়ু চলাচলের উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না; ধারা ৫২ (২) অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকক্ষে অন্ততঃ একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোমিটার) সচল অবস্থায় রাখতে হবে এবং ইহা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং কর্মকক্ষের দেয়ালের দৃশ্যমান স্থানে ইহা স্থাপন করতে হবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর প্রয়োজনে কক্ষের দেওয়াল এবং ছাদ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায়, এবং যতদূর সম্ভব কম থাকে।

ধারা- ৫৬: অতিরিক্ত ভীড় (Extra crowd)

(১) কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য হানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত ভীড় করা যাবে না।
(২) উপর্যুক্ত বিধানের হানি না করে, প্রত্যেক কর্মকক্ষে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অন্ততঃ ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার প্রয়োজনে, কোনো ঘরের উচ্চতা মেঝে হতে ৪.২৫ মিটারের অধিক হলে এটি বিবেচনায় আনা হবে না।

(৩) যদি প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোন মালিককে অনুরোধ করে তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকক্ষে এই ধারার বিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ কতজন লোক কাজ করতে পারবেন, সে সম্পর্কে তাকে একটি নোটিশ লটকিয়ে দিতে হবে।
(৪) প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষকে এই ধারার বিধান হতে রেহাই দিতে পারবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থের প্রয়োজনে এই বিধান মানার প্রয়োজন নাই।

ধারা- ৫৭ ও বিধি-৪৯ আলোর ব্যবস্থা (Lighting System):

(১) কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করে বা যাতায়াত করেন, যথেষ্ট স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালাসমূহের উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার রাখতে হবে।

(৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-
(ক) কোনো স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা, অথবা
(খ) কোনো শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়তে পারে বা তার দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকতে পারে, এরূপ কোনো ছায়া সৃষ্টি, প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.৩ স্বাস্থ্য সচেতনতা (Awareness about Health):

১.৩.১ স্বাস্থ্য (Health):

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ফলে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং কাজে অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। ফলে কর্মী এবং মালিক উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কর্মী, প্রশাসন এবং মালিকপক্ষের সকলকেই স্বাস্থ্য সচেতন থাকা একান্ত আবশ্যক।

১.৩.২ স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene):

স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা আমাদেরকে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তার প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুস্থ জীবনই হলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি যেমন ভাবে আমাদের নিরাপদ রাখে তেমনিভাবে অন্যদেরকেও অসুস্থ হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে।

১.৩.৩ পেশাগত রোগসমূহ (Occupational Diseases):

কর্মস্থলের পরিবেশ এবং কাজের ধরনের কারণে কর্মরত অবস্থায় একজন কর্মী যে সকল রোগ বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বা হতে পারে তাদেরকে পেশাগত রোগ বলা হয়।

১.৩.৩.১ পেশাগত রোগের কারণসমূহঃ

কর্মরত অবস্থায় একজন শ্রমিক বা কর্মচারি সাধারণত ৩টি কারণে অসুস্থতায় ভুগতে পারে-

(ক) কর্মস্থলের পরিবেশ সংক্রান্তঃ বিশৃঙ্খলা, উচ্চ শব্দ, উচ্চ তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং ধূলা বালির কারণে একজন কর্মী নানা রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ, যক্ষা, শ্বাসনালীর প্রদাহ ইত্যাদি।

(খ) কর্মী সংক্রান্তঃ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, নির্দেশিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, বয়স ও দৈহিক সামর্থ্যের অভাবেও নানা রকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

(গ) মানসিক অসুস্থতাঃ কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের আচার-আচরণ, বৈষম্য, চাকুরির অনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত কাজের চাপ, দীর্ঘ কর্মঘন্টা, অকারণে হয়রানি, নির্যাতন একজন কর্মীর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে যা তার কর্মক্ষেত্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কমিয়ে দেয় এবং কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ধীরে ধীরে একসময় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিরাপদে খাদ্য প্রস্তুত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলির প্রতিমনোযোগ দিতে হবে-

- পচনশীল খাবারের জন্য বিপজ্জনক অঞ্চল কমিয়ে আনা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাবারগুলি ৩০ মিনিটেরও বেশি সময়ে জন্য বিপদের ঝুঁকিতে থাকা উচিত নয়, তাই আপনি যদি প্রচুর পরিমাণে পচনশীল খাবার প্রস্তুতকরতে চান তাহলে ব্যাচ আকারে তৈরী করে দ্রুত সময়ে শীতলতম স্থানে রাখতে হবে
- খাবারের সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং ওভার হ্যান্ডলিং এড়িয়ে চলতে হবে। খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাবার সরাসরি হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না। সালাদ, স্যান্ডুইস, ঠান্ডা ডসেট খাবার গুলি পরিবেশনের সময় ডিসপোজেবল গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে
- কাঁচা থেকে রান্না করা খাবার স্পর্শ করলে গ্লাভস পরিবর্তন করতে হবে
- কাঁচা এবং রান্না করা খাবারগুলি পৃথকভাবে আলাদা চোপাড় বোর্ড এবং পাত্রে রাখতে হবে যেন কাঁচা এবং তৈরী খাবার হাত, সরঞ্জাম এবং পাত্র থেকে ক্রস-দূষণ (Cross Contamination) না হয়
- রান্না করা খাবারের সরঞ্জামগুলি পরিষ্কারের জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হয় সেগুলো কাঁচা খাবারের সরঞ্জামগুলি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না
- সমস্ত কাঁচা ফল এবং সবজি ধুয়ে নিতে হবে যেন ময়লা, সার ও কীটনাশক দিয়ে দূষিত হতে না পারে
- যেসব ফল ও সবজি কাঁটা পরিবেশন করতে হবে সেগুলোকে সানিটাইজ করার সময় স্যানিটিজিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

- একই সরঞ্জাম দিয়ে আলাদা প্রকারের খাবার প্রস্তুতের সময় প্রতিবার ব্যবহারের আগে ও পরে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে
- প্রস্তুতকৃত খাদ্যগুলি সংরক্ষণ করার সময় ভালোভাবেঢেকে রাখতে হবে

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি রিপোর্ট করা; যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে-

রোগ বহন: (Carrying diseases)

খাদ্য হ্যান্ডলারদের স্বাস্থ্যকর কাজের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পরিষ্কারভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। কেউ অসুস্থ হলে খাবারের সাথে কাজ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে বাড়ির মতো

করে কর্মস্থলে কাজ করা উচিত নয়। রোগ মানুষের দ্বারা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষকে আক্রান্ত করে কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে তারা অসুস্থ কারণ তাদের অসুস্থতার কোনো উপসর্গ নেই। অসুস্থ ব্যক্তির কনভেলসেন্ট ক্যারিয়ার হতে পারে, যার মানে তারা রোগটি বহন করতে পারে এবং ১২ মাস পর্যন্ত মানুষকে সংক্রামিত করতে পারবে। এই কারণগুলোর জন্য সব খাদ্য পরিচালকদের তাদের ডাক্তারকে জানাতে হবে যে তারা খাদ্য শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

ফুড হ্যান্ডেলারদের যদি নিম্নোক্ত সমস্যা দেখা দেয় তবে অবশ্যই তাদের কাজ হতে বিরত থাকতে হবে:

১. তীব্র ডায়রিয়া সহ তীব্র গ্যাস্ট্রোর দ্বারা আক্রান্ত হলে;
২. কলেরা, অ্যামোবিক ডেসেনট্রি বা ব্যাসিলারি দ্বারা আক্রান্ত হলে;
৩. হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত হলে;
৪. টেনলা সোলাম ফিতাকৃমি *(Tape worm)*সংক্রমণের শিকার হলে;
৫. যক্ষ্মার সংক্রামক অবস্থায়;
৬. ঠান্ডা বা ফ্লু এর উপসর্গগুলো দেখা দিলে।

আহত এবং রোগের জন্য রিপোর্টিং করার নীতি (Policies for Reporting Illness and Injury)

খাবারের সাথে কাজ করার আগে খাদ্য সরবরাহকারীদের প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারের কাছে স্বাস্থ্যগত সমস্যার প্রতিবেদন করা উচিত। কাজ করার সময় যদি তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের অবস্থার রিপোর্ট করতে হবে এবং যদি খাদ্য বা সরঞ্জাম দূষিত হয়, তাহলে খাদ্য হ্যান্ডলারের কাজ বন্ধ করতে হবে ও ডাক্তারকে জানাতে হবে।

ফুড হ্যান্ডেলারদের তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করা নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

১. তাদের অসুস্থতা খাবার দূষিত করতে পারে;
২. তাদের অসুস্থতা খাবারের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে ছড়িয়ে পড়তে পারে;

৩. তাদের অসুস্থতার কারণে যদি খাবারের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহলে ব্যবসার সুনাম ক্ষুন্ন হবে এবং কারণ ব্যবসার আর্থিক ক্ষতি হবে।

খাদ্য হ্যান্ডলার যখন খাদ্য বা খাদ্য লেনদেনের উপরিভাগের সাথে কাজ করে তখন কোনো কাটা, পোড়া, ক্ষত, ত্বক সংক্রমণ থাকলে সেটি একটি ব্যান্ডেজের সাথে আবৃত রাখা উচিত। হাতের ব্যান্ডেজের উপর ওয়াটার প্রুফ ও ডিস্পোজবল গ্লোভস পড়া উচিত।

হেপাটাইটিস এ' এর জন্য টিকা (Vaccination for Hepatitis A):

হেপাটাইটিস এ লিভারের একটি রোগ সৃষ্টিকারী প্রদাহ। খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার মুখোমুখি সব খাদ্য বহির্ভূত অসুস্থতাগুলির মধ্যে হেপাটাইটস এ' কেবল একমাত্র যেটি টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। হেপাটাইটিস 'এ' ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য যথাযথ হ্যান্ড ওয়াশ ও ভ্যাকসিন দেওয়া একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সমস্যা থেকে খাদ্য দূষণের ঘটনাগুলো প্রতিবেদন করা-

কর্মচারীর অসুস্থতায় জরুরি পদক্ষেপ	
যদি	তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
খাদ্য হ্যান্ডলারটি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলির একটিতে আক্রান্ত হয়: ১. জ্বর ২. ডায়রিয়া ৩. বমি করা ৪. জ্বর সহ গলা ব্যাথা ৫. জন্ডিস (ত্বক ও চোখের রং হলুদ হওয়া)	তাদেরকে খাদ্যের সাথে কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে
ফুড হ্যান্ডলার কোনো "ফুড বর্ন ইলনেস" এ আক্রান্ত হয়	১. প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের অপসারণ এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবহিত করতে হবে। ২. পরিচালকদের স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মী অসুস্থতার জন্য রিপোর্ট করতে হবে, যদি তারা নিম্ন লিখিত প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় : ক) সালমোনেলা টাইফ (Salmonella typhi) খ) শিগেলা এসপিপি (Shigella spp.) গ) Shiga টক্সিন উৎপাদক ই-কোলাই (Shiga toxin-producig E-col) ঘ) হেপাটাইটিস এ ভাইরাস (Hepatitis A virus) ৩. ম্যানেজারকে স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে কাজ করতে হবে যাতে এটি নিশ্চিত করতে পারে যে হ্যান্ডলার আরোগ্য লাভের পর দ্রুত কাজে ফিরে যেতে পারেন।

১.৪ পেশাগত নিরাপত্তা (Occupational Safety):

যে কোনো প্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদের সাথে কাজ করাকে অকুপেশনাল সেফটি বা পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

পেশাগত নিরাপত্তা তিন প্রকার, যথা-

(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Safety);

(২) যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা (Tools and Machinery Safety);

(৩) কারখানার নিরাপত্তা (Factory Safety)।

১.৪.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Safety):

দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সকল সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শিল্প-কারখানায় কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে।

১.৪.২ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE):

কর্মস্থলে কার্যাবস্থায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীকে বাঁচানোর জন্য যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পিপিই বলা হয়। একজন ব্যক্তির কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সম্ভাব্য ক্ষতি বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়-

ক) চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম:

বিপদের উৎস- ছিটকে আসা রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতব বস্তু, ধুলাবালি, কটিলিস্ট পাউডার, প্রোজেক্টাইল, গ্যাস, বাষ্প এবং রেডিয়েশন। চোখের জন্য পিপিই- নিরাপদ চশমা, গগলস, ফেস শিল্ড (মুখের ঢাকনা), ইত্যাদি।

চিত্র:ফেস শিল্ড

চিত্র:গগলস

চিত্র: নিরাপদ চশমা

চিত্র: ১.৩ চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম

খ) কানের সুরক্ষা উপাদান:

বিপদের উৎস- শব্দের মাত্রা ৮৫ ডিবি এর অধিক হলে শব্দ দূষণ হয়। পিপিই- ইয়ারপ্লাগ, ইয়ার মাফ, কান টুপি ইত্যাদি।

চিত্র: ১.৪ ইয়ারপ্লাগ

গ) মাথার জন্য সুরক্ষা উপাদান:

বিপদের উৎস- উপর থেকে কোনো বস্তু পড়লে, শক্ত বস্তুর আঘাত, ঘূর্ণায়মান বস্তুতে চুল পেঁচিয়ে যাওয়া। মাথার জন্য পিপিই- হেলমেট, মোটা বা স্কীন্ড টুপি।

চিত্র: ১.৫ হেলমেট

ঘ) হেয়ার নেট:

মাথার চুল ঢাকার জন্য হেয়ার নেট। গুরুত্বপূর্ণ হেয়ার নেট দুইটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, মাথার চুলকে খাবার থেকে দূরে রাখে, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখে। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের হাত চুলের স্পর্শ থেকে দূরে রাখে।

চিত্র: ১.৬ হেয়ার নেট

ঙ) শ্বাসযন্ত্র-এর সুরক্ষা উপাদানঃ

বিপদের উৎস- ধুলাবালি, তাপ, অক্সিজেন এর ঘাটতি ইত্যাদি। পিপিই- ফেস মাস্ক, শ্বাসযন্ত্র ইত্যাদি।

চিত্র-১.৭ মাস্ক চিত্র-১.৭ ফেস মাস্ক

চ) শরীর এর জন্য সুরক্ষা উপাদানঃ

বিপদের উৎস- অতিরিক্ত তাপমাত্রা, খারাপ আবহাওয়া, ছিটকে আসা কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতব খন্ড, ভয়ানক গতিতে বায়ু প্রবাহ, সুচালো কোনো বস্তু শরীরে ঢুকে পড়া এবং ধুলাবালি দ্বারা দূষণ। শরীর এর জন্য পিপিই- বয়লার সুট, পিপিই সুট, ভেস্ট, অ্যাপ্রন, পুরো শরীর ঢাকা সুট, জ্যাকেট ইত্যাদি।

পিপিই সুট চিত্রঃ অ্যাপ্রন

চিত্রঃ ১.৮ শরীর সুরক্ষা উপাদান

ছ) হাত এবং বাহু (Arm) এর জন্য সুরক্ষা সরঞ্জামঃ

বিপদের উৎস- অধিক তাপমাত্রা, সুঁচালো কোনো বস্তু, ভারী কোনো বস্তু, বৈদ্যুতিক শক, রাসায়নিক পদার্থ, চর্ম সংক্রামক। পিপিই- হাত মোজা, আর্মলেট এবং মিটস্ (বাহুর আবরণ বিশেষ) ইত্যাদি।

চিত্র-১.৯ হ্যান্ড গ্লাভস

জ) পায়ের পাতার সুরক্ষা সরঞ্জাম:

বুট: পড়ন্ত বস্তু, ধারালো বস্তু, গরম বস্তু এবং পিচ্ছিল বস্তু থেকে পাকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য কর্মীকে অবশ্যই ফুট গার্ড সেফটি সু, বুট এবং লেগিংস ব্যবহার করতে হবে। গরম ধাতু নিয়ে কাজ করার সময় কখনোই খালি পায়ে কাজ করা যাবে না।

বিপদের উৎস-

পিচ্ছিল মেঝে, ভিজা মেঝে, ধারালো বস্তু, পড়ে থাকা বস্তু, রাসায়নিক স্প্লাস এবং অন্যান্য তরল পদার্থ ইত্যাদি। পিপিই- সুরক্ষা জুতা, সুরক্ষা বুট, লেগিংস্ (মোটা কাপড়ের তৈরি পায়ের আচ্ছাদন), স্পাটি (পাতলা আচ্ছাদন) ইত্যাদি। সেফটি সুজ বা নিরাপদ জুতা কর্মীকে ভারী ধাতব উত্তপ্ত গলিত ধাতু, ধারালো বস্তু উপর থেকে পড়ে আঘাত থেকে রক্ষা করে। এমনকি, বৈদ্যুতিক শক্ থেকেও কর্মীকে রক্ষা করে।

চিত্র: গামবুট

চিত্র-সেফটি স্যুট

চিত্র: ১.১০ পায়ের পাতা রক্ষা সরঞ্জাম

চিত্র: ১.১১ সু-কভার

১.৪.৩ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পিপিই (Personal Protective Equipment) ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ধারা ১৯৯৫, অনুসারে সম্ভাব্য ক্ষতির বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিপিই ব্যবহার করতে হবে। দূষণ কমানোর জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদান ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ কোনো সতর্কতা বার্তা ছাড়াই এগুলো মাঝে মধ্যে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। ঝুঁকির উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদানে পিপিই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- ব্যবহারে আরামদায়ক না হতে পারে
- কাজের বাঁধা বা বিপত্তি ঘটায়
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার অন্যান্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে
- দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যয় বহুল হয়

১.৪.৪ পিপিই নির্বাচন

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যা প্রতিটি স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পিপিই যেমনটি হওয়া উচিত-

- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে এবং বিপদের ঝুঁকির উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে
- ব্যবহারকারীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে না
- ব্যবহৃত অন্যান্য পিপিই এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজে ব্যবহার যোগ্য
- আরামদায়ক
- ব্যবহারকারীর যে কোনো ধরনের মেডিকেল শর্তের বাঁধা বা বিপত্তি ঘটাবে না
- বাংলাদেশের আদর্শমান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক হবে

২০২৩

পিপিই নির্বাচনের সময় কর্মীদের সাথে আলাপ করে নিতে হবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং স্টাইলকে বিবেচনা করতে হবে।

১.৪.৫ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার (Proper use of PPE):

পিপিই ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে-

- উৎপাদনকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) ব্যবহৃত হয়।
- পিপিই সঠিকভাবে ফিট হয়।
- কীভাবে এটি ব্যবহৃত হয় তার নির্দেশনার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- যেখানে পিপিই পরিধান করতে হবে সেখানে অবশ্যই একটি চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। যেন কর্মীরা খুব সহজেই মনে করে ব্যবহার করতে পারে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিপিই এর সঠিক ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানা উচিত। যাদের বা যখন এটি জানতে হবে-

- যখন নতুন শ্রমিক কাজ শুরু করে।
- যখন নতুন পিপিই পাওয়া যায়।
- মাঝে মাঝে কর্মীদের স্মরণ করে দিন।

পিপিই পরিধান করার পদ্ধতি (How to Wear PPE):

পিপিই পরিধান করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ধাপ: ১

১. পিপিই পরিধান করার জন্য পরিকল্পনা করা
২. পিপিই সনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় পিপিই সংগ্রহ করুন

চিত্র: ১.১২ পিপিই পরিধানের ধাপ-১

ধাপ: ২

-রাবার বুট পরা। অথবা সু কভার ব্যবহার করা

চিত্র: ১.১৩ পিপিই পরিধানের ধাপ-২

ধাপ: ৩

- অ্যাপ্রন পরিধান করা

চিত্র: ১.১৪ পিপিই পরিধানের ধাপ-৩

ধাপঃ ৪ (ক)

-মুখ ঢাল (Face shield) পরিধান করা

অথবা ধাপঃ ৪ (খ)

-মাস্ক এবং চোখের সুরক্ষা পরিধান করা

চিত্রঃ ১.১৫ পিপিই পরিধান

ধাপঃ ৫

- মাথা বা হেয়ার নেট ব্যবহার করা

চিত্রঃ ১.১৬ পিপিই পরিধান

ধাপঃ ৬ হাত ধোয়া সম্পাদন করা

ধাপঃ ৭ হ্যান্ড গ্লোভস (Hand Gloves) পরিধান করা

চিত্রঃ ১.১৭ পিপিই পরিধান

পিপিই খুলে ফেলার পদ্ধতি

ধাপঃ১

-হ্যান্ড গ্লোভস খুলে ফেলা

-নির্দিষ্ট স্থানে গ্লোভস রাখা

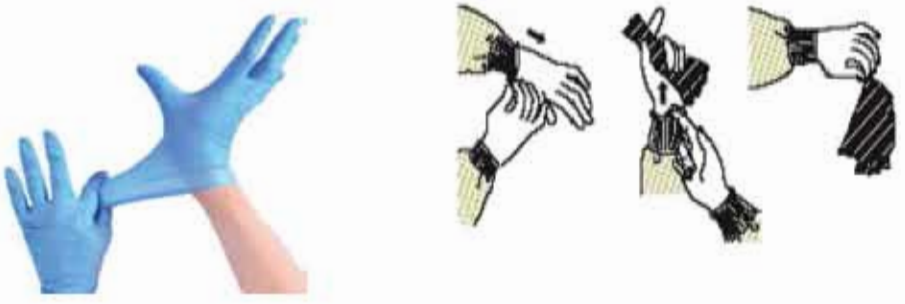

চিত্রঃ ১.১৮ পিপিই খোলা

ধাপ ২

-হাত ধোয়া সম্পাদন করা

চিত্রঃ ১.১৯ হাত ধোয়া

ধাপ ৩-হেয়ার নেট বা ক্যাপ খুলে ফেলা

ধাপ-৪ (ক) মুখ ঢাল পরিধান করা হলে

- মুখ ঢাল অপসারণ-নিরাপদভাবে মুখ ঢাল ব্যবস্থা করা

ধাপ-৪ (খ)চিকিৎসা মাস্ক এবং চোখের সুরক্ষা পরে থাকলে।

-পিছনে থেকে গগলস অপসারণ

-পুনরায় প্রসেসিংয়ের জন্য একটি পৃথক কন্ট্রোরে গগলস রাখা

পিছনে থেকে মাস্ক সরান এবং নিরাপদে ব্যবস্থা করা

ধাপ-৫- অ্যাপ্রন খুলে ফেলা

ধাপ-৬- রাবার বুট অথবা সু-কভার খুলে ফেলা

ধাপ-৭- হাত ধোয়া সম্পাদন করা

ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় যে কোন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা দরকার। যেমন-

- গ্রাইন্ডিং, মেশিনিং এবং চিপিং করতে নিরাপদ চশমা পরিধান করলে ছিটকে যাওয়া চিপস এর আঘাত থেকে চোখকে রক্ষা করা যায়
- অ্যাপ্রন পরিধান না করলে অসতর্কতাবশত ঢিলেঢালা পোশাক কোথাও জড়িয়ে বা পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে
- লম্বা চুল বেঁধে হেলমেট না পড়লে ঘূর্ণায়মান কোন যন্ত্রাংশে জড়িয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

১.৫ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা:

যন্ত্রপাতির কোনো প্রকার ক্ষতি সাধনা না করে কার্য সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতিগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখাকে যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বলে। যেমন-

(ক) সঠিক নিয়মে মেশিন চালু করা;
(খ) কাজ শেষে মেশিন সঠিকভাবে বন্ধ করা;
(গ) কাজের জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
(ঘ) কোনো প্রকার গোলযোগ দেখা দিলে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা;
(ঙ) বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

১.৬ পোল্ট্রি শপের নিরাপত্তা:

সকল প্রকার দুর্ঘটনার হাত হতে ওয়ার্কশপকে রক্ষা করাকে ওয়ার্কশপের নিরাপত্তা বলে। যেমন-

(ক) প্রয়োজনীয় প্রোটেকটিভ ডিভাইসসমেত সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ ইনসুলেটেড রাখা;

(খ) দাহ্য পদার্থের পাশে ওয়েল্ডিং না করা;

(গ) আগুন নিভানোর উপকরণ, পানি, বালু ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) গুদামে আগুন লাগলে দ্রুত ফায়ার স্টেশনে খবর দেওয়া;

(ঙ) কারখানার অভ্যন্তর ও বাহির সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

অনুসন্ধানমূলক কাজ:

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোনো একটি সরকারি বা বেসরকারি পোল্ট্রি ফার্ম পরিদর্শন কর। এর কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও ।

পরিদর্শনকৃত খামারের নাম	:
ঠিকানা	:
এখানে কী কী ধরনের কাজ করা হয়?	১
	২
	৩
কর্মী সংখ্যা কত?	
হ্যান্ড টুলস ও যন্ত্রপাতি সমূহের তালিকা কর	১
	২
	৩
ওয়ার্কশপে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে?	
বাতাস চলাচলে পর্যাপ্ত দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে?	
কর্মীগণ কাজের সময় যে সকল ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে কাজ করছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর	১
	২
	৩
	৪
	৫
তামার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সার্বিক কর্মপরিবেশ ও কর্মীগণের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কমপক্ষে ১০ (দশ) টি বাক্যে লেখ।	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নম্বর	

প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
[বি.দ্র: এই ছকটি পুরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও]	

১.৭ পোল্ট্রি ওয়ার্কশপে সতর্কতা বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা

- ওয়ার্কশপে কর্মরত কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য
- কর্মীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তার জন্য
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যবহারে অপচয় কমিয়ে আনা
- সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা
- উত্তম কর্ম পরিবেশ বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করা

নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করি

চিত্র: ১.২০ ওয়ার্কশপ সতর্কতা

১.৮ ওয়ার্কশপের কাজের অভ্যাস

ক) নিরাপদ কাজের অভ্যাস (Safe Practice):

- অ্যাপ্রন, হ্যান্ড গ্লাভস ও নিরাপদ চশমা পরিধান করে ওয়ার্কশপে কাজ করা
- টুলস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল আয়ত্ত করা, যেমন- সঠিক নিয়মে ফাইল চালানো
- শক্ত তলাযুক্ত নিরাপদ জুতা ব্যবহার করা
- মেশিন চালু অবস্থায় অন্যমনস্ক না হওয়া বা মোবাইলে কথা না বলা ।

খ) অনিরাপদ কাজের অভ্যাস (Unsafe Practice):

- যন্ত্রপাতির ভাঙ্গা অংশ ব্যবহার করা
- সেফটিগার্ড বিহীন মেশিন ব্যবহার
- জবের ধারালো প্রান্ত ফাইলিং না করে খালি হাতে ধরা
- অ্যাপ্রন, হ্যান্ড গ্লোভস ও নিরাপদ চশমা পরিধান না করা
- ওয়ার্কশপের মেঝে তেল, গ্রিজ বা পিচ্ছিল পদার্থ সময়মত পরিস্কার না করা

১.৯ পেশাগত বিপদ বা ঝুঁকি (Occupational Hazards)

বিপদ বা ঝুঁকি হলো যেকোনো বাস্তব অবস্থা বা ঘটনা। যার কারণে কোনো ব্যক্তির বা ধনসম্পদের বা পরিবেশের ক্ষতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা বিপত্তি বা হতাহত অথবা দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যাধি হতে পারে। কিন্তু তা এখনো ঘটেনি। বিপদের সর্বশেষ ফল হলো দুর্ঘটনা। সম্ভাব্য বিপদসমূহ পর্যবেক্ষণ, সনাক্তকরণ এবং দূরীকরণ বা কমানোর ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। দুর্ঘটনার কারণে ধারাবাহিক ক্ষতি যেমন- স্বাস্থ্য, জীবন, পরিবেশ এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

১.৯.১ ঝুঁকির শ্রেণি বিন্যাস (Type and Classification of Hazards):

কর্মক্ষেত্রে বিপদ বা ঝুঁকিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়-

- ভৌতিক (শারীরিক) ঝুঁকি (Physical Hazards)
- রাসায়নিক ঝুঁকি (Chemical Hazards)
- জৈবিক ঝুঁকি (Biological Hazards)
- মনোসামাজিক ঝুঁকি (Psychosocial Hazards)
- মানসিক ঝুঁকি (Emotional Hazards)

ক) ভৌতিক (শারীরিক) ঝুঁকি (Physical Hazards)

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের পদার্থের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই ভৌতিক (শারীরিক) বিপদ। বিভিন্ন ধরণের উপাদান যেমন- যন্ত্রপাতি, মেশিন, বিদ্যুৎ, অত্যধিক তাপ বা ঠান্ডা, আর্দ্রতা, অতি শব্দ, কম্পন, চলন্ত বস্তু, কাজের অবস্থা, স্থান ইত্যাদি।

চিত্র-১.২১ শারীরিক ঝুঁকি

খ) রাসায়নিক ঝুঁকি (Chemical Hazards):

কাঁচামালসমূহ, উৎপাদিত পণ্য, বিক্রিয়াকারী পদার্থ ইত্যাদি কখনো কখনো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন- বিস্ফোরণ, বিকিরণ, বিষক্রিয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিষবাষ্প, মরিচা পড়া, জ্বালাপোড়া, ক্যান্সার ইত্যাদি। রাসায়নিক বিপদের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো হলো- এসিড, ক্ষার, ডাইস, পেইন্ট, কুয়াশা, দ্রাবক, কটন ডাস্ট, গ্যাস বাষ্প, ওয়েল্ডিং ধোঁয়া, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ক্রোমিয়াম, লেড বা সীসা ইত্যাদি।

ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যেমন-

১. ম্যাকাটক্সিন (আলফাটক্সিন)
২. ন্যাচারাল টক্সিন
৩. সামুদ্রিক টক্সিন
৪. ফুড এডিটিভস
৫. পরিবেশদূষণকারী পদার্থ, আর্সেনিক, সীসা, মার্কারি, কেডমিয়াম ইত্যাদি

রাসায়নিক হ্যাজার্ড (Chemical Hazards) রোধের উপায়:

নিম্নে রাসায়নিক হ্যাজার্ড রোধের উপায় করা হলো:

১. সকল ধরণের খাদ্য এবং প্রস্তুত এলাকা থেকে দূরে সংরক্ষণ করা
২. সকল কেমিক্যাল কন্টেইনারে নাম লিখে লেবেল লাগিয়ে রাখা
৩. অপ্রয়োজনীয় কেমিক্যাল খাদ্য প্রস্তুত এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলা
৪. ফুড গ্রেড কনটেইনারে খাদ্য সংরক্ষণ করা
৫. খাদ্য প্রস্তুত এলাকা পরিষ্কার করার সময় ক্লিনিং এজেন্টগুলো খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে রাখা।

চিত্র-১.২২ রাসায়নিক ঝুঁকি

গ) জৈবিক ঝুঁকি (Biological Hazards)

ক্ষুদ্র-অনুজীব এবং তাদের বিপাকীয় পদার্থের কারণে জৈবিক বিপদ হয়। যেমন-

(ক) নর্দমার পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের অনুজীব থাকে। সালফারযুক্ত দ্রব্য (যেমন-গ্রিজ, তেল ইত্যাদি) আহার করলে তাদের শরীরে বিপাকীয় উৎপাদক হিসেবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। কিন্তু মাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড খুবই বিষাক্ত। এসবের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবী কীট যেগুলো ধুলা বালিতে ভেসে বেড়ায়, তাদের কারণে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়। এটি এক ধরণের জৈবিক বিপদ।

(খ) প্রাণি এবং প্রাণির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (চামড়া, পশম, চুল ইত্যাদি) থেকে তৈরি পণ্য জৈবিক বিপদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস বা পরজীবী কীট, আক্রান্ত পশু, বাহক ব্যক্তি বা দূষিত জৈবিক তরলের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যেমন- অ্যানথ্রাক্স (ব্যাকটেরিয়া), টিউবারকিউলোসিস (মাইকোব্যাকটেরিয়াম), এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি (ভাইরাস), অ্যাসপারজিলাস (ফাংগি), বাইসিনোসিস (এনডোটক্সিন), বার্ড ফ্লু (ভাইরাস), ম্যাড কাউ, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি।

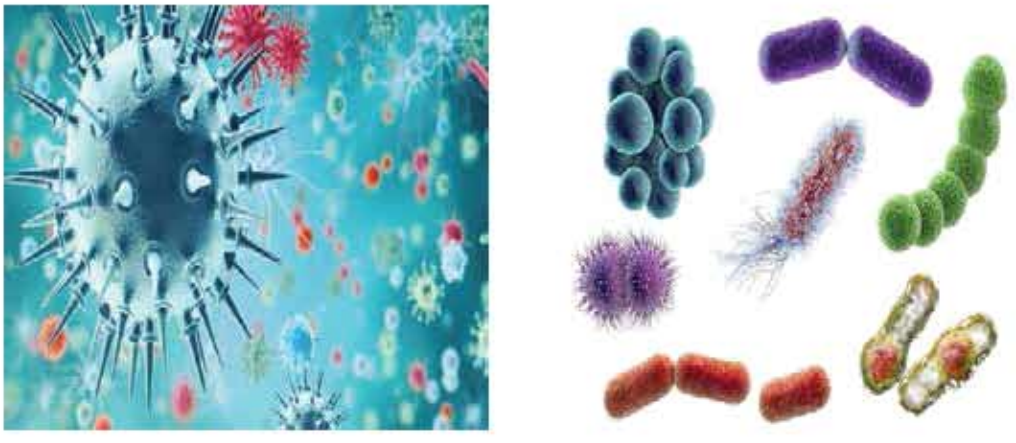

চিত্র-১.২৩ জৈবিক ঝুঁকি

জৈবিক হ্যাজার্ড রোধের উপায় গুলি উল্লেখ করা হলো:

১. খাদ্য দ্রব্য কাংখিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা
২. কাংখিত তাপমাত্রায় রান্না করা
৩. বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা
৪. অসুস্থ অবস্থায় কাজ না করা
৫. ভালোভাবে হাত ধোয়া
৬. খাদ্য হ্যান্ডলিং এর সময় পিপিই পরিধান করা
৭. সকল তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা

ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি শর্ত (The Conditions for Bacterial Growth)

নিম্নে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির শর্তগুলো আলোচনা করা হলো:

১. খাদ্য (Food): ব্যাকটেরিয়া বেড়ে ওঠার জন্য যে খাদ্য দরকার হয় তা মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শর্করা, জটিল কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন থেকে আসে।
২. আর্দ্রতা (Moisture): ব্যাকটেরিয়া আর্দ্রতা ছাড়া বাঁচে না। এই কারণে খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য প্রস্তুতি এলাকা এবং সরঞ্জামাদি শুকনা রাখতে হবে।
৩. পিএইচ (P^H): একটি দ্রবণের অম্লতার পরিমাপ করা হয়। পিএইচ স্কেলে, ৭ নিরপেক্ষ এবং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি সাধারণত স্বল্প পরিসরে ঘটে থাকে। খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে টক যুক্ত খাবারগুলি তাদের কম পিএইচ (উচ্চ অ্যাসিড) ব্যবহার করে, তবে ব্যাক্টেরিয়া আরও দূর করার জন্য কিছু কৌশল যেমন- হিমায়ন করা প্রয়োজন।
৪. বায়ু (Air): এরাবিক ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য বায়ুর প্রয়োজন, কিন্তু এনারোবিক ব্যাকটেরিয়া বায়ু ছাড়াই বৃদ্ধি পায়। এনারোবিক অবস্থার খাদ্য, বিশেষ করে রান্না করা খাবার এবং মাংসের কণার মধ্যে উপস্থিত হতে পারে। এই খাবারগুলি ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে স্টোরেজ প্রয়োজন।
৫. সময় (Time): অবস্থার উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়া প্রতিটি ১০৩০ মিনিট এ পুনরুৎপাদন হয়। এর অর্থ হলো যদি পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়, তাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যাতে দূষণ ও রোগ দেখা দিতে পারে।
৬. উষ্ণতা (Warm): ব্যাকটেরিয়া দ্রুত ৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (এই তাপমাত্রা বিপদজনক অঞ্চল) এর মধ্যে দ্রুত পুনরুৎপাদন হয়। তাই এই পরিসরের বাইরে খাবার রাখার জন্য প্রতিটি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে কোনো ফুড পয়জনিং (Food Poisoing) ব্যাক্টেরিয়া জন্মায় না। কোন ব্যাকটেরিয়া ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে বা ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে খাদ্য বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি হয় না। এই কারণে খাবার ৫ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেড এর নিচে বা ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে সংরক্ষণ করা উচিত।

ঘ) মনোস্তাত্ত্বিক ঝুঁকি (Psychological Hazards):

কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজের অবস্থানগত বিষয় যা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। ফলে মনোস্তাত্ত্বিক বিপদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিষাদ, কাজের প্রতি একঘেয়েমী ভাব, অস্বস্তি এবং জ্বালাপোড়া ইত্যাদি।

চিত্র-১.২৪ মনোস্তাত্ত্বিক ঝুঁকি

১.১০ বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (Risk Control):

শিল্পকারখানায় বিপদ নিয়ন্ত্রণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিল্পকারখানার ডিজাইন করা থেকে শুরু করে উৎপাদনের সময় এবং কারখানা বন্ধ করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়। এখানে আমরা বিপদ নিয়ন্ত্রণের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো বর্ণনা করছি। বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ধারণা তৈরি করা হয়েছে। নিম্নে এ সকল ধারণাগুলো বিবেচনা করে বিপদ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

- বিপদ সনাক্তকরণ
- বিপদের তালিকা তৈরি
- বিপদ র‍্যাংকিং করা বা শ্রেণি নির্ধারণ করা
- বিপদের সম্ভাবনা অ্যাসেস করা
- বিপদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত এবং তালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা অনুসারে বিপদকে র‍্যাংকিং করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বিপদ সমূহকে ঝুঁকির স্তর অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে র‍্যাকিং করতে হবে। পরবর্তীতে বিপদের ঝুঁকি দূর করার জন্য ভিন্ন কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিপদকে কম

ঝুঁকিপূর্ণ বিপদে রূপান্তর করবে অথবা বিপদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিপদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তুতি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সহজেই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ) ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (Hazard Control) ক্রম বা পর্যায়ঃ

- কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শান্ত পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।
- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- অ্যাজমা বৃদ্ধিকারক পদার্থ থাকবে না এমন পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্র থেকে বিপদ সরিয়ে ফেলা যেমন- ভৌতিক (শারীরিক) বিপদকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা যে স্থানে মেশিনটি ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ স্থানকে ঢেকে রাখতে হবে।
- উৎস থেকে বিপদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। বিপদের উৎস বন্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ডিজাইন পুনরায় করতে হবে। গার্ড অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।
- প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ-এটি প্রশাসনিক কৌশল যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। প্রশাসনিকভাবে বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য দূষিত জায়গায় শ্রমিকদের অল্প সময়ব্যাপী কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি শ্রমিকদের সময় ভাগ করে দিয়ে অথবা অন্য কোনো নিয়ম প্রয়োগ করে করতে হবে।

১.১১ ঝুঁকি অপসারণঃ

যেখানে কোনো বিপদ নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- এলোমেলো জঞ্জাল দূর করে হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো বিপদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্থ যন্ত্রপাতি অতি দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- অতিরিক্ত ফটোকপি এবং বই বা পান্ডুলিপির পরিবর্তে ই-মেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

ক) ঝুঁকি সৃষ্টিকারী মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনঃ

বিপদ দূর করা সম্ভব না হলে কম ঝুঁকি সম্পন্ন বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এটি এমনভাবে করতে হবে যেন সন্তোষজনকভাবে একই ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়। যেমন-

- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।

- যেখানে সবসময় টেলিফোন ব্যবহৃত হয় সেখানে হ্যান্ডসেটের পরিবর্তে হেডসেট ব্যবহার করতে হবে।
- বাষ্পীয় বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ওয়ার্কশপে নিরাপদে কাজ করতে তোমরা কোনো কাজে কী ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিবে তা ছকে লেখ (একটি কাজের নামসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো)-

টেবিল-১ শ্রেণির কাজ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
১.	প্যাকেজিং করা	হ্যান্ড গ্লাভস, অ্যাপ্রন, সেফটি স্যুজ, নিরাপদ চশমা, ইত্যাদি পরিধান করা
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

পোল্ট্রি শপে পরিধেয় নিরাপদ পোশাক ও সরঞ্জাম (পিপিই)

চিত্র:ফেস শিল্ড

চিত্র:গগলস

চিত্র:নিরাপদ চশমা

চিত্র: ইয়ারপ্লাগ

চিত্র: হেয়ার নেট

মাস্ক ফেস মাস্ক

চিত্র: পিপিই সুট চিত্র: অ্যাপ্রন

চিত্র- হ্যান্ড গ্লাভস

চিত্রঃ গামবুট

চিত্রঃ সেফটি স্যুট

চিত্রঃ সু-কভার

চিত্রঃ চেস্ট কভার

১.১২ ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ:

- কাজ শেষে টুলস নির্ধারিত স্থানে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়
- মেজারিং টুলসগুলো খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে এক জায়গায় রাখতে হবে
- দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধাতব টুলস পরিষ্কার করে তেল বা গ্রিজ মেখে রাখতে হবে যাতে টুলসে মরিচা না পড়ে এবং ধারালো অবস্থা বজায় থাকে

ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ:

কোনো ওয়ার্কশপ বা কারখানাকে সচল রাখতে যন্ত্রপাতির পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। যন্ত্রপাতির নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যন্ত্রপাতির পরিকল্পিত ও আদর্শ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

জব- ১ পোল্ট্রি ল্যাবে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো এবং ধোঁয়া হতে ল্যাবে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রের জরুরি প্রক্রিয়াগুলির যথাযথ এবং কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণ করা
- দুর্ঘটনা, আগুন এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করা
- জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলি কার্যকরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	হেলমেট	মাঝারি মাপের	০১ টি
২.	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
৪.	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (ABC 40%), ৫ কেজি	০১ টি
২.	শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে/অর্ধ ড্রাম	২ ফুট x ২ ফুট x ১ ফুট	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।

২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান করো।

৩. শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে-এর মধ্যে মোটা বালি ছড়িয়ে দাও।

৪. জ্বালানী কাঠগুলোকে ঐ বালিভর্তি ট্রে-এর মধ্যে সাজিয়ে নাও।

৫. জ্বালানী কাঠের মধ্যে কেরোসিন মিশিয়ে কিছুক্ষণ পর দেয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও।

৬. আগুন পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠার সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক এর পিনটি চিত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী খুলে দাও।

৭. তাৎক্ষণিকভাবে ডান হাতে লিভার ও বাম হাতে আউটলেট পাইপটি ধরে আগুনের দিকে একাগ্রতার সাথে নিশানা ঠিক কর।

৮. ডান হাতে লিভার চেপে ধর এবং বাম হাতে অগ্নিশিখার মধ্যে নির্গত গ্যাস ডানে বামে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দাও যাতে আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়।

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত ওয়ার্কশপের পিছনের দরজা (Fire Exit) পর্যন্ত পৌছাবে এবং যত দ্রুত সম্ভব দরজা খুলে দৌড়ে সবাইকে নিয়ে বের হয়ে আসবে।

কাজের সতর্কতা:

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যক
- অগ্নি নির্বাপক যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে

আত্মপ্রতিফলন: অগ্নিনির্বাপক দিয়ে আগুন নেভানো ও আগুনসৃষ্ট ধোঁয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলণী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) বলতে কী বোঝায়?
২. পেশাগত ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. কোনো কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার ৫টি কারণ লেখ।
২. ৫টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ করো।
৩. পোল্ট্রি শপে সতর্কতা বিধি পালন করা কেন প্রয়োজনীয় উল্লেখ করো।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্নঃ

১. পোল্ট্রি শপে কী ধরনের নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা উচিৎ? বর্ণনা করো।
২. পোল্ট্রি শপে কাজ করার সময় কিভাবে যন্ত্রপাতি সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন, তা বর্ণনা করো।
৩. পোল্ট্রি শপে পিপিই পরিধান ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

অধ্যায়-২

ব্রয়লার মুরগি পালন

Raising Broiler Chickens

একমাত্র মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালিত দ্রুত দৈহিক বর্দ্ধনশীল নরম ও তুলতুলে মাংসল বক্ষবিশিষ্ট ৪-৫ সপ্তাহ বয়সের স্ত্রী অথবা পুরুষ মুরগি ব্রয়লার নামে পরিচিত। ব্রয়লারের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা সাধারণত ২:১ অনুপাতে হয়ে থাকে, তবে এ অনুপাত পালন ব্যবস্থাপনা এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ভিন্ন দুটি খাঁটি জাতের মোরগ-মুরগীর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে ব্রয়লারের জাত (ভ্যারাইটি বা স্ট্রেইন হিসাবে পরিচিত) সৃষ্টি করা হয়। অতি দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির হার, খাদ্য রূপান্তর ক্ষমতা, মাংসের স্বাদ, নরম গুণ ও চমকপ্রদ রঙের বিষয়াদি সুবিবেচনায় রেখে দুটি খাঁটি ভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগীর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে ব্রয়লার ভ্যারাইটি বা স্ট্রেইন সৃষ্টি করা হয়। তুলনামূলক হিসাবে অতি অল্প সময়ে (২৮-৩২ দিনে) দৈহিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আশানুরূপ লাভ প্রদান করে বিধায় ব্রয়লারের পালন প্রযুক্তি অনেকটা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ব্রয়লার হাইব্রীডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে পারব
- বাংলাদেশে ব্রয়লারের বিভিন্ন স্ট্রেইন/হাইব্রিড ও হ্যাচারীর নাম বলতে পারব
- মুরগির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরিচিতি বর্ণনা করতে পারব
- ব্রয়লার পালনের বাসস্থান তৈরী প্রস্তুতি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে পারব
- ব্রয়লারের জন্য জায়গা, খাবার ও পানির পাত্রের পরিমাণ ও যন্ত্রপাতির হিসেব করতে পারব
- ব্রয়লার পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- আদর্শ লিটারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব

- লিটার হিসাবে ব্যবহৃত উপকরণ গুলোর নাম বলতে পারব
- লিটারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- লিটারের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারব
- মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারব
- ব্রুডিং ও ব্রুডিং এর সুফল বলতে পারব
- ব্রুডিং কালীন সময়ে ব্রুডারে তাপের উৎস বলতে পারব
- ব্রয়লার বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ব্রুডিং -এর তাপমাত্রা প্রদান করতে পারব
- বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারব
- বিভিন্ন প্রকার জীবাণুনাশকের মাত্রা ও ব্যবহার বলতে পারব
- মুরগির ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- খামারের জীব নিরাপত্তা বর্ণনা করতে পারব

২.১ ব্রয়লার সাধারণ বৈশিষ্ট্য : -

- দৈহিক বৃদ্ধির হার অধিক
- খাদ্যকে মাংসে রূপান্তরের দক্ষতা অধিক (১.৮-২ : ১)
- এদের শরীর দ্রুত পালকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে
- এদের মাংস নরম ও সুস্বাদু
- চামড়া নরম ও মোলায়েম
- এরা ৪-৫ সপ্তাহ বয়সে ২-২.৫ কেজি ওজনের হয়
- বক্ষাস্থি নরম ও মোলায়েম হয়
- অল্প সময়ে রান্না করা যায়

চিত্র ২.১: ব্রয়লার মুরগি

২.২ বাংলাদেশে ব্রয়লারের বিভিন্ন স্ট্রেইন/হাইব্রিড পাওয়া যায় এমন হ্যাচারীর নামঃ

ক্রমিক নং	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	স্ট্রেইনের নাম
১	কাজী হ্যাচারি	কব-৫০০, রস
২	সি.পি বাংলাদেশ কোং লিঃ	রস
৩	বাংলাদেশ হ্যাচারি লিঃ, রাজবাড়ী	স্টার ব্রো
৪	ঢাকা হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর	রস, ভ্যানকব
৫	রাফিদ পোল্ট্রি	লোহম্যান
৬	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, কিশোরগঞ্জ	হাবার্ড ক্লাসিক, আরবার একর্স
৭	গোয়ালন্দ হ্যাচারিজ লিঃ, গোয়ালন্দ	এমপিকে ৩, আরবার এক্স, হাই ব্রো
৮	প্যারাগন পোল্ট্রি লিঃ, গাজীপুর	স্টার ব্রো, হাবার্ড ক্লাসিক
৯	সানোয়ারা পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারিজ লিঃ	কব-৫০০
১০	নারিশ পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর/সানফ্লাওয়ার হ্যাচারিজ/ বেলী চিকেন হ্যাচারিজ/ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হ্যাচারিজ	স্টার ব্রো
১১	উষা পোল্ট্রি লিঃ, সাভার, ঢাকা	হাবার্ড ক্লাসিক, হাব চিকস, হাই ব্রো
১২	এগস্ এন্ড হেনস্ লিঃ, কড্ডা, গাজীপুর	হাই ব্রো
১৩	বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, গাজীপুর	স্টার ব্রো
১৪	ফিনিক্স হ্যাচারি লিঃ গাজীপুর	আরবার একর্স, রস
১৫	কাজলী হ্যাচারি	হাই ব্রো, হাবার্ড
১৬	হাসনা হেনা ক্যাটল অ্যান্ড পোল্ট্রি লিঃ	স্টার ব্রো
১৭	ভি আই পি হ্যাচারি/ রেনেটা	কব ৫০০
১৮	এস এম পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম	এভিয়ান কে-২৪
১৯	ইউনাইটেড ফুড কমপ্লেক্স	হাব চিকস
২০	সিলভার কার্প	ইসা ভেডেট
২১	এম এম আগা লিঃ	হাই ব্রো, হাব চিক
২২	প্রাইম হ্যাচারিজ	হাব চিকস
২৩	রোজ হ্যাচারি	হাই সেক্স, স্টার ব্রো
২৪	এ্যাকুয়া ব্রিডার	হাই ব্রো
২৫	ইনডেক্স হ্যাচারি	হাবার্ড ক্লাসিক

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ (উৎপাদিত স্ট্রেইনের নাম লেখ)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	উৎপাদিত স্ট্রেইনের নাম
১	কাজী হ্যাচারি	
২	সি.পি বাংলাদেশ কোং লিঃ	
৩	বাংলাদেশ হ্যাচারি লিঃ, রাজবাড়ী	
৪	ঢাকা হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর	
৫	রাফিদ পোল্ট্রি	
৬	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, কিশোরগঞ্জ	
৭	গোয়ালন্দ হ্যাচারিজ লিঃ, গোয়ালন্দ	
৮	প্যারাগন পোল্ট্রি লিঃ, গাজীপুর	

২.৩ ব্রয়লার মুরগির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন অঙ্গ পরিচিতি

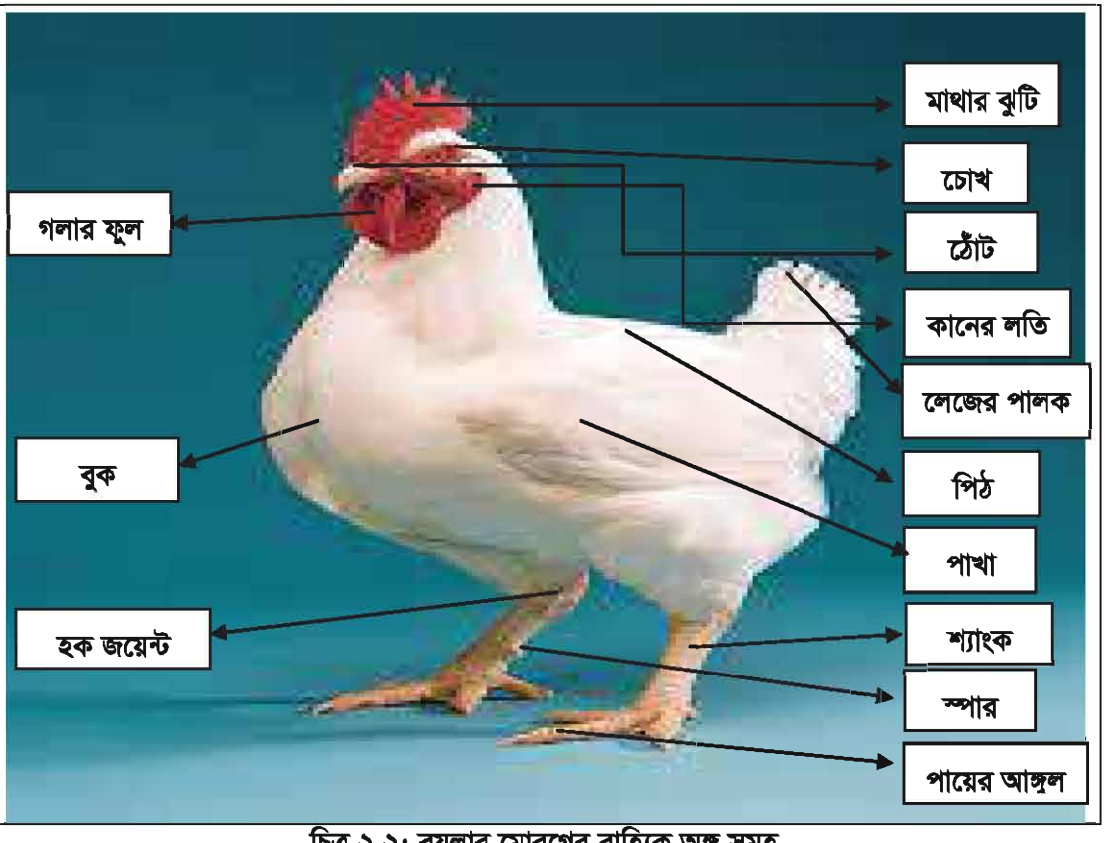

চিত্র ২.২: ব্রয়লার মোরগের বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ

২০২৩

ব্রয়লার মোরগের বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ: (External organs of male Broiler)

ক) মাথা (Head): ঠোঁট, নাকের ছিদ্র, কান, কানের লতি, ঝুঁটি, ওয়াটল ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত দেহের অগ্রভাগ।

খ) চোখ (Eye): মাথার, দুই পার্শ্বে দুটি গোল চোখ।

গ) ঝুঁটি (Comb): মাথার উপর একসাথে ঝুঁটি থাকে।

ঘ) ওয়াটল (Wattle): ঠোঁটের কাছে দুইপাশে দুটো লাল রঙের মাংসপিন্ডই ওয়াটল।

ঙ) কানের লতি (Earlobe): প্রত্যেক কান থেকে একটা চামড়ার মত লতি ঝুলে থাকে।

চ) গ্রীবা বা গল (Neck): গ্রীবা মাথা ও ধড়কে সংযুক্ত করে, এর সাহায্যে মাথা এদিক ওদিক ঘোরাতে পারে। গলদেশের দুইপাশে সরু পালক থাকে।

ছ) খাদ্য থলি (Crop): গলার নিচের অংশে খাদ্য জমা হওয়ার থলি অবস্থিত। খাদ্য প্রথমে এখানে জমা হয়।

জ) পাখা (Wings): পিঠের উপর দুইদিকে বিস্তৃত দুটি ডানা থাকে, যা উড়তে সাহায্য করে।

ঝ) পালক (Feathers): পাখায় যে পালক থাকে তা উড়বার কাজে লাগে।

ঞ) পা (Feed): মোরগের পশ্চাৎভাগে দুইটি পা থাকে। পায়ের উপরের অংশকে উরু, নিচের অংশকে শ্যাংক এবং উরু ও শ্যাংকের মাঝের গাটকে হক (Hock) বলে।

ট) বুক (Chest): গলার নিচের দিকে দেহের তলদেশের মাংসল অংশই হলো বুক।

ঠ) পায়ের আঙুল(Toes): প্রতি পায়ে ৪টি আঙুল থাকে। সামনের দিকে ৩টি ও পিছনের দিকে ১টি আঙুল। আঙুলের আগায় নখ থাকে।

ড) স্পার (Spur): মোরগের বয়স হলে পেছনের আঙুলের উপর কাটার মত বর্ধিত অংশ তৈরি হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ক্রমিক নং	বাহ্যিক অঙ্গ	কাকে বলে?
১	ওয়াটল	
২	হক জয়েন্ট	
৩	স্পার	
৪	শ্যাংক	
৫		

ব্রয়লার মুরগীর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

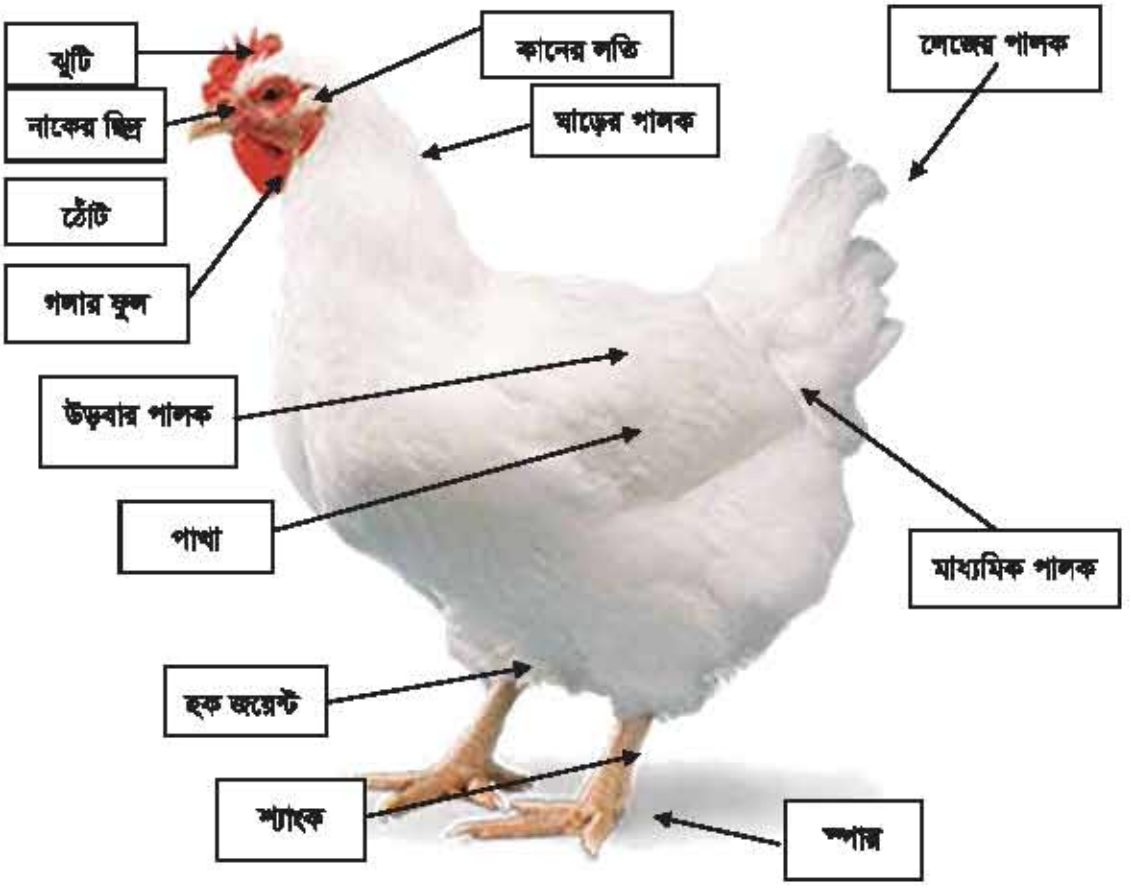

চিত্র ২.৩: ব্রয়লার মুরগীর বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ

ব্রয়লার মুরগীর বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ:

ব্রয়লার মুরগীর সব বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্রয়লার মোরগের মতই তবে,

ক) ঝুঁটি মোরগের থেকে ছোট থাকে।

খ) পায়ে স্পার থাকে তবে ছোট।

গ) গলার ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট।

ঘ) দেহের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।

ঙ) দেহের বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম।

চ) পালকের বৃদ্ধির হার কম এবং দেরীতে দেহ পালক দ্বারা আবৃত হয়।

২০২৩

খ) ব্রয়লার মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সমূহ (পরিপাকতন্ত্র): (Internal organs of Broiler-Digestive System)

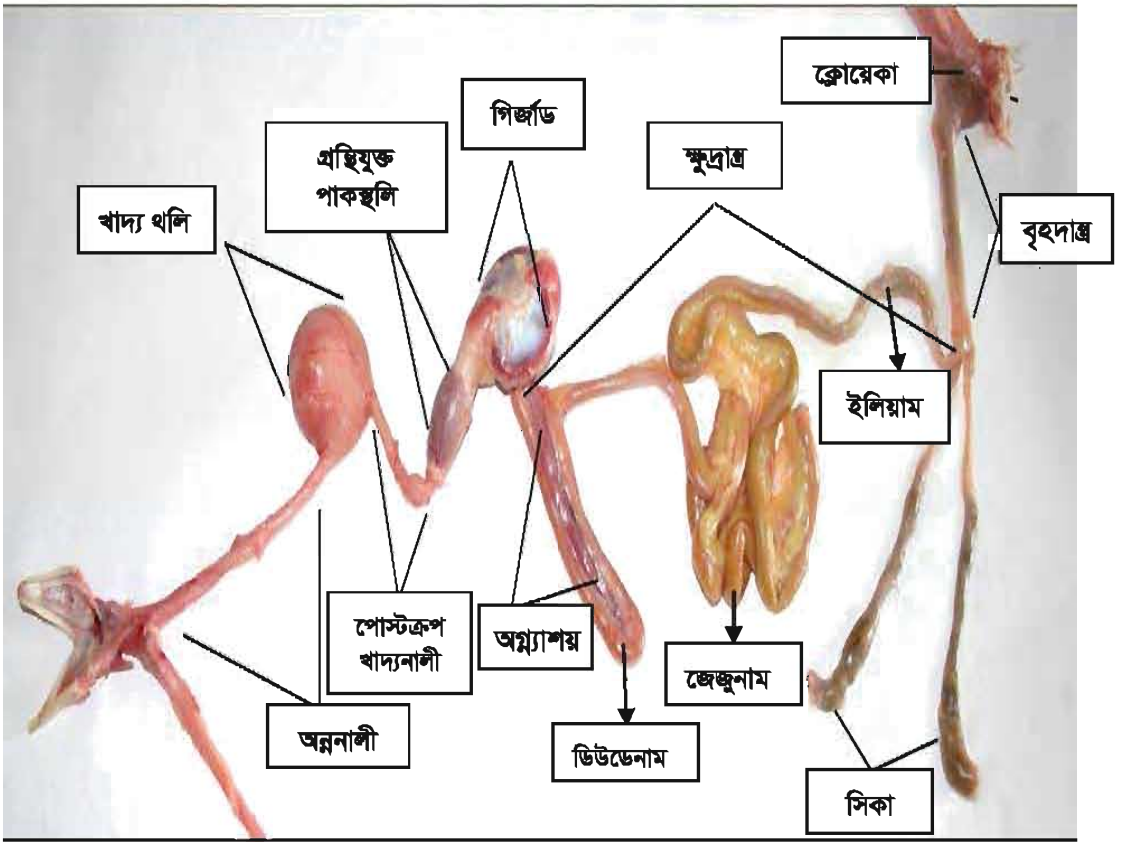

চিত্র ২.৪: ব্রয়লার মুরগির পরিপাক তন্ত্র

পরিপাকতন্ত্র (Digestive System):

ব্রয়লার মুরগির শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি খাদ্য গ্রহন পরিপাক পরিশোষণ সহ পুষ্টি সাধন করে তাকে পরিপাকতন্ত্র বলে।

নিচে পরিপাক তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১.মুখগহ্বর (Mouth Cavity): গরু মহিষের মতো মোরগ-মুরগির দাঁত নেই। এর পরিবর্তে দুটি চঞ্চু আছে। জিহ্বার অগ্রভাগ সরু ও পশ্চাতের দিকটা কিছুটা খসখসে। চঞ্চুর সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ করার পর জিহ্বা খাদ্য গলাধ:করণে সাহায্য করে। এ সময় মুখ থেকে খুব কম লালা নিঃসরণ হয়।

২. খাদ্যনালী (Esophagus): মুখগহ্বর থেকে খাদ্যথলি পর্যন্ত অংশ খাদ্যনালী। গলাধ:করণের পর খাদ্য এ নালী দিয়ে খাদ্যথলিতে এসে জমা হয়।

৩.খাদ্যথলি (Crop): এ থলিতে প্রথমত: খাদ্য জমা হয়। পরে অল্প পরিমাণ করে খাদ্য এ থলি থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছে। খাদ্যথলিতে থাকাকালে খাদ্য কিছুটা নরম হয়। কিন্তু কোনো পরিপাক ক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় না।

৪.পাকস্থলী (Proventriculus): খাদ্য থলির দুই বা তিন ইঞ্চি পরেই পাকস্থলীর অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে এটি খাদ্য নালীরই একটি বর্ধিত অংশ। এর ভেতরের দেয়ালে অসংখ্য গ্রন্থি রয়েছে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী পৌঁছালে এ গ্রন্থি হতে এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়। এ রসে পেপসিন নামক এক প্রকার জারক রস ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। এই জারকরস আমিষজাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সহায়তা করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্য অবস্থিত রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং খাদ্য নরম কাদার মতো করে ফেলে।

৫. গিজার্ড (Gizard): পাকস্থলীর নিকটেই শক্ত মাংসপেশী দিয়ে প্রস্তুত গোলাকার কালচে লাল আকৃতির অংশটির নামই গিলা বা গিজার্ড। এর দু'টি মুখ। একটি উপরের দিকে পাকস্থলীর সাথে ও অপরটি নিচের ডিওডেনামের সাথে সংযুক্ত। এর প্রধান কাজ হলো শক্ত দানাদার খাদ্যকে গুঁড়া করে নরম করে দেয়া, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে পরিপাকে সুবিধা হয়। এটি ঝিনুক, শামুক, পাথরের কণা পর্যন্ত গুঁড়া করতে সক্ষম।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine): এটি গিলা হতে সিকা পর্যন্ত বিস্তৃত তিন- চার ফুট লম্বা। এর তিনটি অংশ রয়েছে। ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। পুষ্টিনালীর এ অংশেই হজম ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র আন্ত্রিকরস নামক বেশ কয়েক প্রকার জারকরস ক্ষরণ করে। এ স্থানে আমিষজাতীয় খাদ্যের শেষ পরিণতি এমাইনো এসিড, শর্করাজাতীয় খাদ্য ভেঙে গ্লুকোজ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোষক যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত স্রোতে প্রবেশ করে। হজম ও শোষণ প্রক্রিয়া মোরগ মুরগির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়া দুটি সম্পন্ন হতে মাত্র তিন ঘন্টার কম সময় লাগে। সমস্ত শোষণযোগ্য খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়ে অবশিষ্ট অসার অংশ পানির সাথে মিশে বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে।

৭. সিকা (Ceaca): ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের সংযোগ স্থলের দু'দিকে থলির মতো বর্ধিত অংশ আছে- এ দু'টিকে সিকা বলে। সিকা লম্বায় প্রায় ১০-১৫ সেন্টিমিটার। এখানে কোনো পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না বললেই চলে, তবে আঁশজাতীয় খাদ্যদ্রব্য ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কিঞ্চিত পরিমাণ হজম হতে পারে। এটি মূলত: রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

৮. বৃহদান্ত্র (Colon): এটির দৈর্ঘ্য ১০-১২ সেন্টিমিটার । এখানে খাদ্যের অসার অংশ হতে পানি শোষিত হয়।

৯. ক্লোয়েকা (Cloaca): বৃহদান্ত্র হতে মল, বৃক্ক হতে মূত্র এবং প্রজননতন্ত্র হতে ডিম বা বীর্য এই একই সাধারণ নির্গমণ পথ দিয়ে বের হয়। এটি বৃহদান্ত্রের এক বর্ধিত অংশ। সাধারণত মোরগ-মুরগির মল ও প্রস্রাব একত্রে বের হয়। মলের সাথে যে সাদা অংশ দেখতে পাওয়া যায় তা প্রধানত ইউরিক এসিড যা

প্রস্রাবেরই একটি অংশ। ক্লোয়েকার বহিরাংশকে মলমূত্রদ্বার বলা হয়। মলমূত্রদ্বারের উপরিভাগে বারসা অব ফেব্রিসিয়ার অবস্থান। এটি মোরগ-মুরগির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উৎস।

এছাড়া পরিপাকতন্ত্রে নিম্নলিখিত সাহায্যকারী গ্রন্থি রয়েছে:

ক) যকৃত (Liver)

খ) অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

গ) প্লীহা (Spleen)

ক) যকৃত (Liver):

এটি গিজার্ড ও ডিওডেনামের ভাঁজের পাশেই অবস্থিত। এর দুটি বাদামি রঙের বড় অংশ রয়েছে। যকৃত দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। এটি পিত্তরস নামক এক প্রকার জারকরস সৃষ্টি করে। যকৃতের দুটি অংশ হতে পিত্তরস প্রস্তুত হয়ে দুটি পিত্তনালী দিয়ে ডিওডেনামের নিচের অংশে এসে খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয়। ডান পাশের পিত্তনালীটি কিছুটা মোটা হয়ে একটি থলি সৃষ্টি করে এবং এতে পিত্তরস প্রয়োজন মিটানোর জন্য জমা থাকে। বাম দিকের পিত্তনালীটি পিত্তরস সরাসরি ডিওডেনামে সরবরাহ করে। পিত্তরস দেখতে সবুজ রঙের খাদ্যে এসিডিয় ভাব দূর করে পাচক রসের কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করে।

খ). অগ্ন্যাশয় (Pancreas): ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম নামক যে অংশ রয়েছে এর ভাঁজে এটি অবস্থিত। মোরগের অগ্ন্যাশয় আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। গিজার্ড হতে এখানে খাদ্য প্রবেশ করলে অগ্ন্যাশয়ের সাধারণ গ্রন্থি হতে এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয় এবং অগ্ন্যাশয় নালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়- একে ক্লোমরস বলে। এই রসে তিন প্রকার জারকরস রয়েছে। যথা-এমাইলেজ, ট্রিপসিন ও লাইপেজ। এ রসসমূহ যথাক্রমে শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সহায়তা করে। অগ্ন্যাশয় হতে ইনস্যুলিন নামক আর এক প্রকার প্রাণরস নিঃসৃত হয়। এ রস অগ্ন্যাশয়ের মধ্যস্থিত বিটা সেল হতে ক্ষরিত হয় ও সরাসরি রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়। অতঃপর গ্লুকোজ যথাযথ দহন করতে সাহায্য করে দেহে কর্মশক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া উদ্বৃত্ত শর্করা গ্লাইকোজেন ও চর্বি রূপে দেহে জমা থাকে।

গ) প্লীহা (Spleen): যকৃত, গিলা ও পাকস্থলীর সাহায্যে সৃষ্ট ত্রিভুজাকৃতি স্থানে এ লালচে বাদামি রঙের ছোট গোলাকার প্লীহা অবস্থিত। এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি। তবে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত লোহিত কণিকা দেহ হতে দূরীভূত করে এবং কিছু পরিমাণ রক্ত ও লোহাজাতীয় খনিজ পদার্থ জমা করে রাখতে পারে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ক্রমিক নং	ব্রয়লার মুরগির অভ্যন্তরিণ অঙ্গ	কাজ লেখ
১	পাকস্থলী	
২	ক্ষুদ্রান্ত্র	
৩	ডিউডেনাম	
৪	সিকাম	
৫	ক্লোয়েকা	

২.৪ ব্রয়লার পালনের বাসস্থান তৈরি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন
(Preparation of Broiler Rearing Habitats and Installation of Equipment)

চিত্র ২.৫ : উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার

নতুন বা পুরাতন যে ঘর হোক না কেন, "অল ইন অল আউট" পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঘরে এক ব্যাচ ব্রয়লার পালন করে বিক্রয় করার কমপক্ষে ১৪দিন পর অন্য ব্যাচ উঠাতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু রোগ প্রতিরোধই করে না রোগের জীবাণুকেও ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

ব্রয়লার খামারে বাসস্থান তৈরি

ব্রয়লারের বাসস্থান ত্রুটিপূর্ণভাবে তৈরি হলে ব্রয়লার পালন করে আশানুরূপ ভাবে লাভজনক হওয়া যায় না। তাই ব্রয়লারের জন্য ঘর তৈরির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে-

(ক) ঘরের অবস্থান:

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সনাতন পদ্ধতিতে খোলামেলা ঘরে ব্রয়লার মুরগি পালন করা হয়
- অবাধ বাতাস চলাচল ও ভেন্টিলেশন সুবিধার জন্য এই প্রকৃতির ঘর উত্তর-দক্ষিণে খোলা থাকে
- এই ঘরের মধ্যে মুরগি আবদ্ধ রাখা এবং বন্যপ্রাণী, অনাহুত পশুপাখি ও দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঘরের খোলা স্থান তারের জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়
- প্রতিকূল আবহাওয়ার ঘরের খোলামেলা স্থানে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে

২০২৩

- লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করার সুবিধার্থে খোলা স্থানে নিচের অংশ ১ থেকে ১.৫ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়
- মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করার জন্য ঘরের সিলিং থেকে মাচার উপর পর্যন্ত তারের জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়
- মাচার নিচে মুরগির বিষ্ঠা জমার জন্য সম্পূর্ণ খালি থাকে
- মেঝে থেকে মাচার উচ্চতা ৩ ফুট থাকে। প্রতি ব্যাচে ব্রয়লার পালন শেষে মাচার নিচে জমাকৃত পায়খানা পরিষ্কার করার সুবিধার্থে মাচা উঁচু রাখতে হয়
- মাচার নিচে বর্ষার সময় যাতে পানি প্রবেশ না করে সেজন্য মেঝে জমি থেকে ১ ফুট উঁচু রাখতে হয়
- শীতের সময় মাচার নিচ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢোকা বন্ধ করার জন্য পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে

(খ) ঘরের প্রশস্ততা:

লিটার পদ্ধতিতে ঘরের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ১০ ফুট এবং সর্বাধিক ২৫ ফুট করা হয়।

- বাণিজ্যিক বৃহদাকার খামারে সর্বাধিক প্রশস্ততা ৪০ ফুট পর্যন্ত করা যায়। ৪০ ফুটের অধিক প্রশস্ত হলে ঘরে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়
- মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করার জন্য বেশি প্রশস্ত ঘরে মাচার উচ্চতা ৭ ফুট করা প্রয়োজন। অন্যথায় মাচার নিচে জমাকৃত ময়লা পরিষ্কার করতে সমস্যা হয়।

(গ) ঘরের দৈর্ঘ্য:

- যে কোন পরিমাপের সুবিধামত ঘরের দৈর্ঘ্য বড় করা যায়
- ঘরে স্বয়ংক্রিয় পাত্র স্থাপন করতে হলে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে হয়

(ঘ) ঘরের উচ্চতা:

- ছোট ঘরের উচ্চতা : দু'চালা ঘরের (গ্যাবল টাইপ) ছাদ ঘরের মেঝে থেকে ৬ ফুট এবং উভয় চালের শীর্ষদেশে ১০ ফুট হলেই যথেষ্ট
- বাণিজ্যিক খামারে দু'চালা ঘরের ছাদ মেঝে থেকে ৮ ফুট এবং উভয় চালের শীর্ষদেশে ১৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়
- ঘর বেশি চওড়া হলে চালের উচ্চতা বেশি করা প্রয়োজন। অন্যথায় ভেন্টিলেশন সমস্যা দেখা দেয়।
- মাচাযুক্ত ঘরের উচ্চতা : মাচার উপর থেকে চালের ছাদ ৬ ফুট (১.৮ মিটার) এবং দুই চালের শীর্ষদেশে মাচার উপর থেকে ১০ ফুট (৩.০ মিটার) করা প্রয়োজন

(ঙ) ঘরের চাল:

- ব্যবহারিক ভাবে বেশির ভাগ মুরগির জন্য দু'চালা ঘর তৈরি করা হয়
- দু'চালা ঘরের চাল টিন, এসবেসটস্ অথবা খড়ের সাহায্যে তৈরি করা যায়
- টিন বা এসবেসটস্ চালের নিচে গরম প্রতিরোধের জন্য কাঠ, হার্ডবোর্ড অথবা বাঁশের তরজা দিয়ে সিলিং করতে হয়
- চালের ছাচ থেকে শীর্ষদেশের উচ্চতা এক চতুর্থাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ বেশি হয়
- চালের ছাচ ২.৫ ফুট রাখতে হয়। না হলে বৃষ্টির ছাট ঘরে প্রবেশ করে
- ঘরে চালার পরিবর্তে ৮ থেকে ১০ ফুট উঁচুতে কংক্রিট ছাদ তৈরি করা যায়
- কংক্রিটযুক্ত ছাদের উপর বহুতল ঘর নির্মাণ করতে সুবিধা হয়
- বহুতল ঘর তৈরি করলে যেমন স্থানের সাশ্রয় হয় তেমনি রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম থাকে

(চ) ঘরের মেঝে :

- বাণিজ্যিক খামারে অবশ্যই ইঁদুর প্রতিরোধক কংক্রিটের মেঝে তৈরি করা উচিত
- পারিবারিক ছোট খামারে কাঁকর বালি যুক্ত মেঝে তৈরি করা যায় তবে রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে
- কাঁচা মেঝে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে সমস্যা হয়
- মাচাযুক্ত ব্রয়লার ঘরে মাচার নিচে কাঁকর ও বালুযুক্ত মেঝে তৈরি করা যায়। তবে মেঝেতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ বন্ধ করার জন্য মেঝে উঁচু রাখতে হয়

(ছ) ঘরের দরজা:

- বাণিজ্যিক মুরগির ঘরে প্রস্থের দিকে দরজা থাকে
- ছোট ঘরে দৈর্ঘ্যের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে দরজা থাকে
- বাণিজ্যিক ঘরের দরজা ৪ ফুট (১.১০ মিটার) প্রস্থ ও ৮ ফুট (২.৪ মিটার) উঁচু হয়
- ছোট ঘরে ট্রলির সাহায্যে লিটার ও ময়লা অপসারণ করতে হয়। এজন্যে দরজার আকার ছোট থাকে

(জ) খাবার ও পানির পাত্রের মধ্যে যাতে বাচ্চা প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) বাচ্চা উঠানোর ১৫ দিন আগে ঘরটি রোগ-জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

(ঞ) বাচ্চা ছাড়ার ১২-২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার জ্বালিয়ে ঘর কাঙ্খিত মাত্রায় গরম করতে হবে।

(ট) বাচ্চা যখন ঘরে ছাড়া হয় তখন পানি ও খাবার পাত্রগুলো সমদুরে সঠিক ভাবে স্থাপন করতে হবে।

চিত্রঃ ২.৬ চিক গার্ডের ভেতর খাবার ও পানি পাত্রের অবস্থান

২.৫ ব্রয়লার পালনের জন্য মেঝের জায়গা, খাবার ও পানির পাত্রের পরিমাণ ও যন্ত্রপাতির হিসাবঃ

জায়গা/ যন্ত্রপাতি	বিবরণ	বয়স	
		০-২ সপ্তাহ	৩-৫ সপ্তাহ
জায়গার পরিমাণ		১ বর্গফুট/ব্রয়লার	১ বর্গফুট/ব্রয়লার
চিক গার্ড	ব্যাস= ১২ ফুট,উচ্চতা= ১.৫ ফুট	০.২২ বর্গফুট/ব্রয়লার	-
হোভার	ব্যাস= ৫ ফুট	১ টি/৫০০ বাচ্চা	-
চিক ফিডার	দৈর্ঘ্য=২ ফুট, প্রস্থ=১-৩ ইঞ্চি	৭-৮ টি/৫০০ বাচ্চা	-
চিক ড্রিংকার	ব্যাস= ১.৪ ইঞ্চি, পরিধি= ৩ ফুট ২ ইঞ্চি	-	-
ব্রুডার	১০০ ওয়াটের বাল্ব	৫ টি/ ৫০০ বাচ্চা	-
পানির পাত্র	৫ লিটার ধারণ ক্ষমতার গোলাকার প্লাস্টিকের পাত্র	৩০টি/৫০০ বাচ্চা	-
খাবার পাত্র	গোলাকার	২০ টি/৫০০ বাচ্চা	-

২০২৩

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

১০০০ ব্রয়লারের জন্য জায়গা, খাবার ও পানির পাত্রের পরিমাণ ও যন্ত্রপাতির হিসাব লেখ

জায়গা/ যন্ত্রপাতি	বিবরণ	বয়স	
		০-২ সপ্তাহ	৩-৫ সপ্তাহ
জায়গার পরিমাণ			
চিক গার্ড			-
হোভার			-
চিক ফিডার			-
চিক ড্রিংকার			-
ব্রুডার			-
পানির পাত্র			-
খাবার পাত্র			-

২.৬ ব্রয়লার পালন পদ্ধতি (Broiler Chickens Rearing Method)

ব্রয়লার আবদ্ধ অবস্থায় তিন পদ্ধতিতে পালন করা যায়। যথা :-

ক) লিটার পদ্ধতি

খ) খাঁচা পদ্ধতি

খ) মাচা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে খামারি ব্রয়লার পালন করতে ইচ্ছুক তার উপর নির্ভর করে ঘর তৈরি করা উচিত।

(ক) লিটারে ব্রয়লার পালন পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে ব্রয়লারের ঘরের মেঝেতে লিটার বিছিয়ে পালন করা হয়। লিটারের দ্রব্য হিসেবে ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। লিটারের পুরুত্ব ২.০-৩.০ ইঞ্চি হতে হবে। লিটার প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে উল্টিয়ে দিতে পারলে ভালো এবং কেকের মত আকার ধারণ করলে তা ভেঙে দিতে হবে। এতে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট-এর প্রকোপ কমে যাবে। প্রয়োজনে পুরাতন লিটারের উপর নতুন লিটার যোগ করতে হবে।

চিত্র: ২.৭ লিটারে পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

(খ) খাঁচায় ব্রয়লার পালন: (Broiler Cage Raising)

এ পদ্ধতিতে তারের জালের তৈরি খাঁচায় মুরগি পালন করা হয়। মেঝের দিকে তারের জাল থাকাতে পায়খানা করলে নিচে পড়ে। নিচে টিনের বা কাঠের ট্রে দেওয়া থাকলে ময়লা তার মধ্যে জমা হয়। খাঁচার তলা একটু সামনের দিকে ঢালু থাকে, ফলে ডিম গড়িয়ে সামনের দিকে চলে আসতে পারে। এ খাঁচা কয়েক তলা পর্যন্ত করা যেতে পারে । বর্তমানে শহরাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালন বেশি জনপ্রিয়। কারণ এতে অল্প জায়গায় বেশি মুরগি পালন করা যায়। প্রতি খোপে পরিমাপের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে ১-৪ টি মুরগি রাখা যায়।

চিত্র: ২.৮ খাঁচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

(গ) মাচায় পালন পদ্ধতি: (Broiler Slat Raising)

যে সব এলাকায় বৃষ্টির পানি জমে বা মাটি অধিক আর্দ্র থাকে সেই সব এলাকাতে মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করা প্রয়োজন। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে সহজেই মাচা তৈরি করা যায়। মাচায় বাঁশ বা কাঠের বাতা ০.৫ ইঞ্চি করে ফাঁকা রাখা হয় যাতে ব্রয়লারের বিষ্ঠা সহজেই নিচে পড়ে যেতে পারে। মাচায় উচ্চতা মাটি থেকে ২.৫-৩.০ ফুট হতে হবে যাতে করে মাচার নিচ দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে মুরগির বিষ্ঠা শুকাতে পারে। মাচা

পদ্ধতিতে উলম্ব এবং আড়াআড়ি বাতাস প্রবাহের কারণে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে এবং ব্রয়লার আরামবোধ করে। এই পদ্ধতিতে লিটার দ্রব্যের দরকার হয় না এবং রোগব্যাধিও কম হয়। মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনের ক্ষেত্রে মাচার নিচের বর্জ্য পদার্থ নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং চুন ছিটিয়ে দিয়ে মাটি জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ৫০০ ব্রয়লার পালনের জন্য উপযোগী ঘরের মাচার নিচে ৩০-৩৫ কেজি চুন ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

চিত্র: ২.৯ মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

২.৭ ব্রয়লার ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করণ

ব্রয়লার ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- ব্রয়লার বিক্রয় করার পর সমস্ত সরঞ্জাম, লিটার, খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হবে।
- পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ঘরের দেয়াল, পর্দা ফেন্ট্রিলেটর, দরজা, জানালা, ফ্লোর, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরে কোনো মেরামত, সংস্কার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পরিষ্কার পানি দিয়ে দেয়াল মেঝে খাদ্য ও পানি পাত্র ধুতে হবে। পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার উত্তম।
- জীবাণুনাশক (পজিসেপ, সুপারসেপ্ট, আরোসান) দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র, দেয়াল, মেঝে, ফ্যান, পর্দা ও খামারের আশেপাশ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ভিজা মেঝেতে উপর ১০০ বর্গফুট ১ কেজি হারে শুকনা কস্টিক সোডা ছড়াতে হবে এবং ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর মেঝে শুকিয়ে গেলে কস্টিক সোডার উপর হালকা করে পানি স্প্রে করে ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গার ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরাতন মুরগির ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং এর ১ দিন পূর্বে লিটার বিছাতে হবে। ঘরে সমস্ত সরঞ্জামাদি স্থাপন করে বাচ্চা গ্রহণের ১২ ঘন্টা পূর্বে সম্পূর্ণ ঘর চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউমিগেশন উপকরণ ব্যবহার করে ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে।
- ফিউমিগেশনের জন্য প্রতি ১০০ ঘনফুট স্থানের জন্য ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ১২০ মি:লি: ফরমালডিহাইড ব্যবহার করতে হয়।
- ফিউমিগেশন করার ২০-৩০ মিনিট পর পর্দা সরিয়ে সম্পূর্ণ গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিতে হবে।
- ফিউমিগেশনের পর বাচ্চা প্রদানের ২/৩ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত ঘর তালাবদ্ধ রাখতে হয়।
- বাচ্চা উঠানোর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবাণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১ বার করে ঘরের বাইরের চতুর্পার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।
- নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের আশপাশে কোনো প্রাণি বা লোক চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

ব্রয়লার বাসস্থান এবং আশেপাশের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- খামারে পানি জমে স্যাঁতস্যাঁতে না হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মুরগির জাত ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হবে, যাতে মুরগি পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়।
- মুরগির খামারের উপরিভাগের তারের জাল দিয়ে তৈরি করতে হবে, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘরে যাতে বৃষ্টির ছাট পড়ে লিটার ভিজে না যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য ঘরের চালে পানি ছিটাতে হবে।
- ঘরের চারিদিকে পানি ছড়াতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ফগিং মেশিন দিয়ে পানি স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি করতে হবে।
- ঘরের ভিতরে ও বাইরে ফ্যান চালাতে হবে।
- খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রথমে পানি দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানি সাথে জীবাণুনাশক মিশিয়ে খামার জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সালমোনেলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে।
- খামারে ভালো খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।

- খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে যাতে বন্য প্রাণী ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ মুরগির ঘরের ভিতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।
- খামারে কোনো মুরগি অসুস্থ হলে যত দ্রুত সম্ভব পৃথক করে ফেলতে হবে। মারা গেলে তা সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে অবশ্যই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- খামারে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.৮ লিটার ও লিটারের ব্যবস্থাপনা (Litter and Litter Management):

চিত্র: ২.১০ মেঝেতে লিটার স্থাপন

পোল্ট্রি পালনে লিটারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবদ্ধ অবস্থায় পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে লিটার পদ্ধতিতে মুরগির বিছানা হিসাবে লিটার ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রি লিটার অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। লিটার এক দিকে যেমন পোল্ট্রি উৎপাদনে সহায়তা করে ঠিক তেমনি সঠিক ভাবে লিটারের যত্ন না নিলে এ থেকে বিভিন্ন রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে।

পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার (Litter) বলে অর্থাৎ লিটার বলতে পোল্ট্রির ঘরে শয্যা হিসেবে ব্যবহৃত নানাবিধ বস্তুকেই বোঝায়। এক কথায় বাসস্থান আরামদায়ক করার জন্য পোল্ট্রির ঘরে যে বিছানা ব্যবহার করা হয় তাকে লিটার বলে।

আদর্শ লিটারের বৈশিষ্ট্য (Features of Standard Litter):

- লিটার দ্রব্য অবশ্যই নরম ও আরামদায়ক হবে।
- অধিক পানি শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে।
- ওজন হালকা হবে ও দ্রুত শুকানোর ক্ষমতা থাকবে।
- শুষ্ক ,ঝরঝরে ও ধূলিমুক্ত হবে।
- তাপ পরিবহন ক্ষমতা কম হবে।
- আবহাওয়ার আর্দ্রতা কম শোষণ করবে।
- সহজলভ্য ও সস্তা হবে।
- ছত্রাক ও পরজীবীমুক্ত হবে।
- ভেজা হওয়া চলবে না।
- মুরগি পালন শেষে উন্নত মানের সার হিসাবে ব্যবহার উপযোগী হবে।

লিটার হিসাবে ব্যবহৃত উপকরণগুলোর নামঃ

- ধানের তুষ
- কাঠের গুঁড়া
- খড়ের ছোট ছোট টুকরা
- আখের ছোবড়া
- বালি
- ভুট্টা মোচার ছোবড়া ইত্যাদি।

লিটারের প্রয়োজনীয়তা (Litter Requirements):

নিম্নলিখিত কারণে পোল্ট্রির ঘরে লিটার বিছানোর প্রয়োজন পড়ে। যথা-

- পোল্ট্রিকে আরামে রাখার জন্য
- পোল্ট্রির বিষ্ঠার জলীয় অংশ শোষণ করে ঘরকে ময়লা ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য
- পোল্ট্রির শরীরকে পরিষ্কার রাখার জন্য
- ময়লামুক্ত খোসার ডিম পাওয়ার জন্য
- শীতের দিনে ঘর গরম রাখা ও গরমের দিনে ঠান্ডা রাখার জন্য

লিটারের শ্রেণিবিন্যাস (Classifications of Litter)

সাধারণত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিটারের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যথা-

ক. কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।

খ. লিটারের পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে।

গ. লিটারের স্থায়ীত্বকালের ওপর ভিত্তি করে।

ক. কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে লিটার দুধরনের হয়ে থাকে। যথা:-

১.জৈবিক লিটার (Organic litter): যখন জৈব পদার্থ, যেমন- কাঠের গুঁড়ো, আঁখের ছোবড়া ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২.অজৈবিক লিটার (Inorganic litter): যখন অজৈব পদার্থ, যেমন- ছাই, বালি ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খ. পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. সাধারণ লিটার (Normal litter):এ ধরনের লিটার সাধারণত: ৫-৭ সে.মি. পুরু হয়ে থাকে। ব্রয়লার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. ডিপ লিটার (Deep litter): এ ধরনের লিটার সাধারণত ১৫-২৩ সে.মি. (৬-৯ ইঞ্চি) পুরু হয়ে থাকে। ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ.স্থায়ীকালের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. তাজা লিটার (Fresh litter): সাধারণত ২ মাস সময়কাল পর্যন্ত লিটার প্রায় পরিষ্কার থাকে। তাই একে তাজা লিটার বলে।

২. বিল্ট আপ লিটার (Built up litter): সাধারণত ৬ মাসের পুরোনো লিটারকে বিল্ট আপ লিটার বলে।

মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা:

- মুরগি ঘরে রাখার এক সপ্তাহ পূর্বে লিটার বিছাতে হবে।
- লিটার বিছানোর পূর্বে ভালোভাবে ঘরের মেঝে শুকাতে হবে।
- লিটার ভেজা থাকলে রোদে শুকাতে হবে, তবে লিটার সামগ্রীতে ২০-২৫% আর্দ্রতা না থাকলে মুরগির দেহের জলীয় বাষ্প শুষে নেয়।

- লিটার বেশি আর্দ্র হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মুরগির সমস্যার সৃষ্টি করে।
- ব্যবহারের পূর্বে লিটার জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা উচিত।
- হাতের মুঠোয় লিটার নিয়ে খুব জোরে মুষ্টিবদ্ধ করলে যদি লিটার জমাট না বাঁধে বা ঝরঝর করে ঝরে না যায় তাহলে লিটারের অবস্থা ভালো বুঝতে হবে।

চিত্র: ২.১১ লিটার পরীক্ষা

- ব্রুডারে বাচ্চা গ্রহণের ২/৩ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করতে হয়, বেশি পূর্বে চালু করলে গরমে লিটার শুকিয়ে যায়।
- শুকনা লিটারে বাচ্চা দিলে বাচ্চার শরীর থেকে লিটার আর্দ্রতা শুষে নেয় এবং বাচ্চার ডি-হাইড্রেশন হয়।
- লিটারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার পায়খানা থেকে পানীয় অংশ লিটারে শোষিত হয় এবং লিটার ভিজে যায়।
- লিটার বেশি ভিজলে আর্দ্রতা কমানোর জন্য ঘরের মধ্যে বাতাসের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হয়। এতেও আর্দ্রতা না কমলে পুরাতন লিটারের সাথে নতুন লিটার মেশাতে হয়।
- লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে ছত্রাক বা মোল্ড যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্য লিটার ভালোভাবে ওলট পালট করতে হয়।
- ২ মাস পর্যন্ত লিটার প্রতি সপ্তাহে আচড়া দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।
- লিটার কেক হলে কেক ভেঙে দিতে হবে।
- ঘরের পরিবেশ বেশি শুকনা হলে বাচ্চার বৃদ্ধি কমে ও সুষ্ঠুভাবে পালক গজায় না, তাই লিটারে সঠিক আর্দ্রতা বজায় থাকলে এই অবস্থার অবসান ঘটে।
- ব্রুডারে বাচ্চার লিটারে চুন ব্যবহার করা ঠিক নয়, প্রয়োজন হলে সুপার ফসফেট ব্যবহার করা যায়।
- ব্রুডিং এর প্রথম দিকে লিটারের উপর পাটের চট ও নিউজ পেপার বিছিয়ে দিতে হবে।
- গরমের সময় ২ ইঞ্চি এবং শীতের সময় ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছাতে হবে।
- লিটার যদি ভিজে যায়, তবে সেগুলো উপর থেকে ফেলে দিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।

- আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বাতাসে জলীয়ভাগ বেশি সেখানে পুরু বিছানা ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই উত্তম।
- প্রতি ব্যাচ ব্রয়লারের জন্য নতুন বিছানা ব্যবহার করা উচিত, তবে লিটার ব্যয়বহুল হলে বা সহজে পাওয়া না গেলে পুরোনো বিছানা জীবাণুমুক্ত ও কীটনাশক দ্বারা বিশোধন করে ব্যবহার করা যায়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ক্রমিক নং- মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার ৫টি কাজ লেখ।

২.৯ ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং (Broiler Chick Brooding)

চিত্র: ২.১২ ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং

উৎপাদিত বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট, যেখানে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বাচ্চার দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করতে হয়। তাই পীড়নের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্যই ব্রুডিং করা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে।

ব্রুডিং:

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর তারা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারন তার শরীরে পর্যাপ্ত পালক থাকে না । মুরগির বাচ্চাকে কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে লালন পালন করাকে ব্রুডিং বলে।

২.৯.১ ব্রুডিং এর উদ্দেশ্য (The Objective of Brooding):

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে সুরক্ষিত থাকে
- সমস্ত বাচ্চা সমানভাবে বেড়ে উঠে
- সঠিক শারীরিক গঠন হয়
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা যায়
- ঠান্ডা, গরম, বৃষ্টি, প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করা

ব্রুডিং কালীন সময়ে ব্রুডারে তাপের উৎস:

ব্রুডিং কালীন সময়ে ব্রুডারে তাপের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন-

- বিদ্যুৎ : বৈদ্যুতিক বাল্ব বা হিটার।
- কেরোসিন : কেরোসিন হিটার, কেরোসিন চুলা।
- গ্যাস : গ্যাস হিটার বা গ্যাস ব্রুডার।

২.৯.২ ব্রয়লার বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ব্রুডিং -এর তাপমাত্রা

ব্রুডার হাইভে প্রথম সপ্তাহে সাধারণত ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা দিয়ে ব্রুডিং আরম্ভ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা কমিয়ে আনা হয়।

বাচ্চার বয়স (সপ্তাহ)	ব্রুডিং তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি ফারেনহাইট	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	
১	৯৫	৩৫	শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ ও গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এর পর বাচ্চা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
২	৯০	৩২	
৩	৮৫	২৯	
৪	৮০	২৭	

উপরে যে তাপমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্রুডারের তাপমাত্রা। হোভার ও চিক গার্ডের মাঝখানে মেঝে থেকে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচুতে থার্মোমিটার ঝুলিয়ে এই তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায়।

চিত্র: ২.১৩ ব্রুডার স্থাপন

২.৯.৩ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

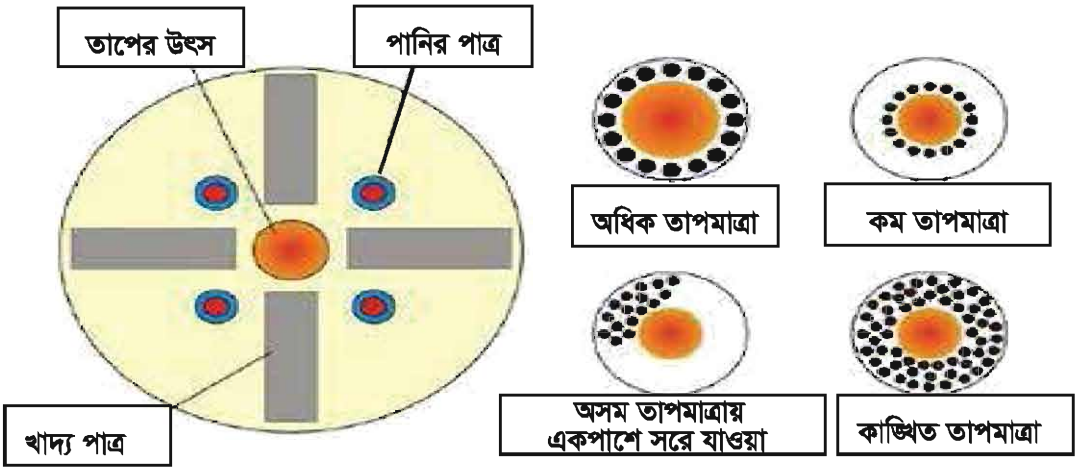

চিত্রঃ-২.১৪ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কিনা তা ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান এবং চলাফেরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়।

ক) কাম্য তাপমাত্রা (Expected Temperature):

যে তাপমাত্রায় বাচ্চাগুলো আরাম বোধ করে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে তাই কাম্য তাপমাত্রা।

কাম্য তাপমাত্রার লক্ষণঃ বাচ্চা চিক গার্ডের মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকবে ও চলাফেরা করবে। খাদ্য ও পানি গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাবে। বাচ্চাগুলোর চলাফেরায় চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হবে।

খ) অতিরিক্ত ঠান্ডাঃ

যদি ব্রুডারে তাপমাত্রা কাম্য তাপমাত্রার তুলনায় কম হয় তখন বাচ্চাগুলো ঠান্ডা অনুভব করে।

কম তাপমাত্রার লক্ষণঃ ব্রুডারের নিচে তাপের উৎসের কাছে সমস্ত বাচ্চা জড়ো হয়ে থাকবে। চি চি শব্দ করে ঘাড় ছোট করে গুটি সুটি মেরে থাকে। একটির উপর আরেকটি বাচ্চা উঠার প্রবণতা দেখা যায় অর্থাৎ গাদাগাদি করে থাকে। খাদ্য ও পানি খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

প্রতিকারঃ ব্রুডার পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনে সক্ষম কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ উৎপাদনে সক্ষম ব্রুডার ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত ব্রুডারের তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা এবং ঠান্ডা বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) অতিরিক্ত গরমঃ

ব্রুডারের কাম্য তাপমাত্রার তুলনায় অধিক তাপমাত্রা থাকলে বাচ্চা গুলো অধিক গরম অনুভব করে।

অতিরিক্ত তাপমাত্রার লক্ষণ: বাচ্চাগুলো তাপের উৎস হতে দুরে সরে গিয়ে চিকগার্ডের কাছাকাছি অবস্থান করে।মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে। খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়।

প্রতিকার: তাপের উৎসের সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। ঘর ঠান্ডা করার জন্য বেড়া দেয়া পর্দা তুলে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ব্রুডার ঘরে অতিরক্তি ঠান্ডা যেমন ক্ষতিকর তেমনিই অতিরিক্ত গরমও বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্চার দেহে পীড়ন পড়ে ও বাচ্চা সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কাজেই ব্রুডার ঘরের কাম্য তাপমাত্রা সবসময় বজায় রাখতে হবে।

ঘ) অসম তাপমাত্রা (Hetrogeneous temperature)

যদি ব্রুডারে অসম তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে তখন বাচ্চাগুলো যে পাশে তাপমাত্রা কাঙ্খিত থাকে যে পাশে সরে যায়।

প্রতিকার: চিক গার্ডের ভেতরে সব জায়গায় কাঙ্খিত তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

ক্রমিক নং	তাপমাত্রা	তাপমাত্রার জন্য বাচ্চার অবস্থান চিত্র আঁক
১	কাম্য তাপমাত্রা	
২	অতিরিক্ত ঠান্ডা	
৩	অতিরিক্ত গরম	
৪	অসম তাপমাত্রা	

২.১০ ব্রয়লার মুরগির ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণঃ

মুরগি পালনে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বেশ কিছু কাজ করতে হয়। নিচে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

১। গরমের দিনে মুরগি পালন করা হলে মুরগির ঘরের ছাদ টিন বা ধাতব কোন উপাদানের হয় তাহলে রোদের তাপমাত্রা থেকে মুরগিগুলোকে রক্ষা করার জন্য ঘরের ছাদে ভারী কোন কাপড় বা চটের থলি পানিতে ভিজিয়ে দিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে। এতে মুরগির ঘরে রোদের তাপ কমে যাবে ও তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

২। গরমের দিনে মুরগির ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঘরের চারদিকের পর্দা উঠিয়ে রাখতে হবে। এতে মুরগির ঘরের সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারবে ও ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩। গরমের সময়ে মুরগি পালনে মুরগির ঘনত্ব কমিয়ে আনতে হবে। মুরগির ঘরে ঘনত্ব কম থাকলে ঘরের তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৪। অত্যধিক গরম থেকে মুরগিগুলোকে রক্ষা করার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থান পর পর ফ্যানের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ভালো হয়। এতে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে ও মুরগিগুলোর তেমন কোন সমস্যা হবে না।

৫। গরমের সময় মুরগির ঘরে কিছুক্ষণ পর পর সামান্য পরিমাণে পানি স্প্রের মতো করে ছিটিয়ে দিতে পারলেও ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৬। এছাড়াও শীতের দিনে মুরগির ঘরের চারপাশ বন্ধ রেখে পর্দা নামিয়ে দিতে হবে। আর ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য বৈদ্যুতিক বাল্বের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০-৭০% রাখতে হবে।

২.১১ বায়ু প্রবাহ (Air Flow)

ব্রুডারে তাপের উৎস থেকে উৎপন্ন কার্বন মনো-অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঘরে জমা হয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়া মলমূত্র থেকে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দূর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই ঘরে বায়ু প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণীয়-

- ঘরের প্লাস্টিক পর্দার উপরিভাগ অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাস অপসারণের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে;
- ঘরের পরিবেশ বার বার পরীক্ষা করতে হয় ও দূষিত বায়ু অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পর্দা সরিয়ে ফেলতে হবে;
- গরমের সময় দিনে পর্দা তুলে দিয়ে রাতে আবার ঢেকে দিতে হবে;
- অতিরিক্ত ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য ২ পর্দা বিশিষ্ট প্লাস্টিকের পর্দা ব্যবহার করতে হবে;

- ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ু বের করার জন্য এগজস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

২.১২ বিভিন্ন প্রকার জীবাণুনাশকের ব্যবহার ও মাত্রা

ক্রমিক নং	জীবাণুনাশকের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র	প্রয়োগ মাত্রা
১	এনটেক ডি এস সি ১০০০	খামারের দেয়াল, যন্ত্রপাতি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বাচ্চা ফুটানোর ঘর, খাদ্য প্রস্তুতের ঘর ইত্যাদি পরিস্কার এবং ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ছত্রাক, ঈস্ট জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার হয়।	১ মিলিলিটার দ্রবণ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
২	এনটেক লং লাইফ ২৫০ এস	খামারের দেয়াল, যন্ত্রপাতি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ডিম ফুটানোর ঘর, খাদ্য প্রস্তুতের ঘর ইত্যাদিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ছত্রাক, ঈস্ট জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার হয়।	৪ মিলিলিটার দ্রবণ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ বিশেষ রোগ দমনের জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণীয়।
৩	এনটেক ভিরকন এস	খামারের দেয়াল, যন্ত্রপাতি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ডিম ফুটানোর ঘর, খাদ্য প্রস্তুতের ঘর ইত্যাদিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ছত্রাক, ঈস্ট জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার হয়।	৪ মিলিলিটার দ্রবণ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ বিশেষ রোগ দমনের জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণীয়।
৪	এনটেক ভিরুডাইন	খামারের দেয়াল, ডিম ফুটানোর ঘর, প্রসেসিং প্লান্ট, মাংসের বাজার প্রভৃতিতে পরিস্কারকরণ ও জীবাণুনাশকের কাজে ব্যবহার করা হয়।	পানির পাত্র- ৪০ মিলি লিটার দ্রবণ প্রতি ১০০ লিটার পানিতে। বায়বীয় স্প্রে- মুরগির ঘরে ৩৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়।
৫	আইওসান:	মোরগ-মুরগির রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, ভাইরাস ও ফাংগাসের বিরুদ্ধে কার্যকর।	খাবরের পাত্র, পানির পত্র, পোল্ট্রিশেড ও কেজ জীবাণুমক্ত করার কাজে প্রতি লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার এবং খামারে ফুটবাথ বা ফুট ম্যাটে প্রতি লিটার পানিতে ৩০ মিলিলিটার আইওসান ব্যবহার করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ক্রমিকনং	জীবাণুনাশকের নাম	জীবাণুনাশকের প্রয়োগ মাত্রা
১	এনটেক ডি এস সি ১০০০	
২	এনটেক লং লাইফ ২৫০ এস	
৩	এনটেক ভিরকন এস	
৪	আইওসান	

২.১৩ খামারের জৈব নিরাপত্তা বা বায়োসিকিউরিটি (Bio-Security):

বর্তমান বিশ্বে খামার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে জৈব নিরাপত্তা বা বায়োসিকিউরিটি একটি বহুল আলোচিত শব্দ। খামার স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে খামার পরিকল্পনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ, এমনকি ভোক্তার কাছে উৎপাদিত দ্রব্য পৌছে দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথা জীবাণুমুক্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবমুক্তভাবে সম্পন্ন করাই জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (The Purposes of Bio-Security System):

১) বহিরাগত রোগজীবাণু যেমন: রানীক্ষেত রোগ, বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগের কেবল থেকে খামার রক্ষা করা।

২) মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ ও জীবাণু যেমন- সালমোনেলা থেকে খামারকে রক্ষা করা।

৩) খামারের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান।

৪) রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমানো, লাভজনক উপায়ে খামার গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি কমানো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতি খেয়াল রাখলে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা যাবে :

১. খামারের স্থান নির্বাচন:

- পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি করে ঘর তৈরি করতে হবে
- চারিদিকে খোলা মেলা, প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সক্ষম এমন স্থান বেছে নিতে হবে।
- লোকালয় থেকে দূরে কিন্তু খামারের পণ্য বাজারজাতকরণের ভালো যোগাযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও শহর থেকে অনতি দূরে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হবে
- খামারে পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুতের সরবরাহের সুবিধা থাকতে হবে
- অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে

২. রোগ জীবাণুর উৎস ও প্রতিরোধের উপায় নির্বাচন:

রোগ জীবাণুর উৎস

১) বাহক পাখি, বাইরে থেকে আমদানিকৃত জীবাণুবাহী ডিম ও ১ দিন বয়সের বাচ্চা, আক্রান্ত ডিম ও পাখি, মানুষের হাত পা ও পোশাকাদি, ধুলবালি, পালক, বিষ্ঠা, ও জৈব বর্জ্য, বন্যপাখি, শিকারি জীবজন্তু, ইঁদুর ইত্যাদি।

২) দূষিত পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি।

৩) রোগ জীবাণু যুক্ত সরবরাহের যন্ত্রপাতি যথা-ট্রাক, খাচা, ডিমের পাত্র ইত্যাদি।

রোগ বিস্তার প্রতিরোধের উপায়ঃ

(ক) যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ :

- যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।
- সব ধরনের দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারের কর্মীদের খামারে ব্যবহৃত জুতা ও পোশাকাদি আলাদা রাখতে হবে এবং খামারের বাইরে বের করা যাবে না।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে ও পরে হাত পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে ও শরীরের বহিরাংশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- খামারের বন্যপ্রাণী, পোষাপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- এক খামারে একই বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একটি ঘরে একই বয়সের মুরগি রাখতে হবে।

(খ) খামারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণঃ

- দর্শনার্থীদের জন্য একটি তথ্য বই সংরক্ষণ করতে হবে। খামার পরিদর্শনকারীর নাম-পরিচয়, সাক্ষাৎকারের তারিখ-সময় ইত্যাদি তথ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করে খামারের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারকর্মী ও খামার পরিদর্শনকারী বহিরাগত উভয়কেই কাজ করার সময় বা খামার পরিদর্শনের সময় জীবাণুমুক্ত জুতা ও পোশাকাদি পরিধান করতে হবে। খামার পরিদর্শন ও কাজের শেষে পুনরায় এদের জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
- উপকরণ সরবরাহকারী বাস/ট্রাক ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরও উপরোক্ত উপায়ে যথাসম্ভব জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে।
- বন্যপাখি নিয়ন্ত্রণের জন্য খামার ঘরের চারদিকে আলো বিকিরণকারী অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বেঁধে দিতে হবে।

গ) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতাঃ

- পোল্ট্রি খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অথবা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।
- প্রতিটি আলাদা শেডে ঢোকার পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে হাত-পা ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা অ্যাপ্রন, হাত পায়ের মোজা ও মাথার আবরণী ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে নিয়োজিক কর্মী (বৃন্দ) খামারে প্রবেশকারী যানবাহন, তাদের চালক ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মীবৃন্দের যে কোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন।
- ময়নাতদন্ত করার জন্য বাতাসের অনুকুলে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে খামারে জীবাণু প্রবেশের কোনে সম্ভাবনা নেই। ময়নাতদন্ত শেষে স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৩. নিয়মিত টিকা প্রয়োগ (Regular Vaccination) :

খামারে মোরগ-মুরগিকে টিকা প্রয়োগের রোগ-মুক্ত রাখা একটি আধুনিক, জটিল ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আধুনিক কালে পোল্ট্রি শিল্পের সাফল্য সময়মত ও সফলভাবে টিকা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই টিকা প্রয়োগ কালে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করা বাঞ্ছনীয়। টিকা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে-

- হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত স্বাস্থ্যকর্মীকে ১ দিন বয়সী বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে খামারিদের ধারণা দিতে হবে। মায়ের বা বাচ্চার শরীরের এন্টিবডি টাইটার লেভেল নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ্চার টিকা প্রদান কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হ্যাচারির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।
- সঠিকভাবে উৎপন্ন, সংরক্ষিত, পরিবহণ করা টিকা প্রদান করতে হবে।
- আমাদের দেশের স্থানীয় পর্যায়ে আক্রমণকারী জীবাণুর স্ট্রেইন সম্বন্ধে ভালোভাবে ধারণা নিয়ে সেই অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। অপরিচিত স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা প্রদান করলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণিভেদে টিকা প্রদানের সঠিক মাধ্যম অনুসারে টিকা প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবন্ত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে খাবার পানি, স্প্রে বা চোখে ফোঁটা প্রদানের মাধ্যমে ও মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুতকৃত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগিকে টিকা প্রয়োগ না করাই ভালো।
- টিকা প্রদানের পূর্বে ভিটামিন এ, ডি ও ই ব্যবহার করা ভালো।
- টিকা প্রদানের পর ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ও সেলেনিয়াম ব্যবহার করা ভালো।

৪. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Regular Health Check-up):

- প্রতি সপ্তাহে মোরগ-মুরগির খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বা পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে।
- সঠিকভাবে আলো প্রদান করতে হবে।
- কোনোরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা (Regular Cleaning):

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভজনক খামারের পূর্বশর্ত। তাই খামারের ভেতরের ও বাইরের চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য্য। মেঝে বা লিটার পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে নতুন লিটার দেয়া ও ঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা উচিত। খামারের সকল যন্ত্রপাতি, যেমন- মুরগির খাঁচা, ডিম রাখার পাত্র, খাবার ও পানি পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বছরে অন্তত একবার শেডসহ সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে অথবা ফিউমিগেশন করে পরিষ্কার করতে হবে। খামার পরিষ্কার রাখার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

খামারে ব্যবহৃত পুরোনো লিটার যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণ কালে ব্যবহৃত লিটার দ্বারা কোনোভাবেই যেন খামারের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

- সমস্ত ঘর ঝাড়ু দিতে হবে। খামারের প্রতিটি অংশ, যেমন- মেঝে, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব সহ অন্যান্য সরঞ্জাম, দরজা জানালার মাঝে থাকা ধুলাবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতি পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট বাল্বের জায়গায় নতুন বাল্ব লাগাতে হবে।
- শেডের ভেতরে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে ঘরের পিছন দিকে স্প্রে করা শুরু করে সামনের দিকে এসে শেষ করা উচিত। ঘরের ভেতরে প্রথমে ছাদ, পরে দেয়াল এবং সবশেষে মেঝেতে স্প্রে প্রয়োগ করার নিয়ম।
- শুকনো মেঝেতে অন্তত চার ইঞ্চি পুরু, শুষ্ক, শোষণক্ষম লিটার ছড়িয়ে দিতে হবে। লিটার হিসাবে ধানের তুষ সর্বোত্তম।
- লিটারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে কীটনাশক দেয়ালে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঘরের চারপাশে পর্দা হিসাবে পলিথিন বা নাইলনের বস্তা ব্যবহার না করে চটের বস্তা ব্যবহার করা উচিত। খাঁচা পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচ বাড়ন্ত মুরগি পালন শেষে সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি। লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্লক উঠানোর পূর্বে সমস্ত ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

৬.স্বাস্থ্য সম্মত ও আদর্শ খাদ্য প্রদানঃ

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন-সালমোনেলোসিস ও ছত্রাকজনিত যেমন-এসপারজিলোসিস, আফলা টক্সিকোসিস রোগের জীবাণু খামারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সত্যিকারের ভালো খাবার বলতে জীবাণুমুক্ত ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যকে বোঝায়।

৭. মুরগির ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনাঃ

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসকারী জীবাণুনাশক অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রাতেই বেশি কার্যকর। বাতাসের তাপমাত্রা ৭০ডিগ্রি ফা. এর উপরে এবং আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে থাকলে ফরমালডিহাইড গ্যাস সবচেয়ে কার্যকর।

ক) ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড দ্রবণ):

১ কন্টেইনার ক্লোরক্স দিয়ে ৮০ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি মুরগির ঘরের মেঝে, চালা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরক্স খুবই কার্যকরী।

খ) ভায়োডিন (আয়োডিন দ্রবণ):

১ বোতল ভায়োডিন ১০% সলিউশন দিয়ে ৫ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। গামবোরো ভাইরাস মারা, হাত পা জীবাণুমুক্ত এবং মুরগির জন্য আয়োডিন যৌগ ক্লোরক্স হতে উত্তম।

গ) চুন:

চুন দিয়ে মাচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ১০০-২০০ মুরগি পালন উপযোগী একটি ঘরের মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২০ কেজি পাউডার চুন ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮.বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পানির পাত্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা:

১) পান করার জন্য মুরগির খামারে টিউবওয়েলের পানি অথবা বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকার সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত পানি অথবা ছাঁকা অথবা ১০০ লিটার পানির সাথে অন্তত ৩০০ মি. গ্রা. ক্লোরিন পাউডার মিশ্রিত করে ৩-৬ ঘণ্টা সংরক্ষণ করার পর সেই পানি সরবরাহ করা উচিত।

২) শেডে মুরগি থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একবার বেকিং সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ড্রিংকার, বাল্ব ও পাইপ লাইনে আঠালো বস্তু জমতে পারবে না। পানির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভিটামিন দেয়ার ঠিক পূর্বেই বেকিং সোডা মিশ্রিত পানি পরিচালনা করতে হবে। প্রতি গ্যালন মজুদ দ্রবণের সাথে এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিতে হবে।

৩) লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনে পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নতুন ব্যাচের ব্যবস্থাপনা:

পুনরায় মুরগি বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত চূড়ান্ত বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন-

১) সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ/সরবরাহ লাইন পরীক্ষা করতে হবে। মেরামতের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক ভাবে করতে হবে।

২) মুরগির খাঁচা, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) পানির পাত্র ও সরবরাহ লাইন প্রয়োজনে মেরামত করতে হবে।

৪) থার্মোমিটার, থার্মোস্ট্যাট, গ্যাস ব্রুডার, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

৫) আগের ব্যাচের মুরগির বিষ্ঠাগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে অথবা কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে।

৬) মুরগির খাঁচা, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৭) টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্যসমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘন্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।

৮) দ্রব্যসমূহ ভালোভাবে শুকানোর পর নতুন বাচ্চা তুলতে হবে।

জব-২ ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং

পারদর্শিতার মানদন্ড

- ব্রয়লার বাচ্চা ব্রুডিং করা
- সঠিক ভাবে টিকগার্ড স্থাপন করা
- ব্রুডারের মাধ্যমে সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা
- সঠিক জায়গায় খাদ্যপাত্র ও পানিপাত্র স্থাপন করা
- ব্রুডিং কালীন সময়ে খাদ্য, পানি, লিটার ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি আকারে	০১ টি
২	হেয়ার নেট	মাঝারি আকারে	১ সেট
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৪	চেষ্ট কভার	মাঝারি আকারে	০১ টি
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	মাঝারি আকারে	০১ জোড়া
৬	পলিথিন (ঠান্ডার জন্য)	স্ট্যান্ডার্ড	১৫ গজ

হেয়ার নেট

মাস্ক

চেষ্ট কভার

হ্যান্ড গ্লোভস

অ্যাপ্রন

চিত্র: ২.১৫ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

খ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	চিকগার্ড	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
২	লিটার	তুষ/কাঠের গুড়া	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	নিউজ পেপার	-	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	খাদ্য পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
৫	পানির পাত্র	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬	বেলচা	স্ট্যান্ডার্ড	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭	কোদাল	স্ট্যান্ডার্ড	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮	ঝাড়ু	স্ট্যান্ডার্ড	প্রয়োজন অনুযায়ী
৯	খাদ্য	স্টার্টার	প্রয়োজন অনুযায়ী
১০	টিকা-BCRDV	সরকারি টিকা	প্রয়োজন অনুযায়ী
১১	টিকা-GDV	সরকারি টিকা	প্রয়োজন অনুযায়ী
১২	ভিটামিন WS	১০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৩	ভিটামিন বি+সি	১০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৪	ইলেকট্রোলাইট	১০০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৫	ভিটামিন এডিই-৩	১০০ মিলি বোতল	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৬	ভিটামিন-বি	১০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী

গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ব্রুডার	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	০১ টি
২	সিরিঞ্জ/ভ্যাকসিনেটর	সেলসিয়াস স্কেল	০১ টি
৩	হাইগ্রোমিটার	শতকরা	০১ টি
৪	থার্মোমিটার	সেলসিয়াস স্কেল	০১ টি

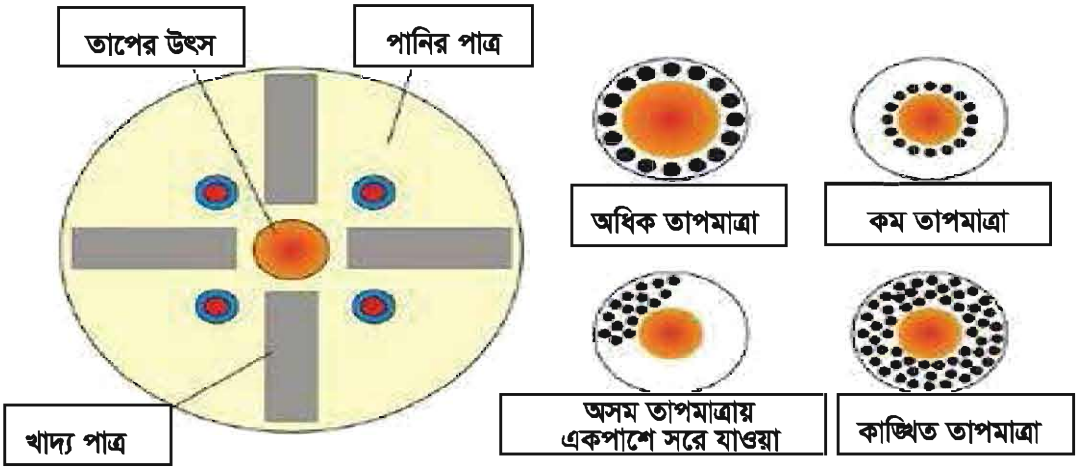

চিত্র: ২.১৬ খাদ্য ও পানি পাত্র স্থাপন এবং বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

কাজের ধাপঃ

- ব্রয়লার পালনের উপযোগী একটি ঘর নির্বাচন করো।
- ব্রুডিং হাউজ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করে নাও।
- ব্রুডিং ঘরে পরিস্কার ও শুকনো লিটার ৩"-৪" পুরু করে বিছিয়ে নাও।
- ব্রুডিং ঘরের সুবিধাজনক স্থানে ব্রুডার, চিকগার্ড, হাইগ্রোমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি সঠিকভাবে স্থাপন করো। সাধারণত ধারণ ক্ষমতা অনুসারে ৩০০-৪০০ বাচ্চার জন্য ১টি ব্রুডার প্রয়োজন।
- চিকগার্ডের ভিতরে পেপার বিছিয়ে তার উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র স্থাপন করো।
- চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়ার ১২ঘন্টা পুর্বে ভিতরে কাঙ্খিত তাপমাত্রা নিশ্চিত করো।

- প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা উঠলে খাদ্য ও পানি দেবার পর চিকগার্ডের মধ্যে একদিনের বাচ্চা ছাড় ও নিম্নের তালিকা মোতাবেক সপ্তাহ ভিত্তিক তাপমাত্রা নিশ্চিত কর।

বাচ্চার বয়স (সপ্তাহ)	ব্রুডিং তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি ফারেনহাইট	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	
১ম	৯৫	৩৫	শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ ও গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এর পর বাচ্চা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
২য়	৯০	৩২	
৩য়	৮৫	২৯	
৪র্থ	৮০	২৭	

- ব্রুডিংকালে তাপমাত্রা কম বেশি হলে বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো।
- ব্রুডিং কালে বাচ্চাকে তালিকা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ষ্টার্টার রেশন ও বিশুদ্ধ পানি পরিবেশন করো।
- নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক ঔষধপত্র ও টিকা প্রদান করো।
- ৩-৪ সপ্তাহ পর ব্রুডার এবং চিক গার্ড সরিয়ে ফেল ।
- সূচি মোতাবেক টিকা ও ঔষধ প্রদান করো।
- বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি যথাযথ হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখ।
- ব্রয়লারের বিষ্ঠা নিয়মিত পরিস্কার করো।
- সকল তথ্য রেকর্ড শিট ও রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতাঃ

১) ব্রুডিং তাপমাত্রা যাতে কম বেশী না হয় যে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২) ঔষুধ ও টিকা প্রদানের সময় পদ্ধতি ও মাত্রা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩) কোন বাচ্চা অসুস্থ কিনা তা সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে সরিয়ে ফেলতে হবে।

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্রয়লার কাকে বলে?
২. পাঁচটি ব্রয়লার হাইব্রীডের নাম লেখ।
৩. পরিপাকতন্ত্র কাকে বলে?
৪. হক কাকে বলে ?
৫. ওয়াটল কী?
৬. স্পার কী?
৭. ক্ষুদ্রান্ত্রে কয়টি অংশ ও কী কী?
৮. গির্জাডের কাজ লেখ।
৯. ব্রয়লার পালনে "অল ইন অল আউট" পদ্ধতিতে কতদিন পরপর নতুন ব্যাচ উঠাতে হবে?
১০. কয়েকটি জীবাণুনাশকের নাম লেখ।
১১. লিটার কাকে বলে?
১২. বেশি শুকনা লিটারে বাচ্চা দিলে বাচ্চার কী কী সমস্যা হয়?
১৩. লিটার হিসাবে ব্যবহৃত উপকরণ গুলোর নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্রয়লার হাইব্রিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
২. বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের ব্রয়লার হাইব্রিডের নাম উল্লেখ করো।
৩. মোরগ মুরগির বাহ্যিক অঙ্গ দেখে কী ভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ব্রয়লার এর বাসস্থান তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।
২. চিক গার্ডের অভ্যন্তরে খাবার ও পানি পাত্র কিভাবে স্থাপন করতে হবে তা বর্ণনা করো।
৩. ব্রয়লার কয়টি পদ্ধতিতে পালন করা যায়? পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।
৪. কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিটারের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে আলোচনা করো।
৫. ঘরে লিটার স্থাপনের নিয়মাবলিগুলো কী কী এবং এর পরিচর্যা পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৬. মুরগির পরিপাকতন্ত্রের বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্রয়লার মুরগির খাদ্য
Broiler Feed

মাংসল ভারী জাতের মোরগ-মুরগির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ব্রয়লার সৃষ্টি করা হয়, যাদের মাংস সুস্বাদু এবং অধিক খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ও দৈহিক বৃদ্ধি হার এর কারণে ৪-৫ সপ্তাহে প্রায় ৪-৫ কেজি খাদ্য খেয়ে ২-২.৫ কেজি ওজন হয়।

এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা-

- খাদ্য ও সুষম খাদ্য কী বলতে পারব
- ব্রয়লার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সমূহ বর্ণনা করতে পারব
- ব্রয়লারে জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণের নাম বলতে পারব
- খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের পুষ্টি উপাদান মাত্রা বর্ণনা করতে পারব
- ব্রয়লারের বিভিন্ন পর্বের সুষম খাদ্য সম্পর্কে বলতে পারব
- সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব

- সুষম খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে পারব
- ব্রয়লার ষ্টার্টার ও গ্রোয়ার রেশন তৈরির হিসাব করতে পারব
- ব্রয়লারের সুষম খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ কৌশল বর্ণনা করতে পারব
- পানির উৎস ও গুণগতমান ব্যাখ্যা করতে পারব

৩.১ খাদ্য

যে সমস্ত আহার্য দ্রব্য পোল্ট্রির শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, উৎপাদন, প্রজনন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে তাকে খাদ্য বলে। একটি ব্রয়লার খামারে মোট খরচের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগই খাদ্য বাবদ খরচ হয়।

সুষম খাদ্য (Balanced diet):

পোল্ট্রির দেহের নির্বাহী কার্য পরিচালনা, শারীরিক বৃদ্ধি, উৎপাদন, পালক গঠন ও দেহের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

৩.২ খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সমূহ ও কাজ

ব্রয়লার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (Nutrients in broiler food):

১. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
২. আমিষ বা প্রোটিন
৩. চর্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ বা ফ্যাট
৪. ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫. খনিজ পদার্থ বা মিনারল ও
৬. পানি

আমিষ বা প্রোটিন (Protein):

পোল্ট্রির দেহ গঠন ও ডিম উৎপাদনে আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোল্ট্রির দেহে আমিষ উপাদানের ২২ টি অ্যামাইনো অ্যাসিডে বিশ্লেষিত হয়। এর মধ্যে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড মুরগির দেহে উৎপন্ন হতে পারে না। এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড হিসাবে বিবেচিত করা হয়। খাদ্যে এদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত হিসাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযোজন করতে হয়।

নিম্নে ছকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এর নামগুলো দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড
১	লাইসিন
২	মিথিওনাইন
৩	সিসটিন
৪	ট্রিপটোফেন
৫	হিস্টিডিন
৬	লোসিন
৭	আইসোলোসিন
৮	ফিনাইল এলানিন
৯	গ্লাইসিন
১০	ভ্যালিন
১১	থ্রিওনিন

আমিষ বা প্রোটিনের কাজ-

- দেহের কাঠামো গঠন করে।
- দেহের বৃদ্ধি ও পেশীর ক্ষয়পূরণ করে।
- তাপ ও শক্তি উৎপাদন এবং ডিম গঠন করে।
- পালক ও রক্ত গঠন করে।
- বীর্য উৎপাদন করে।
- গ্রন্থি নিঃসৃত রস উৎপাদন করে।

শর্করা বা শ্বেতসারের কাজ (Functions of Carbohydrates):

- দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।
- দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও ডিম উৎপাদনের জন্য শক্তি সরবরাহ করে।
- দেহকে কর্মক্ষম রাখে।
- নির্বাহী কার্য পরিচালনা করে।
- চর্বি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

চর্বি বা স্নেহ পদার্থের কাজ (Functions of Fats):

চর্বি সরাসরি অথবা শর্করা হতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পাওয়া যায়, যা শক্তির আধার হিসাবে শরীরে জমা থাকে।

- তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে।
- দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- হাড়ের সন্ধিতে মসৃণতা রক্ষা করে।
- দেহের লাবণ্যতা রক্ষা করে।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ব্যবহারে সাহায্য করে।
- চর্বি থেকে আমিষ ও শর্করা অপেক্ষা ২.২৫ গুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায়।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Functions of Vitamins):

ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

(ক) চর্বিতে দ্রবণীয়: ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে ।

(খ) পানিতে দ্রবণীয়: ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।

ভিটামিন এর কাজগুলো নিম্নরূপ-

- দেহের বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ডিমের উৎপাদন ও উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।
- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখে।

খনিজ পদার্থ বা মিনারেল (Functions of Minerals):

দেহে খনিজ পদার্থের বহুবিদ কাজ রয়েছে। যেমন হাড় ও ডিমের গঠন ঠিক রাখা, দেহে এসিড ক্ষারের সমতা ঠিক রাখা এবং কোষের অসমোটিক চাপ নিয়ন্ত্রণ রাখা। বিপাক প্রক্রিয়ায় এদের অধিক কাজ রয়েছে।

প্রয়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১. মূখ্য: ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

২. গৌণ: আয়রন, কপার, কোবাল্ট, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম ইত্যাদি।

খনিজ এর কাজগুলো নিম্নরূপঃ

- শরীরের কাঠামো গঠন করে।
- হাড় ও ডিমের খোসা তৈরিতে সাহায্য করে।
- পালক ও ব্লাড সেল গঠন করে।
- গ্রন্থি নিঃসৃত রস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- হজম কাজে সাহায্য করে।

পানির কাজঃ

পানি শরীরের হজম বিপাক এবং শ্বসনে সাহায্য করে। মুরগির বিপাক এবং পুষ্টির জন্য পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। পানি মুরগির শরীরে পুষ্টি উপাদান (ভিটামিন, মিনারেল, এমাইনো এসিড) বহনে, এনজাইমেটিক এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করে।

- খাদ্য পরিপাক, পাচন ও পুষ্টি পরিবহন করে।
- বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- পানি মূলত দেহাভ্যন্তরে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজঃ

চর্বিতে ও পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর নাম লেখ।

৩.২ ব্রয়লারের জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ

ব্রয়লারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। যে উপকরণের মধ্যে যে উপাদান বেশি মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাকে সেই উপাদান যুক্ত খাদ্য বলে।

পুষ্টি উপাদানের অধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপকরণকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. শর্করা জাতীয় উপকরণ

২. আমিষ জাতীয় উপকরণ

৩. চর্বি বা তৈল জাতীয় উপকরণ

৪. খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ

৫. ভিটামিন জাতীয় উপকরণ

শর্করা জাতীয় উপকরণ আবার দুইভাগে বিভক্ত, যেমন-

- দানা জাতীয় খাদ্য
- আঁশ জাতীয় খাদ্য

দানা জাতীয় খাদ্য	আঁশ জাতীয় খাদ্য
ভুট্টা, গম ,চাল, কাওন, চালের খুদ, সরগম, যব	চালের মিহি কুড়া, গমের ভুষি, বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি

আমিষ জাতীয় উপকরণ দুইভাবে বিভক্ত, যেমন-

- প্রাণিজ আমিষ খাদ্য
- উদ্ভিজ আমিষ খাদ্য

প্রাণিজ আমিষ খাদ্য	উদ্ভিজ আমিষ খাদ্য
বিভিন্ন মাছের শুঁটকি, মৎস্য উপজাত, চিংড়ি মাছ ও তার উপজাত পশুর নাড়িভুঁড়ি ও হাড়ের গুঁড়া-প্রোটিন কনসেনট্রেট, রক্তের গুঁড়া, হাঁস-মুরগির উপজাত, হ্যাচারি উপজাত, ঝিনুক ও শামুকের মাংস, কেঁচো মিল ও ননীযুক্ত গুঁড়া দুধ।	সয়াবিন খৈল, তিলের খৈল, নারিকেল খৈল, তিসির খৈল, তুলা বীজের খৈল।

চর্বি জাতীয় উপকরণঃ

চর্বি জাতীয় উপকরণ
সয়াবিন মিল,হাঁস-মুরগির তেল, তিলের খৈল, গবাদিপশুর চর্বি (তাল্লু), নারিকেল মিল, মাছের তেল সূর্যমুখী তেল

খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণঃ

খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ :
ঝিনুক খোসা চূর্ণ, শামুক খোসার চূর্ণ, বোন মিল, ডিমের খোসা চূর্ণ, ফিস মিল,ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি), চুনা পাথর, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সাধারণ লবণ, ম্যাঙ্গানিজ লবণ

ভিটামিন জাতীয় উপকরণঃ

শাকসবজি, মাছের তেল, অংকুরিত গম ও ছোলা, হলুদ ভুট্টা, সবুজ ঘাস, চালের মিহি কুড়া ইত্যাদিতে কমবেশি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন থাকে। তারপরও খাদ্যের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন প্রিমিক্স হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের শ্রেণির নাম	খাদ্য উপকরণের নাম
১	শর্করা জাতীয় উপকরণ	
২	আমিষ জাতীয় উপকরণ	
৩	চর্বি বা তৈল জাতীয় উপকরণ	
৪	খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ	
৫	ভিটামিন জাতীয় উপকরণ	

৩.৩ খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমাণ

ক্রঃ নং	খাদ্য উপকরণের নাম	বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ কেজি)	আমিষ (ক্রুড আমিষ) %	চর্বি বা (ক্রুড ফ্যাট) %	খনিজ পদার্থ %	আঁশ (ক্রুড ফাইবার) %	মিথাইওনিন	লাইসিন %	সিসটিন %	ক্যালসিয়াম %	ফসফরাস %
১	গম	৩১০০	১০.৫	১.৯	১.৪০	২.৪	০.২	০.৩৮	০.২২	০.০৪	০.৩৯
২	ভূট্টা	৩৪০০	৮.৫	৪.০	১.১	২.০	০.১৯	০.২১	০.১৬	০.০২	০.২৭
৩	চালের ক্ষুদ	৩০০০	৮.০	৩.৮	-	০.৭০	০.১৯	০.২০	০.১০	০.০৩	০.৩৩
৪	জোয়ার	৩৩০০	১০.৫	৩,০	১.২	২.৫	০.১৩	০.২	০.১৫	০.০৪	০.৩২
৫	ঝোলাগুড়	১৯৬০	৩.০	০.১	১.৫					০.৯	০.১
৬	গমের ভুষি	১১০০-১৩০০	১৩-১৫	০.১৭	১.৫	১০	০.১৭	০.৫	০.২	০.১১	১,২১
৭	চালের মিহি কুড়া	২৯৫০	১২	১২	০৮	১০	০.৩১	০.৫৯	০.৩৭	০.১৪	১.৪৯
৮	সয়াবিন মিল	২২৪৪	৪৪	০.৫	০৬	৫.২	০.৬৩	২.৮২	০.৬৭	০.৩	০.৬
৯	নারিকেলের খৈল	১৩৫০	২৫	৮.৫	০৭	১২	০.৩	০.৬	০.৬১	০.২	০২
১০	সরিসার খৈল	২০০০-২২০০	৩৫.৮	১২.৭	১০.৭	০৯	০.৯২	১.৬৭	-	০.৮৩	০.২১
১১	তিলের খৈল	২৪৬৪	৩১	০৭	৫.৫	৬.৫	১.৪	১.৩	০.৫৭	২	০.১৩
১২	শুটকি গুঁড়া	২৬৫০	৪০-৫৫	১	৪২	০.৪	২.৭	১.৮	০.৮	৩.৮	২.৫
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট	২৭০০-২৮০০	৫৫-৬০	০৮	-	০.৫	-	-	-	৩	২.৩
১৪	শুকনা রক্ত	২৭৫০	৭৫-৮৩	১.৬	২৩	-	০.৯	৬.৯	১.৪	০.২৮	০.২২
১৫	পোল্ট্রি নাড়ি ভূড়ি সিদ্ধ	২৯০০	৫৮	১৩.৫	২০	-	১.১	২.৬	-	৩.৬	২.২
১৬	ফেদার মিল	২৩০০	৮০	২.৫	১০.৫	০১	০.৫	১.৫	০৩	০.২	০.৬
১৭	মাছের তেল	৭৬৭৮	৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	হাড়ের গুঁড়া	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪	১২
১৯	ঝিনুক	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৭	-
২০	চুনাপাথর	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩	-

৩.৪ সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. খাদ্য সামগ্রী বা উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা:

সুষম খাবার তৈরিতে পরিচিত ও সহজলভ্য উপকরণ নির্বাচন করা উচিত। পরিচিত উপকরণের গুণগতমান সহজে জানা যায়। স্থানীয় মূল্য যাচাই করা যায়। কোনো উপকরণের ঘাটতি পড়লে সহজে সংগ্রহ করা যায়। সহজলভ্য উপকরণের পরিবহন খরচ কম হয়। বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও মজুদ করা যায়।

২. খাদ্যের গুণগতমান:

প্রস্তুত খাদ্য অবশ্যই গুণগতমানের হওয়া উচিত, খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বে প্রতিটি উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) পরীক্ষা করতে হয়। কোনো প্রকার পচা, ছত্রাকযুক্ত, পোকা যুক্ত অথবা গন্ধযুক্ত খাবার ব্যবহার করা যাবে না। খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহে যেন কোনো অবস্থাতেই চাকা লেগে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যে সমস্ত কারণে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়, তা হলো-

- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে
- উপকরণে আর্দ্রতা (১২% এর উপরে হলে) বেশি থাকলে
- বেশি পুরোনো হলে
- সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করার ফলে
- পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণে
- ঘরের মেঝে ভিজা ও আর্দ্র থাকলে
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকলে
- খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় কীটনাশক ব্যবহার করলে
- ভেজাল থাকলে
- ছত্রাক ও মোল্ডযুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করলে

৩. উপকরণের মূল্য:

খাদ্য উপকরণ যত সস্তায় সংগ্রহ করা যায়, খাদ্য প্রস্তুতে খরচের তত সাশ্রয় হয়। ফলে মাংস ও ডিম উৎপাদনে খরচ কমে যায়। খামারে মোট খাদ্য খরচের ৬৫-৭৫ ভাগ পর্যন্ত খরচ হয় খাদ্যের জন্য। মানুষের খাদ্য উপকরণের সাথে প্রতিযোগিতা কমাতে যথদূর সম্ভব সস্তায় বিকল্প খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

৪. খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতাঃ

রুচিসম্মত খাদ্য না হলে পোল্ট্রি খায় না। দানা জাতীয় খাদ্য বেশি মিহি হলে পোল্ট্রি কম খায়। কোনো উপকরণের দানা বড় থাকলে পোল্ট্রি বেছে বড় দানা আগে খায়, ফলে অন্যান্য উপাদান তলে পড়ে থাকে। বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপকরণের মিশ্রণ সুষম হতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের দানা যতদূর সম্ভব সুষম হতে হবে। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত থাকলে এবং খাদ্য পচা ও ছত্রাকযুক্ত হলে ব্রয়লার মুরগি খাদ্য পছন্দ করবে না। ক্রাম্বল ও পিলেট খাদ্য ব্রয়লার মুরগি বেশি পছন্দ করে।

৫. জাতঃ

হালকা জাতের ব্রয়লারের জন্য ২ প্রকার মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় ২ ধাপে। ভারী জাতের ব্রয়লারের জন্য ৩ ধাপে ৩ প্রকারের খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

৬. লিঙ্গঃ

পুরুষ ব্রয়লার স্ত্রী ব্রয়লারের তুলনায় ২০-২৫% বেশি খাদ্য খায়, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত খাদ্যকে মাংসে রূপান্তর করতে পারে।

৭. ওজনঃ

ব্রয়লারের ওজন বৃদ্ধি সমানুপাতে না হলে খাদ্যে আমিষের হার বৃদ্ধি করতে হয়। দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে চর্বি জাতীয় উপাদানের ব্যবহারের হার পুনঃবিন্যাস করতে হয়।

৮. আবহাওয়াঃ

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যে পুষ্টিমান পুনঃবিন্যাস করতে হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

খাদ্য উপকরণের বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ কেজি), আমিষ (ক্রুড প্রোটিন) % লেখ

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ কেজি)	আমিষ (ক্রুড প্রোটিন) %	মন্তব্য
১	গম			
২	ভূট্টা			
৩	চালের ক্ষুদ			
৪	জোয়ার			
৫	ঝোলাগুড়			
৬	গমের ভুষি			
৭	চালের মিহি কুড়া			
৮	সয়াবিন মিল			
৯	নারকেল খৈল			
১০	সরিষার খৈল			
১১	তিলের খৈল			
১২	শুটকি গুঁড়া			
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট			
১৪	শুকনা রক্ত			
১৫	পোল্ট্রি নাড়ি ভূড়ি সিদ্ধ			
১৬	ফেদার মিল			

৩.৫ ব্রয়লারের বিভিন্ন বয়সের পুষ্টির চাহিদা:

পুষ্টি উপাদান	স্টার্টার (১-৩ সপ্তাহ)	ফিনিশার (৪-৫ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি খাদ্য)	২৯০০	৩০০০
ক্রুড প্রোটিন (%)	২২-২৩	১৯
ক্যালসিয়াম (%)	১.০০	১.০০
ফসফরাস (%)	০.৪৫	০.৪৫
লাইসিন (%)	০.৮৬	০.৮৬
মিথিওনিন (%)	০.৪৩	০.৪৫

৩.৬ বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োগ মাত্রা :

উপাদান	সর্বোচ্চ ব্যবহার মাত্রা (%)
ভুট্টা	৬০
গম	৫০
চালের কুড়া	১৫-২০
গমের ভুষি	১০
সয়াবিন মিল	৪০
তিলের খৈল	১০
সরিষার খৈল	৫
সূর্যমুখী খৈল	২০
শুটকি মাছের গুঁড়া	১০
রক্তের গুঁড়া	৩
পোল্ট্রির উপজাত	৫
লবণ	০.৩-০.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	১-২
ঝিনুক	১-৩
লাইম স্টোন	১-৩
অ্যান্টিবায়োটিক	০.১-০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	উৎপাদনকারীর পরামর্শ মতো

৩.৭ ব্রয়লারের রেশন তৈরিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার ও পরিমাণ নির্ধারন

খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার

পুষ্টি উপাদান (কেজিতে)	স্টার্টার (০-৩ সপ্তাহ)	ফিনিশার (৪-৫ সপ্তাহ)
ভুট্টা	৪২	৪৭
গম	১৩	১২
চালের কুড়া (অটো)	১৩	১৫
সয়াবিন মিল	২২	১৮
প্রোটিন কনসেনট্রেট	০৮	৬
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.২৫	১.২৫
লবণ	০.৩০	০.৩০
লাইসিন	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫
প্রাপ্ত পুষ্টি	১০০	১০০
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৯১৮	২৯৯৬
ক্রুড প্রোটিন (%)	২১.১৩	১৯.১০
ক্যালসিয়াম (%)	১.২৩	০.৯৭
ফসফরাস (%)	০.৮৩	০.৬৬
লাইসিন (%)	১.০০	০.৮৫
মিথিওনিন (%)	০.৪৪	০.৩৬

ব্রয়লার ষ্টার্টার রেশন তৈরির হিসাবঃ

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১	ভুট্টা ভাঙা	২৬	২৬×৩৩৭০=৮৭৬২০	২৬×৯/১০০= ২.৩৪	২৬×০.০২/১০০= ০.০০৫২	২৬×০.১০/১০০ =০.০২৬০
২	গম ভাঙা	২৬	৮৪৫০০	৩.১২	০.০১০৪	০.০৩৩৮
৩	চালের কুড়া	১৭	৪৮৬২০	২.০৪	০.০০৬৮	০.০২৭২
৪	শুটকি মাছের গুড়া	১৩	৩৪৩২০	৭.১৫	০.৫২	০.৩৬৮
৫	তিলের খৈল	১৩	২৪৮৩০	৪.৫৫	০.২৬	০.০৩৯
৬	ঝিনুক চূর্ণ	০১	-	-	০.৩৭	-
৭	হাড়ের গুঁড়া	০.৫	-	-	-	-
৮	লবণ	০.২৫	-	-	-	-
৯	রক্তের গুঁড়া	৩	৮২৫০	২.৪	০.০০৯	০.০০৭৫
১০	এন্ডাভিট জিএস	০.২৫				
১১	মোট	১০০	২৮৮১৪০	২১.৬০	১.১৮১৪	০.৪৯৭৫
তৈরিকৃত রেশন		১০০ কেজি	২৮৮১৪০ কিলোক্যাঃ বা ২৮৮১ কিলোক্যাঃ/কেজি	২১.৬০%	১.১৮১৪%	০.৪৯৭৫%
রেশনের পুষ্টিমানের চাহিদা			২৯০০ কিলোক্যাঃ/কেজি	২২%	১%	৫%

ব্রয়লার ফিনিসার রেশন তৈরির হিসাবঃ

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১	ভুট্টা ভাঙা	২৬	৮৭৬২০	২.৩৪	০.০০৫২	০.০২৬
২	গম ভাঙা	২৬	৮৪৫০০	৩.১২	০.০১০৪	০.০৩৩৮
৩	চালের কুড়া	১৭	৪৮৬২০	২.০৪	০.০০৬৮	০.০২৭২
৪	শুটকি মাছের গুড়া	১৩	৩৬৯৬০	৭.০	০.৫৬০	০.৩৯২০
৫	তিলের খৈল	১৩	২৪৮৩০	৪.৫৫	০.২৬	০.০৩৯০
৬	ঝিনুক চূর্ণ	০১	-	-	০.৩৭	-
৭	হাড়ের গুঁড়া	০.৫	-	-	০.১২	০.০৬
৮	লবণ	০.২৫	-	-	-	-
৯	রক্তের গুঁড়া	৩	৮২৫০	২.২৫	-	-
১০	এন্ডাভিট জিএস	০.২৫				
১১	মোট	১০০ কেজি	২৯০৭৮০ কিলোক্যাঃ	২১.৫০%	১.৩৩২৪	০.৫৭৮
তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান			২৯০৭.৮ কিলোক্যাঃ/কেজি	২১.৫০%	১.৩৩২৪%	০.৫৭৮%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা			২৯০০ কিলোক্যাঃ/কেজি	২২-২৩%	১৯%	৫%

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজঃ

ব্রয়লার স্টার্টার রেশন তৈরি করো ,যার বিপাকীয় শক্তি ৩০০০ (কিলোক্যালোরি) ক্রুড প্রোটিন ২২%

ক্র. নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা					
২	গম ভাঙ্গা					
৩	চালের কুঁড়া					
৪	শুটকি মাছের গুড়া					
৫	তিলের খৈল					
৬	ঝিনুক চূর্ণ					
৭	হাড়ের গুঁড়া					
৮	লবণ					
৯	রক্তের গুঁড়া					
১০	এন্ডাভিট জিএস					
১১	মোট					
১২	তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান					
১৩	রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা					

৩.৮ সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ

ব্রয়লারের সুষম খাদ্য তৈরি ধাপঃ

- প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে
- যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভুট্টা, গম, কুড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে
- খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে
- পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে এক সঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে
- এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তুপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে
- এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে
- সমস্ত মিশ্রণকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে
- এ ধরনের মিশ্রিত গুড়া খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে

মুরগির জন্য ৩ প্রকৃতির খাদ্য ব্যবহার করা হয়, যথা-

ম্যাশ খাদ্য :

সমস্ত উপকরণ একত্রে মিশানোকে ম্যাশ খাদ্য বলে। হাতে মিশ্রণ করলে প্রথমে পরিমাণে অল্প উপকরণসমূহ একত্রে মিশাতে হয়। ক্রমান্বয়ে বেশি উপকরণের সাথে একত্র করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে মিশালে সুষম হয়।

চিত্রঃ-৩.১ ম্যাশ খাদ্য

পিলেট:

খাদ্যকে লোহার জালিযুক্ত ছাকনির মধ্য দিয়ে যন্ত্রের সাহায্য চাপ প্রয়োগ করলে পিলেট তৈরি হয়। পিলেট ব্যবহার করলে খাদ্যের অপচয় কমে ও মুরগি বেশি পছন্দ করে। ব্রয়লারের জন্য এ খাদ্য বেশি ব্যবহার হয়।

চিত্র: ৩.২ মুরগির বিভিন্ন ধরণের পিলেট খাদ্য

ক্রাম্বল খাদ্য:

ম্যাশ খাদ্যের অন্য প্রকৃতি ক্রাম্বল খাদ্য। ক্রাম্বল খাদ্যের দানা পিলেট দানার চেয়ে ছোট। এ খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের অপচয় কম হয়। পিলেটের মতই যন্ত্রের সাহায্যে ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। ব্রয়লারের স্টার্টার রেশন হিসাবে এই খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: ৩.৩ ক্রাম্বল খাদ্য

৩.০৯ ব্রয়লারের সুষম খাদ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ:

সংরক্ষণ:

স্থানীয় ভাবে তৈরিকৃত খাদ্য ৭-১০ দিন,কারখানার তৈরিকৃত খাদ্য ০-৪৫ দিন সংরক্ষণ করা হয়।

সরবরাহ:

- ব্রয়লারের খাবার পাত্রে সবসময় খাদ্য রাখতে হবে
- ব্রয়লার স্বাধীনভাবে খাদ্য খাবে
- গরমের দিনে খাদ্যকে ২৫:২৫:৫০ অনুপাতে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে
- শীতের দিনে ২০:৫০:৩০ অনুপাতে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে

ব্রয়লারের খাদ্য পাত্রের ধরন ও সংখ্যা

খাদ্য পাত্র	বিবরণ	বয়স ০-২ সপ্তাহ	বয়স ৩-৫ সপ্তাহ
চিক ফিডার	দৈর্ঘ্য = ২ ফুট প্রস্থ = ১-৩ ইঞ্চি	৭-৮ টি/৫০০ বাচ্চা	-
খাবার পাত্র	গোলাকার ফিডার	১০ টি/৫০০ বাচ্চা	২০ টি/৫০০ বাচ্চা
	ট্রাফ ফিডার	বাচ্চাবাচ্চা ও বাড়ন্ত বাচ্চা প্রতি স্থান ২-২.৫ ইঞ্চি	

চিত্র: ৩.৪ ব্রয়লারের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পাত্র

চিত্র:৩.৫ ব্রয়লারের বিভিন্ন ধরণের পানির পাত্র

৩.০৯ পানির উৎস ও গুনগতমান:

ব্রয়লারের সুস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক পানিবাহিত রোগের ও কৃমির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করলে। তাই খামারি যে পানি নিজে পান করেন ঠিক সে পানি পোল্ট্রিকে সরবরাহ করতে হবে। পানির উৎস ও গুণগতমান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

- ব্রয়লার খাদ্য ছাড়া কয়েক দিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে
- ব্রয়লার অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পানি পান করতে পছন্দ করে। কিন্তু বাচ্চার প্রথম দিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করা উচিত
- সাধারণভাবে পানি গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের দ্বিগুণ হয়। তবে গরমের সময় ৩-৪ গুণ হয়
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ৩ ঘন্টা পূর্বে পানি দিতে হয় ও ব্রুডার চালু করতে হয়। এতে পানি কিছুটা গরম হয়। বাচ্চার জন্য প্রথম পানি ঠান্ডা হওয়া উচিত নয়
- বৎসরে ১-২ বার পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করানোর ভালো
- পানিতে অতিরিক্ত খনিজ দ্রব্য থাকলে পানির স্বাদ কমে যায়। ফলে ব্রয়লার পানি পান করা কমিয়ে দিতে পারে। তাই পানিতে ক্ষারতা পরীক্ষা করে পানি খাওয়াতে হবে
- ব্রয়লারের পানীয় জল ঠান্ডা, পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও লবণমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়
- পানির পাত্র প্রতিদিন জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে, না হলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করলেও তা পরিষ্কার থাকবে না
- পানির পাত্রের উপর লোহার গ্রিল দিলে বাচ্চা পাত্রের উপর উঠতে পারে না বা মল ত্যাগ করে পানিকে দূষিত করতে পারে না
- প্রতিদিন পুরাতন পানি বদলিয়ে নতুন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে

২০২৩

- পানি শোধনের জন্য ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়, যেমন- ব্লিচিং পাউডার, ১০০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে। অথবা যে কোনো পানি বিশোধক বড়ি মেশানো যেতে পারে।
- ভ্যাকসিন বা ঔষধ খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন পানি ব্যবহার করা উচিত নয়
- পানি গরম হলে তা ঘন ঘন পরিবর্তন করে দিতে হবে
- ডিপ টিউবয়েলের পানিতেও কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। তাই এই পানির মান পরীক্ষা করতে হবে। তবে টিউবয়েলের পানি সর্বোৎকৃষ্ট
- পানিতে p^H কন্ট্রোলার ব্যবহার পানির p^H কমিয়ে ৫ এ আনা যায়। এতে পানিতে মেশানো ভিটামিন ও অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে

বয়স অনুযায়ী ব্রয়লারের পানির পাত্রের ধরন ও সংখ্যা:

পানির পাত্রের ধরন	০-২ সপ্তাহ বয়স	৩-৫ সপ্তাহ বয়স
চিক ড্রিংকার (ব্যাস=১.৪", পরিধি=৩' ২")	প্রয়োজন মতো	-
ট্রাফ ড্রিংকার	১/২" প্রতি বাচ্চা প্রতি পাত্রে ১০০ বাচ্চা	১" প্রতি বাচ্চা প্রতি পাত্রে ৫০ বাচ্চা
বিল ড্রিংকার	১টি/১০০ বাচ্চা	১ টি/৫০-৭৫ বাচ্চা
নিপল ড্রিংকার	-	প্রতি নিপল/১২-১৫ বাচ্চা

চক ড্রিংকার

বিল ড্রিংকার

নিপল ড্রিংকার

চিত্র: ৩.৬ বিভিন্ন ধরনের পানির পাত্র

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- পানিশোধনের জন্য কি ব্যবহার করা হয়?
- ভ্যাকসিন বা ঔষধ খাওয়ানোর সময় কি পানির সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়?

জব-৩ ব্রয়লার খাদ্য উপকরসমূহ সনাক্তরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১) ব্রয়লার রেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করা

২) খাদ্য উপকরণ সমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তথ্য চিহ্নিত করা

৩) খাদ্য উপকরণসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২	হেয়ার নেট	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	-	০১ টি
৪	চেষ্ট কভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫	হ্যান্ড গ্লোভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

খ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	গম/ গম ভাঙ্গ	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
২	ভূট্টা/ভূট্টা ভাঙ্গা.	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৩	রাইস পোলিশ	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৪	গমের ভূষি	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৫	তিলের খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৬	সরিষার খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৭	নারিকেল খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৮	বাদাম খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
৯	সয়াবিন ভাঙ্গা	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
১০	সয়াবিন মিল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
১১	ফিস মিল (বিদেশী)	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
১২	শুটকি মাছ (দেশী)	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	১ কেজি
১৪	রক্তের গুড়া	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	২০০ গ্রাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	প্লাস্টিক ড্রাম	১০০ কেজি ধারন ক্ষমতা	১টি
২	প্লাস্টিকের জার	ট্রান্সপারেন্ট	১৪টি

কাজের ধারাঃ

১. বাজার ও বিভিন্ন উৎস থেকে ব্রয়লার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করো;

২. খাদ্য উপকরণ সমূহের সঠিক পুষ্টিমান বই পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করো;

৩. খাদ্য উপাদান সমূহের উৎকৃষ্ট মান যাচাই করো, যেমন- দানাদার অবস্থা, আর্দ্রতা, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি সঠিক ভাবে আছে কিনা যাচাই করো;

বাংলাদেশে সাধারনত নিম্নলিখিত খাদ্য উপাদানসমূহ পোল্ট্রি খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। যাদের পুষ্টিমানের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	শক্তি (কি. ক্যাল/ কেজি)	আমিষ (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
শর্করা জাতীয় খাদ্য					
গম		ভুট্টা		রাইস পলিশ	
১	গম/গম ভাঙা				
২	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙা				
৩	রাইস পলিশ				
৪	গমের ভুষি				

আমিষ জাতীয় খাদ্য

সরিষার খৈল

তিলের খৈল

সয়াবিন মিল

শুটকি মাছ (দেশী)

শুটকি গুড়া

প্রোটিন কনসেনট্রেড

বোন মিল

বাদাম

পোল্ট্রি উপজাত

১	তিলের খৈল				
২	সরিষার খৈল				
৩	নারিকেল খৈল				
৪	বাদাম খৈল				
৫	সয়াবিন ভাঙ্গা				
৬	সয়াবিন মিল				
৭	ফিস মিল (বিদেশী)				
৮	শুটকি মাছ (দেশী)				
৯	প্রোটিন কনসেনট্রেট				
১০	রক্তের গুড়া				

সয়াবিন তৈল

চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদান					
১	সয়াবিন তৈল		-	-	-

খনিজ জাতীয় উপাদান

শামুক ঝিনুকের খোসা ভাঙ্গা

হাড়ের গুড়া

লবন

১	হাড়ের গুড়া				
২	শামুক ঝিনুকের খোসা ভাঙ্গা				
৩	ডিমের খোসা				
৪	চুনা পাথর				
৫	লবন				

এছাড়াও পোল্ট্রি খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম ভিটামিন ও খনিজ উৎস, ছত্রাক ও টক্সিন বাইন্ডার, এনজাইম, কৃত্রিম এমাইনো এসিড ইত্যাদি ব্যবহার করুন। যেমনঃ

ক) ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স- জি এস, ভন্ট্রিউ এস

খ) ছত্রাক বাইন্ডার- মোল্ড ষ্টপ, সরবাটক্স

গ) টক্সিন বাইন্ডার-ডট, ইএসবি-৩

ঘ) কৃত্রিম অ্যামাইনো এসিড- লাইসিন, মিথিওনিন

ঙ) ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি

৪. প্রতিটি উপাদানের পুষ্টিমান সঠিক ভাবে জেনে নিয়ে মান ও ব্যবহার অনুযায়ী গ্রুপে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করো;

৫. এরপর প্রতিটি খাদ্য উপাদানের নমুনা পৃথক ভাবে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জারে রেখে তার গায়ে নাম লিখে রাখ;

৬. কাজ শেষে কক্ষটি পরিস্কার করে খাদ্য উপাদানসহ প্লাস্টিকের জার গুলো সুন্দর ভাবে শুস্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সাজিয়ে রাখ।

সতর্কতা:

১) নির্ভরযোগ্য উৎস হতে খাদ্যের পুষ্টিমান সংগ্রহ করো।

২) খাদ্য উপকরণ সমূহ সঠিকভাবে লেবেলিং করে শুস্ক ও ঠান্ডা জায়গায় রাখ যাতে সহজে নষ্ট না হয়।

৩) কোন ভাবেই ভেজাল বা নিম্নমানের খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করবে না।

জব- ৫ ব্রয়লারের সুষম রেশন তৈরি

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- বয়স অনুসারে বিভিন্ন ধরণের সুষম রেশন তৈরি করা
- অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক খাদ্য সরবরাহ করা
- খামারে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
২	হেয়ার নেট	মাঝারি মাপের	১ সেট
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৪	চেষ্ট কভার	মাঝারি মাপের	০১ টি
৫	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৬	কাগজ, কলম, পেন্সিল	-	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭	পলিথিন সীট	-	১০ পজ

হেয়ার নেট

মাস্ক

চেষ্ট কভার

হ্যান্ড গ্লাভস

অ্যাপ্রন

চিত্র ১.২১ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

খ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	গম/ গম ভাঙ্গা	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
২	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	রাইস পোলিশ	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	গমের ভুষি	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৫	তিলের খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬	সরিষার খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭	নারিকেল খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮	বাদাম খৈল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
৯	সয়াবিন ভাঙ্গা	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১০	সয়াবিন মিল	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১১	ফিস মিল (বিদেশী)	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১২	শুটকি মাছ (দেশী)	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৪	রক্তের গুড়া	ফাংগাস মুক্ত খাদ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৫	বস্তা	চটের	১০ টি

গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	প্লাষ্টিক ড্রাম	১০০ কেজি ধারন ক্ষমতা	১টি
২	ক্যালকুলেটর	সায়েন্টিফিক	১টি
৩	ডিজিটাল ব্যালেন্স	১০০ কেজি মাপার উপযোগি	১টি
৪	বেলচা	স্টিলের	১টি

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (যদি প্রয়োজন হয়):

কাজের ধারাঃ

১) বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী ব্রয়লার রেশনের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা সংগ্রহ করো

২) বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপানের পুষ্টি তালিকা সংগ্রহ করো

৩) সকল ধরনের পুষ্টি উপাদান যুক্ত খাদ্য উপকরণ সমূহ ব্যবহার করে সুষম রেশন ফরমুলেশন করো

৪) ফরমুলেশনকৃত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য উপাদান সমূহ মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ

৫) কম পরিমানে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদান সমূহ একত্রে ভাল ভাবে মিশাও।

৬) এরপর কম পরিমানে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ পর্যায়ক্রমে বেশী পরিমানে উপাদান সমূহের সাথে মিশাও।

৭) খাদ্য উপাদান মিশানো শেষ হলে পুনরায় ভালভাবে উল্টেপাল্টে মিশাও যাতে সকল উপাদান সমভাবে মিশ্রিত হয়।

৮) তৈরীকৃত খাদ্য ঠান্ডা ও শুস্ক জায়গায় বস্তায় সংরক্ষণ করি। উক্ত মিশ্রিত খাদ্য ঋতু ভেদে ৭-১০ দিন সংরক্ষণ করা যাবে।

৯) নিম্নে ব্রয়লার মুরগির নমুনা খাদ্য তালিকা অনুযায়ী রেশন তৈরি করব।
ব্রয়লার খাদ্য তালিকা:

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	প্রি-স্টারটার (০-১৪দিন)	স্টারটার (১৫-২৮ দিন)	ফিনিসার (২৮-বিক্রি পর্যন্ত)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা (কেজি)			
২	সয়াবিন মিল(কেজি)			
৩	রাইস পলিস (কেজি)			

৪	প্রোটিন কনসেনট্রে৬০%(কেজি)			
৫	বোনমিল মিটমিল৫০%(কেজি)			
৬	সয়াবিন তেল (কেজি)			
৭	ডিসিপি (কেজি)			
৮	ক্যালসিয়াম (কেজি)			
৯	লবণ(কেজি)			
১০	সোডিয়াম বাই কার্বনেট (কেজি)			
১১	ভিটামিন প্রিমিক্স (কেজি)			
১২	এনজাইম (কেজি)			
১৩	কক্সিডিওস্ট্যাট (কেজি)			
১৪	সালকিন/সালষ্টপ (কেজি)			
১৫	সর্বাটক্স/মন্ডষ্টপ (কেজি)			
১৬	মিথিওনিন			
১৭	লাইসিন			
	মোট			

সতর্কতাঃ

১) কম পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ খুবই সাবধানতার সাথে মাপ ও মিশাও যাতে সকল খাদ্যের সাথে সমভাবে মিশে যায়।

২) রেশন ফরমূলেশনের সময় হিসাব বারবার যাচাই কর যেন ভুল না হয় ও অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হয়।

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য কী?
২. মুরগির খামারে মোট খরচের শতকরা কত ভাগ খাদ্য খরচ?
৩. মুরগির খাদ্য উপাদান কয় প্রকারের ও কী কী?
৪. প্রয়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থ কত প্রকার ও কী কী?
৫. অতীব প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের নামগুলো লেখ।
৬. ব্রয়লারে খাদ্য উপকরণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
৭. আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণ কয়ভাগে বিভক্ত?
৮. প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণগুলোর নাম কী কী?
৯. উদ্ভিদ আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণগুলোর নাম কী কী?
১০. ভিটামিন জাতীয় উপকরণগুলো নাম কী কী?
১১. সুষম খাদ্য কাকে বলে?
১২. ট্রাফ ড্রিংকারে বাচ্চা প্রতি কত জায়গা প্রয়োজন?
১৩. সরবরাহকৃত পানির উৎসের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শর্করার কাজ কী?
২. আমিষের কাজ কী?
৩. চর্বির কাজ কী?
৪. ভিটামিনের কাজ কী?
৫. খনিজ পদার্থের কাজ কী?
৬. খাদ্যের গুণগতমাণ নষ্ট হওয়ার কারণ কী?
৭. আবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোর নাম লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করো।
২. খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার সর্বোচ্চ মাত্রা লেখ।
৩. ব্রয়লারের স্টার্টার রেশন ও ফিনিশার রেশন তৈরি করো।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রয়লার মুরগির রোগ-ব্যাধি

Diseases of Broiler Chicken

ব্রয়লার মুরগির মৃত্যুর হার খুব বেশি হলে একজন ব্রয়লার পালনকারীর কাছে তা বিরাট সমস্যা। মৃত্যুর হার বেশি দেখে যেকোনো পালনকারী নিরুৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক। তবে সতর্ক দৃষ্টি ও ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমানো যায়। মাত্র কয়েকটি রোগ ছাড়া বেশির ভাগ রোগকে নিরাময় করা যায় না। তাই যেকোনো রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ব্রয়লার রোগ ও রোগের শ্রেণি বিভাগ করতে পারব
- রাণীক্ষেত রোগের কারণ, সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- এভিয়ান-ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব

- ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগের কারণ, সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ককসিডিওসিস রোগের কারণ, সংক্রমন, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্রয়লারের পুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্রয়লারের টিকা প্রদান কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারব
- খামারের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব

৪.১ ব্রয়লারের রোগ ও রোগের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Broiler Doseases):

পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার পরও যদি শরীরের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে তাকে রোগ বলে। অর্থাৎ যেকোনো প্রাণির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় রুপান্তরকেই রোগ বলে।

ব্রয়লার মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা যা:

- সংক্রামক রোগ (Contagious Diseases)
- অসংক্রামক রোগ (Non-contagious diseases)
- পরজীবী ঘটিত রোগ (Parasitic Diseases)
- অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Diseases)

সংক্রামক রোগ (Contagious Disease)

যে সমস্ত রোগ জীবাণু মাধ্যমে অসুস্থ পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। এদেরকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়, যথা-

ভাইরাস জনিত	ব্যাকটেরিয়া জনিত	মাইকোপ্লাজমা জনিত	ছত্রাক জনিত	প্রটোজোয়া জনিত	অন্যান্য
রানীক্ষেত **গামবোরা** **এভিয়ান-ইনফুয়েঞ্জা**	সালমোনেলোসিস কলিবেসিলোসিস ইনফেকশাস করাইজা নেক্রেটিকএন্টারাইটি ওম্ফ্যালাইটিস	মাইকোপ্লাজমোসিস	সালমোনেলোসিস আফলাটক্সিকোসিস	ককসিডিওসিস	অ্যাসাইটিস

২. অসংক্রামক রোগ (Non-contagious diseases):

যে সমস্ত রোগ জীবাণু বা জীবিত বস্তুর উপস্থিতি ছাড়া জীব দেহে হঠাৎ যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অসংক্রামক রোগ বলে।

৩. পরজীবী (Parasites) জনিত রোগ:

পরজীবী এক ধরনের জীব যা অন্য জীব দেহে বসবাস করে জীবন ধারন করে। যে জীবের দেহের উপর এরা জীবন ধারন করে তাদেরকে হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাহিরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতি সাধন করে । এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বলে। উভয় পরজীবী আক্রমনের ফলে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখির দেহে বসবাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি পুষ্টি হীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী পাখির দেহে বসবাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

পরজীবী দুই প্রকার:

১.অন্তঃপরজীবী: কৃমি

২.বহিঃপরজীবী: উকুন, আটালী, মাইট।

গোল কৃমি

সুতা কৃমি

ফিতা কৃমি

উকুন

আঠালী

চিত্র: ৪.১ বিভিন্ন ধরনের পরজীবী

অপুষ্টি জনিত রোগ (Malnutrition):

গৃহপালিত পাখি পালনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল পাখিকে সুষম খাদ্য প্রদান করা। পাখির মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং দৈনিক বৃদ্ধি সাধনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে যেকোনো খাদ্যে উপকরণের অভাব হলে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাঘাত ঘটে, ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এমনকি পাখির মৃত্যুও হতে পারে।

অপুষ্টি জনিত রোগঃ জেরোপথ্যালামিয়া, প্যারালাইসিস, পেরোসিস, ক্যানাবলিজম, রিকেট ।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ -১ (জীবাণু ঘটিত রোগ)

ক্র. নং	জীবাণুর নাম	জীবাণু ঘটিত রোগের নাম
১	ভাইরাস	
২	ব্যাকটেরিয়া	
৩	ছত্রাক	
৪	প্রটোজোয়া	

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ-২ (পরজীবী নাম)

ক্রমিক নং	পরজীবী	পরজীবীর নাম
১	অন্তঃপরজীবী	
২	বহিঃপরজীবী	

৪.২ জীবাণুঘটিত রোগ

ভাইরাস জনিত রোগসমূহ

৪.২.১ রাণীক্ষেত রোগ (Newcastle Disease):

রাণীক্ষেত ব্রয়লার মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশের মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন- শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শনাক্ত করা হয়। তাই তাকে নিউক্যাসল ডিজিজও বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে এ রোগকে রাণীক্ষেত রোগ বলা হয় ।

রোগের কারণঃ

প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারণ।

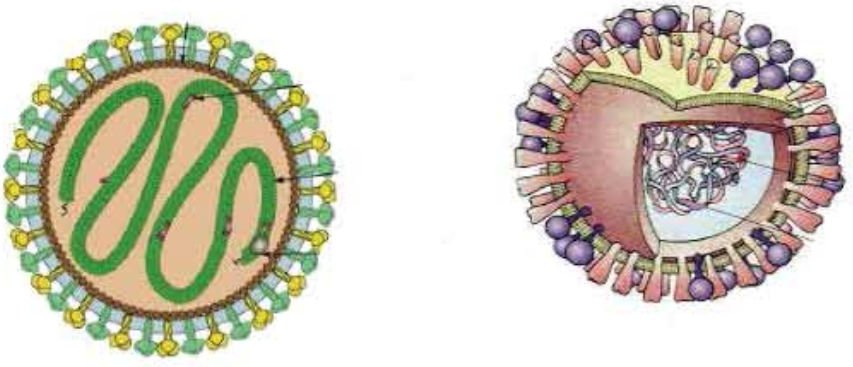

চিত্রঃ ৪.২ প্যারামিক্সোভিরিডি

রোগ সংক্রমণ -

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

- বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে

২০২০

- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, হাঁচি-কাশি থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি বা মুরগি আমদানির মাধ্যমে
- মৃত মুরগি বা পাখি যেখানে সেখানে ফেললে
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে

রোগের লক্ষণ: রাণীক্ষেত রোগের প্রধানত তিন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-

ক. ভেলোজেনিক (Velogenic) প্রকৃতি লক্ষণ।

খ. মেসোজেনিক (Messogenic) প্রকৃতি লক্ষণ।

গ. লেন্টোজেনিক (Lentogenic) প্রকৃতি।

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ:

এ প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্বক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমনের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন-

- প্রথমদিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে
- মাথায় কাপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহন করে
- সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দূর্বল হয়ে পড়ে
- মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাকমুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে
- শরীর শুকিয়ে যায়
- মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখ মুখ ফুলে যায়
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ:

মেসোজেনিক প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগের লক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়:

- ক্ষুদামন্দা দেখা দেয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখির কাশি হয় ও মুখ হা করে নি:শ্বাস নেয়।
- হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে।
- জীবাণু আক্রমনের দু সপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘুরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।

- মাথা একপাশে বেঁকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দু পায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

গ. লেপ্টোজেনিক প্রকৃতি:

এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-

- শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।
- সামান্য কাশি থাকে।
- কিছুটা ক্ষুদামন্দা ভাব থাকে।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

চিত্র: ৪.৩ রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ

রোগ নির্ণয়:

ময়নাতদন্তে নিম্নলিখিত লক্ষন দেখা যায়-

- শ্বাসনালীতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চায়ন
- স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে রক্তাব বা শৈষ্মিক নিঃস্রাব
- প্লীহা বড় হয়ে যায়
- খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত দেখা যায়
- অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল

চিত্র: ৪.৪ রক্তক্ষরিত পঁচা ক্ষত

২০২৩

চিকিৎসা:

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিতে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ:

রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ দু'ধরনের টিকা ব্যবহার করা হয়। যথা- বি.সি.আর.ডি.ভি এবং আর. ডি. ভি।

বি.সি.আর.ডি.ভি:

এ টিকাবীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি. লি. মূল টিকাবীজ থাকে। প্রতিটি শিশির টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিস্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোটা করে ড্রপারের সাহায্য নিতে হবে।

আর. ডি. ভি:

এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিম শুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ টিকা দু'মাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী। প্রথমে ভায়ালের টিকাবীজ ১০০ মি:লি: পরিস্রুত পানির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। টিকা ছাড়া খামার থেকে রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা-

- রাণীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে
- খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন-আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

রোগের নাম	রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ
রাণীক্ষেত রোগ	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.
রোগের নাম	রাণীক্ষেত রোগের পোষ্টমর্টেম লক্ষণ
রাণীক্ষেত রোগ	১.
	২.

৪.২.২ গামবোরো রোগ (Infectious bursal Disease):

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রমণ রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগে মুরগির রোগ প্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস আক্রান্ত হয় বলে প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যেকোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রোগকে বার্স এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও বলা হয়। এই রোগটি সর্ব প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো অঙ্গ রাজ্যে শনাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ। এ রোগে সাধারণত ২-৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যু হার খুব কম (৫-১৫%)। তবে কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০% ও মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ:

বিরনা ভিরিডি পরিবারের অর্ন্তগত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ-১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দুটো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন- ক্ল্যাসিকাল ও ভেরিয়েন্ট স্ট্রেইন।

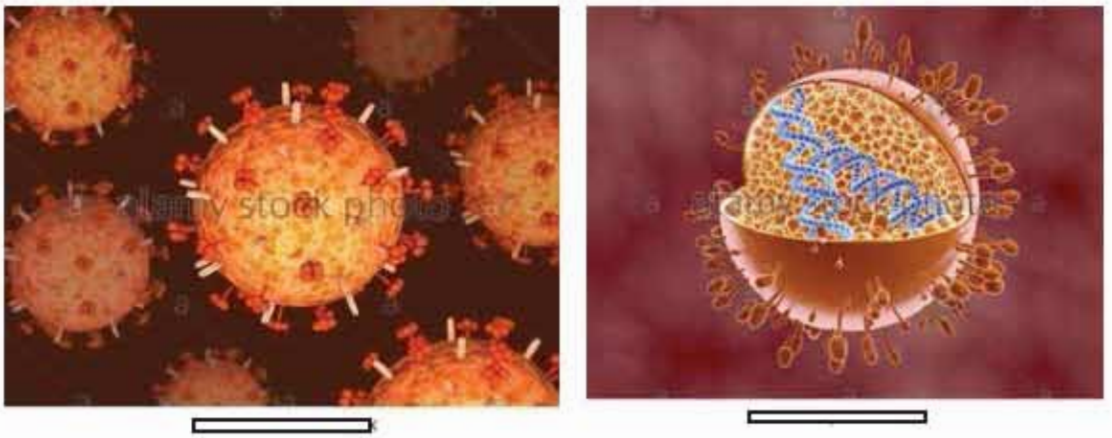

চিত্র: ৪.৫ বিরানা ভাইরাস

সংক্রমণ:

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি অসুস্থ্য মুরগি থেকে সুস্থ্য মুরগিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

- একই ঘরে রাখা অসুস্থ্য বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে
- বাতাসের মাধ্যমে
- কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে
- খাদ্য, লিটার, পোকামাকড়ের মাধ্যমে
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে

গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগির নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়:

- পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।
- শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মলদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।
- প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।
- পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
- মুরগি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে যায়।
- শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।
- তীব্র রোগে মুরগির শরীরে কাপুনি হয় ও অবশেষে পাখি মারা যায়।
- বেঁচে যাওয়া মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- বাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে।
- ক্রিম সবুজ রঙের ডায়রিয়া হয়।

চিত্র: ৪.৬ গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ নির্ণয়:

মৃত বাচ্চার ময়না তদন্তে নিম্নলিখিত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে গামবোরো রোগ সনাক্ত করা যায়

- থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা দেখা যাবে
- পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখা যায়

চিত্র: ৪.৭ গামবোরো রোগের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন

চিকিৎসা:

এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই । তবে আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩-৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি + ২৫০ গ্রাম আখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়। এরা গায়ে শক্তি পায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ:

রোগপ্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘরদোর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক,যেমন ফরমালিন (ফরমালিন : পানি = ১:৯), আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। বাংলাদেশে গামবোরোর বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয় যেমন:

- নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮
- ভি১ বার্সা জি
- বার ৭০৬
- গামবোরাল সিটি ইত্যাদি

এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১৪-১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪-২৮ দিন বয়সে বুষ্টার হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ	
রোগের নাম	গামবোরো রোগের লক্ষণ
গামবোরো রোগ	১.
	২.
রোগের নাম	গামবোরো রোগের পোস্টমর্টেম লক্ষণ
গামবোরো রোগ	১.
	২.

৪.২.৩ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza):

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ:

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস এরোগের কারণ। মানুষে ছড়ালে একে বার্ড ফ্লু বলে। মানুষে সংক্রমণের কারণে বার্ড ফ্লু বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত রোগ। এ রোগে ব্রয়লার মুরগির মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

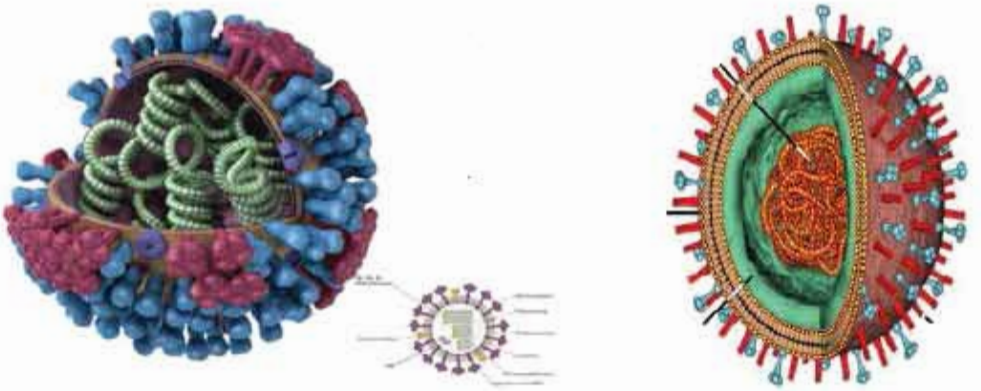

চিত্র: ৪.৮ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

রোগের বিস্তার:

রোগাক্রান্ত মুরগির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শ, মুরগির মল, লালা ইত্যাদি ব্যবহৃত খাদ্য, পানি, যন্ত্রপাতি, পাত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

এছাড়া আক্রান্ত খামারের যানবাহন, ব্যক্তি, পরিদর্শনকারী ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- ব্রয়লারের খাবার চাহিদা কমে যায়
- চোখ, মাথা ও ঝুঁটি ফুলে যায়
- চোখ দিয়ে পানি পড়ে
- শরীরের পালকবিহীন অংশে রক্ত জমে কালো হয়ে যায়
- মুরগি দুর্বল হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে যায়
- আক্রান্ত মুরগির শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ঘড় ঘড় শব্দ করে
- ঝুঁটি বেগুনি রং ধারণ করে
- সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা দেখা যায়
- আক্রান্তের হার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে

চিত্র: ৪.৯ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

শরীরের বিভিন্ন অংশে ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। চামড়ার নিচে, শ্বাসনালী, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ঘা দেখা যায়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ল্যাবে পাঠাতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়:

জৈব নিরাপত্তা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া কোনো খামারে এ রোগ দেখা দিলে সম্মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্ত ব্রয়লার মুরগিকে ধ্বংস করতে হবে। কোন ভাবেই আক্রান্ত মুরগি খামার থেকে বের করা যাবে না।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

রোগের নাম	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ	১.
	২.
	৩.

রোগের নাম	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পোস্টমর্টেম লক্ষণ
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ	১.
	২.

৪.২.৪ ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস (Infections Bronchitis):

রোগের কারণ:

এভিয়ান করোনা ভাইরাস এ রোগের কারণ। সাধারণত বাচ্চা মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাদা জাতের মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মৃত্যুহার ১০-১৫ % পর্যন্ত হতে পারে। বাচ্চা মৃত্যুর হার ৯০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার:

বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত মুরগি ও তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ:

- খামারে এ রোগের আক্রমণ হঠাৎ করে ঘটে ও প্রায় সকল মুরগি এক সাথে আক্রান্ত হয়
- শ্বাসকষ্ট হয় ও মুখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে
- সকালে ও রাতে লক্ষণগুলো প্রকট হয়
- অনেক সময় পানির মত পাতলা ডাইরিয়া হয়
- চোখের ঝিল্লি লাল হয়
- ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায় ও ডিমের খোসা পাতলা ও অমসৃণ থাকে

চিত্র: ৪.১০ শ্বাসকষ্ট

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

শ্বাসনালীতে প্রচুর শ্লেষ্মা ও মৃদু রক্তক্ষরণ দেখা দিবে। অস্বাভাবিক ডিমের কুসুম দেখা যাবে।

প্রতিরোধঃ

নিয়মমতো টিকা প্রদান করতে হবে এবং জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

কার্যকরী চিকিৎসা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ এড়াতে অ্যান্টিবায়োটিক (মাইক্রোনিড, ডক্সাসিল ভেট) প্রয়োগ করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

রোগের নাম	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগের লক্ষণ
ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগ	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.

রোগের নাম	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগের পোস্টমর্টেম লক্ষণ
ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগ	১.
	২.

প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগঃ

৪.২.৫ ককসিডিওসিস (Coccidiosis) বা রক্ত আমাশয়ঃ

ককসিডিয়া নামক প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে ককসিডিওসিস বলে। অল্প বয়সের মুরগি বিশেষ করে ৪-৮ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগি এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে বেশি বয়সী মুরগিতেও কখনও কখনও এ রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশে আইমেরিয়া টেনেলা ও আইমেরিয়া নেকাট্রিক্স নামে ২টি জীবাণু দ্বারা রক্ত আমাশয় হয়। মুরগির বাচ্চার মড়কের কারণগুলোর মধ্যে এই রোগ অন্যতম।

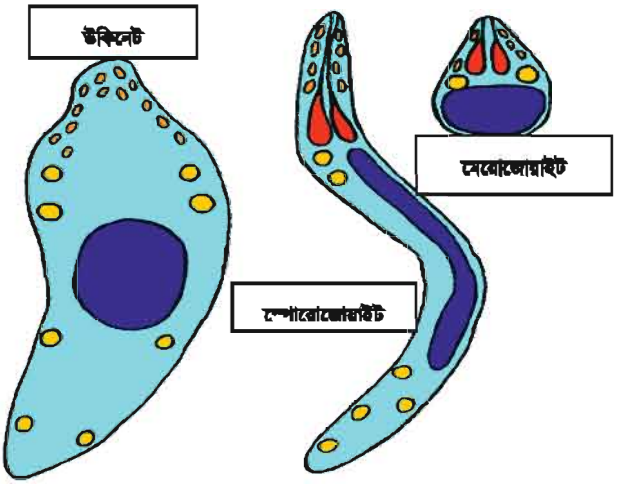

চিত্রঃ ৪.১১ ককসিডিয়া নামক প্রটোজোয়া

রোগের লক্ষণঃ

- হঠাৎ করে খাদ্য ও পানি গ্রহণে অনীহা দেখাবে
- পালক উসকো খুসকো হবে
- রক্ত মিশ্রিত চুনা পায়খানা করবে ও মলদ্বারের পালকগুলো পায়খানায় ভিজা থাকে
- বাচ্চা চোখ বুজে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে
- শরীরে কাঁপুনি হয়
- ঠোঁট পা ঝুঁটি ও গলার ফুল ফ্যাকাশে হয়ে যায়

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

আক্রান্ত মুরগিতে রক্তমিশ্রিত পায়খানা থাকে। অন্ত্রের আক্রান্ত স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায় ও অন্ত্রের দেয়ালের বাইরে থেকে রক্ত আবরণের চিহ্ন দেখা যায়। সিকামে রক্ত মিশ্রিত তরল বিষ্ঠা থাকবে।

প্রতিরোধ:

- স্বাস্থ্যসম্মত লিটার ও পরিবেশ বজায় রাখতে হবে
- ব্রয়লারের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে
- বাড়ন্ত মুরগির সাথে বাচ্চা মুরগি রাখা যাবে না
- পানির পাত্রের নিচের ও চারিপার্শ্বের লিটার প্রতিদিন উলট পালট করে দিতে হবে
- বাচ্চা মুরগির ঘরে কাজ করার পর বড় মুরগির ঘরে কাজ করতে হবে
- বিধি মোতাবেক ঘর পরিষ্কার ও লিটার পরিবর্তন করে নতুন ব্যাচে বাচ্চা তুলতে হবে
- লিটার সব সময় শুষ্ক রাখতে হবে। ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৫-৭ কেজি চুন ছিটিয়ে মিশিয়ে দিয়ে লিটার ওলট পালট করে দিলে লিটার শুষ্ক থাকবে। ফলে ককসিডিয়ার জীবাণুসহ অন্যান্য জীবাণু মারা যাবে।
- প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৫০ গ্রাম বাজারে প্রাপ্ত ককসিডিওস্ট্যাট মিশিয়ে খাদ্যে ব্যবহার করতে হয়।
- জৈব নিরাপত্তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- টিকা ব্যবহার করেও বাচ্চার ককসিডিওসিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিকিৎসা:

- ইএসবি-৩ (৩০%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২গ্রাম বা এমবাজিন (২৫%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে ৩ দিন খাওয়ানোর পরে ২ দিন শুধুমাত্র পানি খাওয়াতে হবে। পুনরায় ৩ দিন উক্ত ঔষধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া ককট্রিট ইপি পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ভিটামিন-কে গ্রুপের ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ৫-৬ দিন খাওয়াতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ	
রোগের নাম	ককসিডিওসিস রোগের লক্ষণ
ককসিডিওসিস রোগ	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.
রোগের নাম	ককসিডিওসিস রোগের চিকিৎসা
ককসিডিওসিস রোগ	১.
	২.

২০২৩

৪.৩ অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Diseases):

খাদ্যের যেকোনো এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের ঘাটতির কারণে ব্রয়লার মুরগির বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। নিচে ব্রয়লারে বিভিন্ন ভিটামিনসমূহের অভাবজনিত রোগ, তাদের চিকিৎসা ও প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলো

ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

৪.৩.১ জেরোপথ্যালমিয়া

কতদিন পর্যন্ত মুরগিগুলো এই ভিটামিনের অভাবে ভুগছে তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিন-'এ' এর অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। বয়স্ক মুরগিতে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। কিন্তু ব্রয়লার মুরগিতে ২/৩ সপ্তাহে মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো অবস্থা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, চোখের পাতা ফুলে যায়
- নাক ও চোখ দিয়ে আঠার মতো জলীয় পদার্থ বের হয়
- রাতকানা রোগ হয়
- পায়ের হাঁটু ও চামড়ার হলুদ রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে
- খাবার গ্রহণে আগ্রহ কমে যায় ও পালকের চাকচিক্য কমে যেতে পারে
- মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়। ঝুঁটি শুষ্ক ও ফ্যাঁকাশে হয়ে যায়
- বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়

অভাব নিরূপণ:

- খাদ্যে ভিটামিন এর পরিমাণ সঠিক আছে কিনা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা
- রক্তের সিরামে ভিটামিন এর পরিমাণ নির্ণয় করা
- চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় কিনা তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে এই ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা নিরূপণ করা যায়

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

খাদ্যে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ছোট মাছ, ফলমূল, ফলমূলের খোসা, হাঙ্গর মাছের তেল খাওয়ালে ভিটামিন-এ এর অভাব দূর হয়। লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিদিন বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত খাদ্য বা পানির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

৪.৩.২ রিকেট:

শরীরের হাড় এবং ডিমের খোসার গঠনের জন্য অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস-এর কার্যকারিতার জন্য এই ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি। সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে বা খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে ভিটামিন-ডি নষ্ট হয়ে যায় ফলে মুরগি খাবার হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-ডি পায় না।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- পায়ের অস্থি নরম মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়, ফলে মুরগি ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। একে "রিকেট" রোগ বলা হয়
- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে হাড় বাঁকা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে
- ঠোঁট, হাড় ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়, ফলে মুরগি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলে
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ও পাজর ফুলে যায়

চিত্র: ৪.১২ ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত লক্ষণ

২০২৩

রোগ নিরূপণঃ

ক) লক্ষণ দেখে রোগ নিরূপণ তথা ভিটামিন-ডি এর অভাব বোঝা যায়।

খ) খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং

গ) সন্দেহজনক মুরগিকে যদি ভিটামিন-ডি সরবরাহ করে ভালো ফল লাভ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ভিটামিন-ডি এর অভাবে ভুগছিল।

সতর্কতাঃ

অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-ডি খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োগ করলে মুরগির কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ

- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-ডি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির এ.ডি.ই দ্রবন নির্দেশমত খাওয়াতে হবে
- যেহেতু ভিটামিন-ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত তাই একই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
- খামারে ছোট বাচ্চাগুলোকে সম্ভব হলে দিনের কিছুটা সময় রোদ্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলে এবং সকালবেলা ব্রয়লারের জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করলে ভিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে

৪.৩.৩ ভিটামিন বি -১ (থায়ামিন) এর অভাবজনিত রোগঃ (স্টার গেজিং)

পানিতে দ্রবণীয় এ ভিটামিনটির অভাবে খুব তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-বি-১ বিদ্যমান না থাকলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

চিত্রঃ ৪.১৩ স্টার গেজিং রোগ

অভাবজনিত লক্ষণঃ

- অরুচি এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা
- দৈহিক ওজন হ্রাস
- উসকো খুসকো পালক
- দুর্বলতা এবং হাঁটতে অনীহা
- ঝিমানো ভাব
- ঘাড় বাঁকানো বা ঘুরিয়ে উল্টোভাবে রাখা লক্ষণ প্রকাশ পায়
- কখনও কখনও মুরগি ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে, একে **"স্টার গেজিং"** বলে

রোগ নির্ণয়ঃ

- লক্ষণ অনুযায়ী ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে
- আক্রান্ত ব্রয়লার মুরগির খাদ্যে ভিটামিন এর পরিমাণ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এরা আসলে ভিটামিন- বি-১ এর অভাবে ভুগছে কিনা

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

- পানি বা খাবারে ভিটামিন-বি-১ সরবরাহ করা। প্রথম কয়েক দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
- খুব অসুস্থ ব্রয়লার মুরগির জন্য আরও বেশি পরিমাণে ভিটামিন- বি-১ খাবারে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন খাবারের সাথে ভিটামিন-বি-১ মিশিয়ে দিতে হবে

৪.৩.৪ কার্ল-টো-প্যারালাইসিস

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং খাবার পানির পিএইচ ভিটামিন বি-২ কে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই খাদ্যে এর অভাব দেখা দিতে পারে।

চিত্র: ৪.১৪ কার্ল-টো প্যারালাইসিস

অভাবজনিত লক্ষণ:

বাচ্চা অবস্থায় প্রথম কয়েক সপ্তাহ ও ভিটামিনটির অভাব হলে মুরগির মধ্যে-

- দৈহিক দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়
- শুকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক পালক গজায় না
- পাতলা পায়খানা হয়
- তীব্র আক্রান্ত মুরগির পা অবশ হয়ে গিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হাঁটে
- পায়ের অবশতাজনিত রোগ দেখা যায় যাকে কার্ল-টো-প্যারালাইসিস বলে । এক্ষেত্রে দুই পা 'দু' দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে এক পা চলে পিছনের দিকে চলে যায় ফলে পা-গুলি অচল হয়ে যায় তাই তারা হাঁটতে পারে না এবং না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে
- ব্রিডার মুরগি হলে ডিম হতে ডিম ফোটার হার কমে যায় এবং ডিমের ভিতর বাচ্চা মারা যায়

রোগ নিরূপণ:

রোগের লক্ষণ দেখে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করলে যদি লক্ষণগুলো দ্রুত চলে যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ঐ ভিটামিনের অভাবে ভুগছিল ।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

- খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-২ থাকা দরকার
- মাঝে মাঝে পানিতে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে বি-২ সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাতে এই ভিটামিনের অভাব না হয়
- আক্রান্ত ব্রয়লার মুরগিগুলোকে আলাদা ভাবে রেখে ভিটামিন বি-২ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়

৪.৩.৫ ভিটামিন বি -৬ (পাইরিডক্সিন) এর অভাবজনিত রোগ

খাবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকলে সাধারণত এ ভিটামিনটির অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায় । কারণ এটি প্রোটিনের বিপাকে সাহায্য করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অরুচি, উসকো খুসকো পালক ইত্যাদি
- দৈহিক বৃদ্ধি কম হওয়া
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়
- আক্রান্ত ব্রয়লার মুরগিগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করতে থাকে এবং সবশেষে খিঁচুনি দেখা যায় এবং মৃত্যু হয়

রোগ নির্ণয়:

খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ও রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণার ভিত্তিতে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ ঝাঁকের মুরগিগুলি ভিটামিন বি-৬ এর অভাবে ভুগছিল।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

- লক্ষণ প্রকাশ পেলে খাবারের বা পানির সাথে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করে এ রোগের লক্ষণ প্রশমিত করা যায়
- নিয়মিত পরিমাণমত ভিটামিন বি-৬ খাবারের সাথে সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় না

৪.৩.৬ খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ

আমিষ, শ্বেতসার, চর্বি এবং ভিটামিনের মতো পাখির খাদ্যে খনিজ পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। পাখির বা মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি,স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রজননের জন্য খনিজপদার্থ অত্যাবশ্যক। তবে অধিক পরিমাণে খনিজপদার্থ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।তাই পরিমিত পরিমাণ খনিজপদার্থ খাদ্যের সাথে সরবরাহ করতে হয়।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর কাজঃ

- পাখির দেহের অস্থি গঠন ,ডিমের খোসা তৈরীতে খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক
- দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করে
- খনিজ শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্যে করে।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর অভাবজনিত লক্ষণঃ

- ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়
- অস্থির গঠন ঠিকমতো হয় না
- রক্ত জমাট বাঁধে না
- রিকেট রোগ ও কেজ লেয়ার ফ্যাটিগ রোগ হয়
- ডিম ফোটার হার কমে যায়

প্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ

- মাছের গুঁড়া, ঝিনুক, হাড়, দানা শস্য, পালং শাক ইত্যাদি মুরগির খাদ্যে সরবরাহ করলে এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়
- মুরগির খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাচ্চা মুরগিতে ২.২:১
- মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাড়ন্ত মুরগিতে ২.৫:১
- মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- ডিমপাড়া মুরগিতে ৯:১

সোডিয়াম এর অভাবজনিত রোগঃ

সোডিয়ামের কাজঃ

- দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করার জন্য জরুরি।
- অস্থি গঠন করে।

সোডিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না
- হাড় নরম হয়
- রক্ত পাতলা হয়
- ডি-হাইড্রেশন দেখা দেয় ও মৃত্যু ঘটে

প্রতিকার ও চিকিৎসাঃ

খাদ্যে সাধারণ লবণ সরবরাহ করে এর অভাব দূর করা যায়।

জিংক এর অভাবজনিত রোগ

জিংকের কাজঃ

- পাখির দৈহিক বৃদ্ধি ,পালক গজানো ও ডিম উৎপাদনের জন্য জিংক প্রয়োজন
- অস্থির গঠনে জিংক প্রয়োজন

জিংকের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না
- পালক কম গজায় ও পায়ের চামড়া উঠে যায়
- পায়ের হাড় খাটো ও মোটা হয়
- মুরগি ঠোকরা ঠুকরি করে

প্রতিকার ও চিকিৎসাঃ

মুরগির খাদ্যে জিংকের বা জিংক সমৃদ্ধ উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে ।

সেলেনিয়াম এর কাজ ও অভাবজনিত রোগ

সেলেনিয়ামের কাজঃ

- সেলেনিয়াম হচ্ছে গ্লুটাথায়োন পারোক্সিডেজ (Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে

সেলেনিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- ডিম বসানোর ৪র্থ দিনে ভ্রুণের মৃত্যু হয়
- চামড়ার নিচে পানি জমে
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়

প্রতিকার ও চিকিৎসাঃ

ছোলা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বা খাদ্যে সেলেনিয়াম যুক্ত করলে এর অভাব দূর হয়।

লৌহ ও কপার এর অভাবজনিত রোগ

অভাবজনিত লক্ষণঃ

- রক্তশূণ্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়
- লাল পালক এর রং ফ্যাকাশে হয়
- স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

শাকসবজি, ঘাস, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ফেরাস সালফেট ও কপার সালফেট সংযোজন করতে হবে।

কলিন এর অভাবজনিত রোগ

ব্রয়লার শরীরে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে কলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারীরিক অসাড়তা দূর ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা কলার গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কলিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- পায়ের হাড় নরম ও বাঁকা হয়ে মুরগি অসাড় হয়ে যায়
- দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে
- ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির কলিজায় অতিরিক্ত চর্বি ও রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণ দেখা দেয়
- ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায় ফলে ডিম পাড়াও কমে যায়

রোগ নির্ণয়:

লক্ষণ দেখে এবং পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়াও খাদ্যস্থিত কলিন বৃদ্ধি করে যদি ফল পাওয়া যায় তবে ধরতে হবে কলিনের অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবিন মিল, গম ভাঙা, ফিস মিল ইত্যাদি থাকায় ব্রয়লার মুরগিতে কলিনের অভাব সাধারণত হয় না। কারণ সয়াবিন মিল ও ফিসমিলে প্রচুর পরিমাণে কলিন থাকে। বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে কলিন বা কলিন ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন মত খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই কলিনের অভাজনিত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

৪.৪ ব্রয়লারের টিকা প্রদান কর্মসূচিঃ

টিকা বীজ হচ্ছে রোগের প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্ট্রিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরী করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকা বীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক আমিষ পদার্থ তৈরী হয়। যাকে অ্যান্ট্রিবডি বলা হয়। এ অ্যান্ট্রিবডিই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ পর্দাথ। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে টিকা প্রদানের যে সিডিউল তৈরী করা হয় তাই টিকা দান কর্মসূচী।

বর্তমানে খামারিগণ নিম্নলিখিত টিকা প্রদান কর্মসূচি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন-

বয়স (দিন)	রোগের নাম	ভ্যাকসিনের নাম	টিকা প্রবেশ পথ	ডোজ/পরিমাণ
৬-৮	রাণীক্ষেত	এনডি-লেসোটা(জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
১০	গামবোরো	নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ (জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
১৭	গামবোরো	নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ (জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
২১	রাণীক্ষেত	এনডি লেসোটা (জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা

জব-৫ ব্রয়লার পালনে প্রতিষেধক টিকা প্রদান

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- টিকাদান সূচি সংগ্রহ করা
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাচামালের তালিকা তৈরি করা
- তালিকা মোতাবেক যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করা
- টিকাদানের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- টিকা প্রদান সম্পন্ন করা
- টিকাদান পরবর্তী ধকল প্রশমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
২	হেয়ার নেট	মাঝারি মাপের	১ সেট
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৪	চেস্ট কভার	শিক্ষার্থীর মাপ অনুযায়ী	০১ টি
৫	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

হেয়ার নেট

মাস্ক

চেস্ট কভার

হ্যান্ড গ্লোভস

অ্যাপ্রন

চিত্র: ৪.১৫ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

খ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	চিকগার্ড	বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী
২	নিউজ পেপার	-	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	টিকা-BCRDV	সরকারি টিকা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	টিকা-GDV	সরকারি টিকা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৫	ভিটামিন WS	১০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬	ভিটামিন বি+সি	১০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭	ইলেকট্রোলাইট	১০০০ গ্রাম প্যাক	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮	ভিটামিন এডিই-৩	১০০ মিলি বোতল	প্রয়োজন অনুযায়ী

গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সিরিঞ্জ/ভ্যাকসিনেটর	০.২ মিলি পর্যন্ত পরিমাপযোগ্য	০১ টি
২	হাইগ্রোমিটার	ডিজিটাল	০১ টি
৩	থার্মোমিটার	সেলসিয়াস স্কেল	০১ টি

কাজের ধারাঃ

১) বিশ্বস্থ উৎস হতে রানীক্ষেত ও গামবোরো রোগের টিকা সংগ্রহ করা

২) নিরাপত্তামূলক পোষাক যেমন- অ্যাপ্রন, দস্তানা ও গামবুট পরিধান করা।

৩) টিকা প্রদানে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

৪) সূচি মোতাবেক ব্রয়লার শেডে যাওয়া।

৫) দিনে ঠান্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকা প্রস্তুত কারী প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ মোতাবেক পাতিত পানির সাথে মিশ্রিত করা।

৬) এর পর বাচ্চা মুরগিকে সঠিক ভাবে ধরে আয়ত্তে এনে নিম্নলিখিত ভাবে টিকা প্রদান করা।

রানীক্ষেত টিকা প্রদান পদ্ধতিঃ

ক) ১০০ মাত্রার ভায়াল ৬ সি সি পাতিত পানিতে মেশাও। বেসরকারি টিকা হলে প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রদত্ত ডায়লুয়েন্টের সাথে মেশাও। খ) প্রতি বাচ্চাকে ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোঁটা করে টিকা দাও। গ) এই ভ্যাকসিন ৩-৭ দিনবয়সে ১ম বার এবং ১৫ দিন পর বুস্টারডোজ প্রয়োগ করো।	

চিত্র ৪.১৬: রাণীক্ষেত টিকা

গামবোরো টিকা প্রদানঃ

ক) টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়ালুন্টের সাথে মেশাও। খ) ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোঁটা করে চোখে প্রয়োগ করো। গ) সাধারণতঃ ৩-১১ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৮-২১ দিন বয়সে ২য় ডোজ প্রয়োগ করো।	

চিত্র ২.২০: গামবোরো টিকা

৭) টিকাদানকৃত বাচ্চাকে পৃথক রাখ।

৮) গরম কালে ১ ঘন্টা ও শীত কালে ২ ঘন্টার মধ্যে টিকাদান শেষ করো।

৯) অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটির নিচে পুতে ফেল।

সতর্কতাঃ

- নির্দিষ্ট মাত্র বেশি/কম কোনো টিকা প্রদান করা যাবে না।
- দিনের ঠান্ডা অংশে এবং বড় খামারের ক্ষেত্রে রাতে টিকাদান সম্পন্ন করতে হবে।
- অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

ব্যবহারিক শেষে কাজঃ

- ভাইরাল টিকা কত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করবে তার একটি তালিকা তৈরী করা।
- টিকা প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়গুলোর তালিকা তৈরী করা

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্রয়লারের রোগগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
২. ভাইরাস জনিত দুটি রোগের নাম লেখ ।
৩. ব্যাকটেরিয়া জনিত দুইটি রোগের নাম লেখ ।
৪. সংক্রামক রোগ কাকে বলে?
৫. অসংক্রামক রোগ কাকে বলে?
৬. রাণীক্ষেত রোগের কারণ কী?
৭. গামবোরো রোগের কারণ কী?
৮. মারেক্স রোগের কারণ কী?
৯. পক্স রোগের কারণ কী?
১০. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ কী?
১১. অন্তঃপরজীবী কী কী?
১২. স্টার গেজিং কাকে বলে?
১৩. কার্ল-টো-প্যারালাইসিস কাকে বলে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ লেখ।
২. রাণীক্ষেত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৩. গামবোরো রোগের লক্ষণ কী?
৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. রাণীক্ষেত রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
২. গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৩. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৪. ককসিডিওসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৫. ব্রয়লারের টিকাদান কর্মসূচি উল্লেখ করো।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রয়লার বিপণন

Broiler Marketing

দৈহিক বৃদ্ধি খাদ্য গ্রহণের হার ও ভোক্তার পছন্দের ওজন বিবেচনা করে ব্রয়লার ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করা হয়। ব্রয়লার উৎপাদনের সাথে সাথে বিপণন করতে না পারলে খামারের ক্ষতি হয়। তবে ব্রয়লার বিক্রয়ের পূর্বে ভোক্তার চাহিদা ও রুচির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ভোক্তা যে বয়সের ও যে ওজনের ব্রয়লার পছন্দ করে, উৎপাদনকারীকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্রয়লার উৎপাদন ও বিপণন করতে হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিপণনের সময় সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারব
- ব্রয়লার বিপণন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব
- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করণ করতে পারব
- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন করতে পারব
- ব্রয়লার মাংসে ফেতলানো বা বিবর্ণতা পরিহার করতে পারব
- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারব
- যন্ত্রপাতি ও টুল সংগ্রহ করতে পারব
- প্লান্টে ব্রয়লারের পা লোহার কড়ায় ঝুলানোর কৌশল অনুশীলন করতে পারব
- ব্রয়লার সঠিকভাবে জবাই করতে পারব
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রার গরম পানিতে নির্ধারিত সময় চুবানো কৌশল অনুশীলন করতে পারব

- ব্রয়লার ডিফেদারিং সম্পন্নকরণ অনুশীলন করতে পারব
- ছোট পালক সমূহ ছাড়ানো অনুশীলন করতে পারব
- থেতলানো পরিহার করার উপায় জানতে পারব
- সঠিকভাবে নাড়ীভূড়ি অপসারণ করার পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারব
- চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন অঙ্গ আলাদাকরণ করতে পারব
- ওজন গ্রহন, প্যাকেটজাতকরণ করতে পারব
- প্যাকেটসমূহ তথ্য সমৃদ্ধ লেবেলকরণ করতে পারব
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে পারব
- প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসরণ পূর্বক বিপণন করতে পারব

৫.১ বিপণনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

বিপণনের **সময় নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে-**

- ❖ খামারের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি করতে হবে;
- ❖ ব্রয়লার বিক্রির ৫-৭ দিন পূর্ব থেকে ব্রয়লারকে কোনো প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো উচিত নয়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর;
- ❖ বড় শহরের কাছাকাছি যেখানে ক্রেতা বেশি সেখানে ব্রয়লার বিপণন সুবিধা;
- ❖ বাজার থেকে খামারের দূরত্ব বিবেচনায় রাখতে হবে;
- ❖ ব্রয়লার বিক্রি করার জন্য পূর্ব থেকেই খামারিকে বিক্রয় কেন্দ্র বা পাইকারি বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যাতে লাভজনক মূল্যে ব্রয়লার বিক্রি করা যায়;
- ❖ সাধারণত এক ব্যাচের সমস্ত ব্রয়লার একদিনে বিক্রি করা ভালো, তাতে পরিবহন খরচ কম পড়ে। অবশ্য নির্দিষ্ট ওজনের ব্রয়লার সরবরাহের জন্য মোরগ ব্রয়লার আগে বিক্রি করা যায়। ব্রয়লার সম ওজনের হলে পরে বিক্রি করা যায়;
- ❖ কোনো কারণে এক সাথে সমস্ত ব্রয়লার বিক্রি করা সম্ভব না হলে জবেহ্ করে পালক ও নাড়িভুঁড়ি ফেলানোর পর প্রক্রিয়াজাত করে ঠান্ডা ঘরে রাখার ব্যবস্থা নিতে হয়;
- ❖ তবে সব ভোক্তাই প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস পছন্দ নাও করতে পারে। কারণ ইসলামি শরিয়াত মতে জবেহ্ করার বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকে বা অনেকে মৃত মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করতে পারে। এ ধরনের ভোক্তা জীবন্ত মুরগি ক্রয়কে বেশি পছন্দ করে;

- ❖ ভোক্তার রুচি ও পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মুরগি জবেহ্, ভালো মুরগির মাংস ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ❖ প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ব্রয়লার ধরার ২-৩ ঘন্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ করতে হয় এতে মাংসের গুণাগুণ ভালো থাকে।
- ❖ ব্রয়লার ধরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা না হলে মুরগির পা বা পাখা ভেঙে যেতে পারে, মাংস থেতলে যেতে পারে।
- ❖ পরিবহনের খাঁচার উন্নতি সাধন ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন।
- ❖ গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট ঋতুতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে বাজারের মুরগির আমদানি বেশি হয়, ফলে বাজারে ব্রয়লারের দাম কমে যায়।
- ❖ আবার বিশেষ ঋতুতে ডিম পাড়া শেষে ডিম পাড়া মুরগি বাজারে বেশি আমদানি হয়, ফলে দাম কমে যায়। এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

৫.২ ব্রয়লার বিপণন পদ্ধতি (Broiler Marketing System):

সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে বাজারে ব্রয়লার বিক্রি হয়-

১) জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি করা।

২) জবেহ্ করার পর শুধু রক্ত ও পালক বাদ দিয়ে বরফে প্যাক করে বিক্রি করা।

৩) ড্রেস করা ব্রয়লার টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা।

৪) নাড়িভুঁড়ি ছাড়ানো বা রান্না করার জন্য প্রস্তুত ও বরফে দ্রুত জমানো অবস্থায় বিক্রি করা।

৫) প্রক্রিয়াজাত করা ব্রয়লার আরও প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করা। যেমনঃ ফ্রাই, চিকেন বল, রোল ইত্যাদি।

৫.৩ ব্রয়লার বিপণন প্রক্রিয়া (Broiler Marketing Process)

প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোগকারীর নিকট উৎপাদিত দ্রব্য আসতে বিভিন্ন হাত ঘুরে আসে। স্থানীয় ফড়িয়া বা পাইকারগণ সরাসরি খামার থেকে জীবন্ত ব্রয়লার ক্রয় করে বাজারে খুচরা বিক্রি করে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ফড়িয়া বা পাইকারগণ নিজেরাই দাম নির্ধারণ করে। বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতার মুরগির সাথে প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র রাখে। ক্রেতা মুরগি কিনে জবেহ্ করার পর যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত প্রক্রিয়াজাত করে আনতে পারে। এতে প্রক্রিয়াজাত বিষয়ে ক্রেতার মনে কোনো সন্দেহ থাকে না এবং বিক্রেতার বাড়তি কিছু লাভ হয়।

বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী এখানে কাজ করে বিধায় উৎপাদনকারী তাদের ন্যায্য মূল্য পায় না। অপরদিকে ভোক্তাগণ অধিক মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করে থাকেন। বাজারের পরিবেশে মুরগি বিক্রয়ের সাথে জবেহ্ ও প্রক্রিয়াজাত করার ফলে বিভিন্ন রোগ জীবাণুতে আক্রান্ত হয়। বিক্রেতাগণের একই হাতে জীবন্ত মুরগি ধরা, জবেহ্ ও নোংরা হাতে মাংস প্রক্রিয়াজাত করা কখনই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাছাড়া মুরগির পায়খানা ও উপজাত পরিবেশকে আরও নোংড়া করে। এছাড়া প্রক্রিয়াকরণ উপজাতের সঠিক ব্যবহার হয় না।

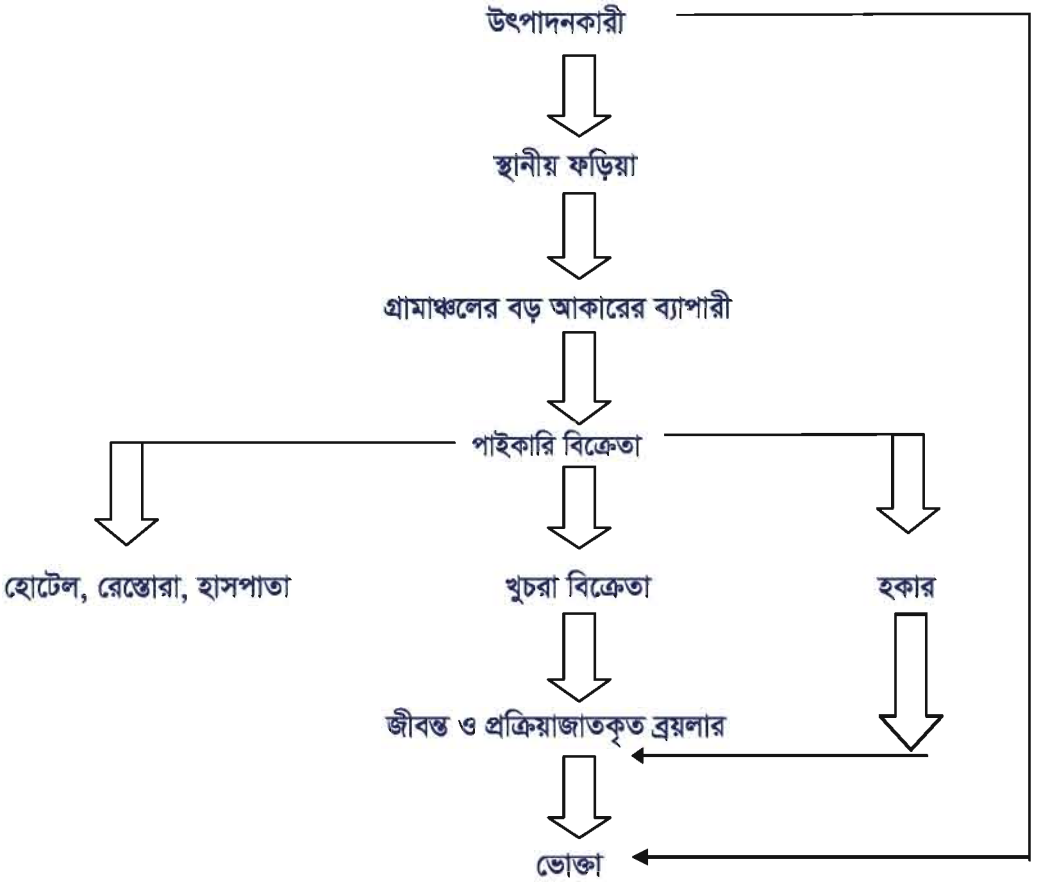

চিত্রঃ ৫.১ ব্রয়লার বিপণনের প্রচলিত প্রক্রিয়া

বড় বাণিজ্যিক খামার সমবায় সমিতিদের অনুরূপ ছোট খামারগুলো সমবায় ভিত্তিতে প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন করতে পারবে অথবা ছোট খামারগুলোতে উৎপাদিত জীবন্ত ব্রয়লার নির্দিষ্ট মূল্যে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ করতে পারবে। এ বিষয়গুলোকে নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতির ধ্যান ধারণার আলোকে আমাদের সমগ্র বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে নিম্নলিখিতভাবে ঢেলে সাজাতে হবে-

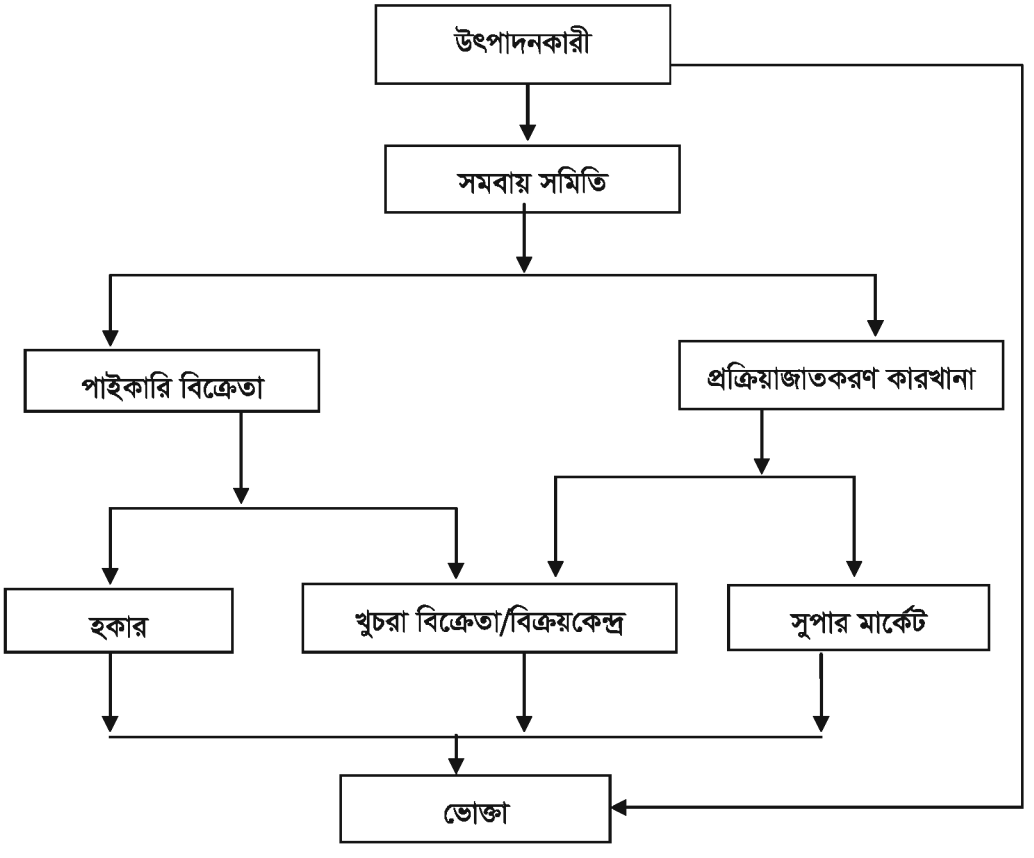

চিত্র : ৫.২ ব্রয়লার বিপণনের লাভজনক প্রক্রিয়া।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- ব্রয়লার বিপণনের প্রচলিত প্রক্রিয়া থেকে ব্রয়লার বিপণনের লাভজনক প্রক্রিয়া খামারিদের বেশি কার্যকর বর্ণনা করো।

- ব্রয়লার বিক্রির ৫-৭ দিন পূর্ব থেকে ব্রয়লারকে কেন কোন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো উচিত নয়?
- প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ব্রয়লার ধরার ২-৩ ঘন্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ করতে হয় কেন ?

ব্রয়লার পরিবহন (Broiler Transportation):

- ছোট খামার পর্যায় থেকে আড়তদার পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহণ করা হয়-
- রিকশা ভ্যানে কয়েক তলা বিশিষ্ট লোহার বা বাঁশের ফালির খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- রিকশা ভ্যানে বড় গোল ঝুঁড়ি বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- পিক আপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- বাসের ছাদে বড় চ্যাপ্টা ঝুঁড়িতে ব্রয়লার ভরে বড় শহরে ব্রয়লার পরিবহণ;
- বড় খামার পর্যায় থেকে আড়তদার বা প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহণ করা হয়-
- পিক আপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- বড় ট্রাকে মুরগি বহনের বড় বড় ক্রেটে ব্রয়লার ভরে কয়েক তলা সাজিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;

আড়তদার বা পাইকারি বিক্রেতা থেকে খুচরা বিক্রেতা বা হকার বা সুপার মার্কেটে নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহণ করা হয়-

- রিকশা ভ্যানে কয়েক তলা বিশিষ্ট লোহার বা বাশের ফালির খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- রিকশা ভ্যানে বড় গোল ঝুঁড়ি বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ;
- সাইকেলের পিছনে ঝুঁড়িতে করে ব্রয়লার পরিবহণ;
- পিক আপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহণ।

প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট থেকে সুপার মার্কেটে নিম্নলিখিত ভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়-

- হিমায়িত ট্রাক বা ভ্যানে করে প্রক্রিয়াজাতকৃত প্যাকেটজাত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়।

৫.৪ ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ (Broiler processing):

জীবন্ত ব্রয়লারকে ব্যবহারকারীর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করাতে যে ধাপগুলো সম্পন্ন করা হয় একে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। জবেহ করা, পালক ছড়ানো, নাড়ি-ভুঁড়ি ফেলে দেওয়া, বরফে ঠান্ডা করা, টুকরো করে কাটা এবং মোড়কাবৃত করা এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ নিম্নলিখিত কারণে করা হয়ে থাকে:

১. প্রক্রিয়াজাতকৃত ব্রয়লার ফ্রোজেন করে সংরক্ষণ করা যায়, সহজে পরিবহন করা যায় এবং সুবিধামত বিক্রি করা যায়।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অবরোধ, হরতাল, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদি কারণে সময়মতো বাজারজাতকরণের জন্য।

৩. ব্রয়লারের বাজার দর হঠাৎ কমে গেলে খামারে মুনাফা অর্জন ব্যাহত হতে পারে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্রেতাই বাজার থেকে জীবন্ত ব্রয়লার ক্রয় করে নিজেরাই ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী জবেহ্ করে পালক ছাড়িয়ে, নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দিয়ে বিভিন্ন অংশ কেটে ভালোভাবে ধুয়ে রান্নার জন্য তৈরি করে বা রেফ্রিজারেটরে রেখে দেয়।

তবে ইদানিং বড় বাজারগুলোতে বিক্রেতারা এই কাজটি করে থাকে; যেমন-

- জবেহ্ করা
- ড্রেসিং মেশিনে পালক ছাড়ানো
- নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেওয়া
- অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া।

ক্রেতা ড্রেসড মাংস পলিথিন প্যাকে বাসায় নিয়ে এসে বিভিন্ন অংশ কেটে ধুয়ে রান্না করে। এ প্রচলিত পদ্ধতিতে মুরগির রক্ত, পালক, নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ডাস্টবিন বা অন্যত্র ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এই মূল্যবান উপজাতগুলো দিয়ে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরি করা যায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করা হতো, তবে এই উপজাত কাজে লাগানো যেত।

৫.৫ ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি (Pre-preparation for Processing)

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বপ্রস্তুতিকালে নিম্নোক্ত কার্যাবলী অনুসরণীয়-

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার ২/৩ ঘন্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ রাখতে হয়ে। ফলে পরিপাকতন্ত্রের সালমোনেলা জীবাণুর বৃদ্ধি কমে যায়।
- খাদ্য বন্ধ রাখার ফলে ব্রয়লার মুরগি কিছুটা ওজন হারায়।
- ব্রয়লার মুরগি দুই পর্যায়ে অনাহারে থাকে। যেমন- খামারে অবস্থানকালে ধরার পূর্ব এবং খামার থেকে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত। ২ পর্যায়ে মোট ৮ থেকে ৯ ঘন্টার অতিরিক্ত অভুক্ত রাখা উচিত নয়।

অভুক্ত সময় মোট ওজন হারানোর পরিমাণ যেমন -

অভুক্ত রাখার সময়	ওজন হারানোর পরিমাণ
৩ঘন্টা	শতকরা ২ ভাগ
৬ ঘন্টা	শতকরা ৩ ভাগ
৯ ঘন্টা	শতকরা ৪ ভাগ
১২ঘন্টা	শতকরা ৫ ভাগ
১৫ঘন্টা	শতকরা ৬ ভাগ

- মুরগি ধরে খাঁচায় ঢুকানোর পূর্ব পর্যন্ত পানি প্রদান করা হয়।
- খাঁচায় বা ক্রেটের ভিতর ঢোকানোর পর প্রক্রিয়াজাত করা পর্যন্ত আর পানি প্রদান করা হয় না।
- প্রক্রিয়াজাত করার পর মাংস পরিচর্যা ও চিলিং করার সময় ২/৩ শতাংশ ওজন বেড়ে যায়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবহারকারীর ও খামারিদের উভয় কাছে লাভজনক বর্ণনা করো।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার ২/৩ ঘন্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ রাখতে হয় কেন?
- চিলিং করার সময় ড্রেস মুরগির ২/৩ শতাংশ ওজন বেড়ে কেন?

৫.৬ ব্রয়লার মাংস থেতলানো বা বিবর্ণতা পরিহার:

(Avoid Grinding or Discoloration of Broiler Meat)

- ব্রয়লার ধরা বা হাতানোর সময় অতন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে মাংস থেতলানো হয়, বিবর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং মাংসের গুণগতমান ক্ষুন্ন হয়
- ব্রয়লার ধরার জন্য পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশল বিষয়ে অবহিত করতে হয়, যেমন-

  ১) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ২ সপ্তাহ পূবে কাঁকর প্রদান বন্ধ রাখতে হয়

  ২) ফিনিশার খাদ্যের সাথে সকল প্রকার ঔষধ ব্যবহার প্রক্রিয়াজাত করার ৫ দিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে

  ৩) রাত্রে যখন মুরগি শান্ত থাকে তখন ধরতে হয় এবং ক্রেট বা খাঁচার মধ্যে ভরতে হয়

  ৪) মুরগি ধরার ২ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- ব্রয়লার মাংস থেতলানো বা বিবর্ণতা সৃষ্টি হয় কেন?

৫.৭ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপ (Steps of Broiler Processing at Processing Plants)

প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন (Health Regulations):

- যে কক্ষগুলোতে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করা হবে সে কক্ষ গুলোতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যাবস্থা থাকতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করা।
- জবেহ করার পূর্বে জীবন্ত ব্রয়লারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ।

ফুড হ্যান্ডেলারদের নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই কাজ হতে বিরত থাকতে হবে:

১. তীব্র ডাইরিয়া;
২. কলেরা রোগে আক্রান্ত;
৩. হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত;
৪. ফিতা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত;
৫. যক্ষারোগে আক্রান্ত;
৬. ঠান্ডা বা ফ্লু এর উপসর্গ দেখা দিলে।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের পরবর্তী করণীয় মূল ধাপসমূহ:

১. গ্রহণ করা: (Recieve)

জীবন্ত ব্রয়লার খাঁচায় করে প্লান্টে এনে খাঁচা থেকে বের করে পা দুটি উপরের লোহার কড়ায় আটকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঝুলন্ত ব্রয়লারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সেকশনে যাবে।

২.জবেহ করা: (Slaughter)

চাকু দিয়ে হালাল পদ্ধতিতে ব্রয়লারের গলায় জুগুলার শিরা কেটে দিয়ে জবেহ করার পর ১.৫-২ মিনিটের মধ্যে রক্ত সম্পূর্ণ ঝরে যাবে। মাথা থেকে দেহ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সম্পূর্ণ রক্ত না ঝরলে মাংস বিবর্ণ দেখাতে পারে।

৩. পালক ছাড়ানো: (Defeathering)

এর পর ৫১°-৫৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম পানিতে চুবিয়ে ৯০ সেকেন্ড রেখে সেমি-স্কেলডিং করা হয়। পালক তোলার জন্য রাবারের তৈরি অনেকগুলো আঙুল আছে এমন ড্রামে ব্রয়লার রেখে ড্রামটি ঘুরানো হয়। এতে ব্রয়লারের পালকগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং চামড়ার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না।

চিত্র: ৫.৩ আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ

৪. শরীরের উপরে সামান্য ঝলসানো :(Slightly scorched on the body)

ব্রয়লারের গায়ে চুলের মত সরু পালক থাকে, যা আগুনের শিখার মধ্যে দিয়ে ব্রয়লারকে টেনে দিলে পুড়ে পরিষ্কার হয়।

৫. ধৌত করা: (Wash)

দুইদিক থেকে সজোরে পানি স্প্রে করে ব্রয়লারের শরীরের উপরিভাগ ধোয়া হয়। এতে গায়ে লেগে থাকা পালক, পোড়া পালক ও অন্যান্য ময়লা শরীর থেকে দূর হয়।

৬. ছোট পালক তোলা: (Pick up Pin feathers)

অনেক সময় ব্রয়লারের শরীরে মাত্র গজাচ্ছে এমন পালক থাকে। এগুলোকে পিন ফেদার বলে। এগুলো হাত ও চাকু দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। চাকু ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরে টান দিলেই এগুলো উঠে আসে।

৭. নাড়িভুঁড়ি অপসারণ: (Intestinal Removal)

লেজের উপরিভাগে অবস্থিত তেল গ্রন্থি কেটে ফেলার পর বুকের অগ্রভাগ থেকে পায়ু পথ খাড়াভাবে কেটে পেট খোলা হয়। নাড়িভুঁড়ি হতে যকৃত ও গিজার্ড বের করে সরিয়ে রেখে নাড়িভুঁড়ির অবশিষ্টাংশ ফেলে দেয়া হয়।

৮. ফুসফুস, বৃক্ক ও মাথা অপসারণ:(Removing of lungs, kidneys and head)

ফুসফুস ও বৃক্ক শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম দ্বারা বক্ষ ও পেট থেকে টেনে বের করা হয়। ছুরি দিয়ে মাথা কেটে ফেলা হয়।

৯. গলা, কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালী অপসারণ: (Removing Neck, throat and eusophagus)

গলা কাঁধের কাছ থেকে কেটে ফেলা হয়। কণ্ঠনালী ও গলার থলি গলার কাছ থেকে হাতে ছাড়িয়ে নেয়া হয়, হাঁটু থেকে পা আঙুলসহ কেটে নেয়া হয়।

১০. ধোয়া ও বরফে ঠান্ডা করা: (Wash and cool on ice)

ব্রয়লারের শরীরে লেগে থাকা রক্ত ও ময়লা সজোরে পানির স্প্রে দিয়ে ধুয়ে বরফের পানিতে ৪০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ২৪ ঘন্টার কম সময় পর্যন্ত রেখে দিয়ে ঠান্ডা করা হয়। এতে ব্রয়লারের সেলফ্ লাইফ বৃদ্ধি পায়।

১১. প্যাকেটজাতকরণ:(Packaging)

ব্রয়লার আস্ত বা এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে কেটে প্যাকেটজাত করা হয়। প্ল্যান্ট থেকে খুচরা দোকান পর্যন্ত পৌঁছাতে সবসময়ই ব্রয়লার ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। মাথা, গলা, কলিজা, গিলা ইত্যাদি পরিষ্কার করে প্যাকেটে ভরে একইভাবে খুচরা বিক্রেতার কাছে পৌছায়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বে জীবন্ত ব্রয়লারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কেন?
- ঠান্ডা বা ফ্লু এর উপসর্গ দেখা দিলে ফুড হ্যান্ডেলারদের কি করা উচিত ?

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ:

- পালক ছাড়ানো পূর্বে ব্রয়লার মুরগিকে ৫১°-৫৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার গরম পানিতে চুবিয়ে ৯০ সেকেন্ড রেখে সেমি-স্কেলডিং করা হয় কেন?
- জিবলেট কী?

জব -৬ব্রয়লার বিপণন পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদন্ড-

- উৎপাদিত ব্রয়লার নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় গ্রাহকের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করা
- সহজে পরিবহন ও বেশী সময় সংরক্ষণ করা
- ব্রয়লারনিদিষ্ট তাপমাত্রায় চিলিং করা
- চাহিদা মোতাবেক প্যাকেট জাত ব্রয়লার গ্রাহকের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করা

ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
২	হেয়ার নেট	মাঝারি মাপের	১ সেট
৩	মাস্ক	তির স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৪	চেষ্ট কভার	মাঝারি মাপের	০১ টি
৫	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া
৬	কাগজ, কলম, পেন্সিল	-	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
৭	পলিথিন (ঠান্ডার জন্য)	স্ট্যান্ডার্ড	১৫ গজ

খ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ব্রয়লার	১.৫ কেজি	প্রয়োজন অনুযায়ী
২	প্লাষ্টিকের ফ্লিম	উন্নত মানের	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	পলিইথিলিন	উন্নত মানের	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	পলি প্রপাইলিন	উন্নত মানের	প্রয়োজন অনুযায়ী

খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ছুরি	Stainless steel	প্রয়োজন অনুযায়ী
২	চাকু	Stainless steel	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩	কাচি	Stainless steel	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	ব্লাস্ট ফ্রীজ	দ্রুত ঠান্ডা হয়	০১ টি
৫	থার্মোমিটার	সেলসিয়াস স্কেল	০১ টি
৬	চিলিং মেশিন	পানি দ্রুত ঠান্ডা হয়	০১ টি
৭	প্যাকেজিং মেশিন	সিলিং করা হয়	০১ টি
৮	নিক্তি	সর্বোচ্চ ২৫ কেজি ওজন নেয়ার জন্য	০১ টি

ব্রয়লার সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বাজারজাত করা হয়ঃ

১) জীবন্ত পদ্ধতিতে বিপণন করন।

২) ড্রেসড পদ্ধতিতে ব বিপণন করন।

জীবন্ত পদ্ধতি বিপণন: (Marketing in a lively way)

জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বিপণন করা হয়।

ক) খামার থেকে পাইকারী ক্রেতার নিকট বিক্রি করা।

খ) খামার হতে সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি করা।

ক. খামার হতে পাইকারী ক্রেতার নিকট বিক্রি:

১) ব্রয়লার বিক্রিয় উদ্দেশ্য নির্ধারিত সময় পূর্বেই পাইকারী ক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য ক্রেতা বাছাই করো।

২) সম্ভব্য ক্রেতার সাথে দর কষাকষি করে উপযুক্ত বাজার মূল্য ও বিক্রিয় তারিখ নির্ধারণ করো।

৩) নির্ধারিত দিনে ব্রয়লার বিক্রিয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করো।

৪) পাইকারী ক্রেতার উপস্থিতিতে ব্রয়লার ওজন করে গ্রেড ভিত্তিক আলাদা করে পাইকারী ক্রেতাকে বুঝিয়ে দাও।

খ. খামার হতে সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রিঃ

খামার হতে ব্রয়লার নিয়ে বাজার বা খুচরা বিক্রির স্থানে মেপে বিক্রি করা অনুশীলন করো।

২. ড্রেসিং করে ব্রয়লার বিপণনঃ (Marketing in the dressing method)

- বিক্রয়ের জন্য তারিখ নির্ধারণ পূর্বক ব্রয়লারগুলোকে একত্রিত করে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আন।
- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বে জীবন্ত ব্রয়লারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করো।
- ব্রয়লারগুলো জবাই করে পূর্ণ রক্ত ঝরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।
- সঠিক ভাবে ড্রেসিং পদ্ধতি অনুসরন পূর্বক ড্রেসিং সম্পন্ন করো।
- ড্রেসড ব্রয়লারগুলো গ্রেডিং ও ওজন করে প্যাকেজ হাত করে প্যাকেটে লেবেল লাগাও।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (০-৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) ড্রেসড করে সংরক্ষণ করো।
- চাহিদা মোতাবেক ডিপার্টমেটাল ষ্টোর খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারী বিক্রেতার নিকট পৌছে দাও।

সাবধানতাঃ

১. ব্রয়লারগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা। যাতে জবাই করা সহজ হয়।

২. রক্ত ঝরা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাতে মাংসের গুণ ঠিক থাকে।

৩. সংরক্ষণের সময় সঠিক তাপমাত্রা নিশ্চিত করো।

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

Poultry Rearing and Farming -1

লেয়ার মুরগি পালন

দ্বিতীয় পত্র (কোড নং-৮০২৩)

দশম-শ্রেণি

২০২৩

২০২৩

প্রথম অধ্যায়

লেয়ার মুরগি পালন

Layer Chicken Rearing

পুষ্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, আত্মকর্ম সংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে লেয়ার মুরগি পালন অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। লেয়ার মুরগি পালন একটি দীর্ঘ স্থায়ী লাভজনক ব্যবসা। লেয়ার মুরগি পালন অনেকটা অন্যান্য পোল্ট্রি পালনের মতোই। ৭২ সপ্তাহ ব্যাপি লাভজনক পালন কার্যক্রম চলে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন। একজন দক্ষকর্মী লেয়ার মুরগির সেড প্রস্তুতকরণ, যন্ত্রপাতি ও লেয়ার সেড পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা, বাচ্চা গ্রহণ ও ব্রুডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং ডিমপাড়া কালীন মুরগির পরিসেবা প্রদান করে এ ব্যবসাকে লাভজনক পর্যায়ে পরিচালনা করতে পারে। এ ব্যবসায় ক্ষতি ব্যক্তি তথা দেশের অর্থনীতির জন্য হুমকি স্বরুপ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- পালন পদ্ধতি অনুযায়ী লেয়ার মুরগির সেড প্রস্তুত করতে পারব
- যন্ত্রপাতি ও লেয়ার সেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে পারব
- বাচ্চা গ্রহণ ও ব্রুডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারব
- ডিমপাড়া কালীন (খাঁচা পদ্ধতি) মুরগির পরিসেবা করতে পারব
- কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

১.১ পালন পদ্ধতি অনুযায়ী লেয়ার মুরগির সেড প্রস্তুতকরণ

Preparation of Layer Chicken Shed as Per Rearing Method

পোল্ট্রি খামার স্থাপনের জন্য সেড নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে খামারের লাভ-ক্ষতি সেডের নির্মাণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে । তাই পরিবেশের সাথে ভারসাম্যতা বজায় রেখে উপযুক্ত সেডের নির্মাণ করতে হবে। পারিপার্শিক পরিবেশ ও জৈব নিরাপত্তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

১.১.১ লেয়ার খামারের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় (Considerations of Layer Farm Location Selection):

- খামার তৈরির নির্বাচিত স্থান লোকালয় বা আবাসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে শুষ্ক, উঁচু ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন হতে হবে ।
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অন্য মুরগির খামার বা প্রাণি র ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে হতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে।
- পানি ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ডিম উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।
- ডিম বিপণনের সুবিধা থাকতে হবে।
- ভবিষ্যতে খামারটি সম্প্রসারণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।
- বন্য জন্তু বা অবাঞ্ছিত লোকজন দ্বারা খামার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন স্থান হবে।
- বিষ্ঠা ও লিটার সরিয়ে ফেলার সুযোগ থাকতে হবে।
- মাটি বেলে দোআঁশযুক্ত হবে।
- খামার ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাওয়া সুবিধা থাকতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজঃ

- তোমার বাড়ীর আশ পাশে যে সমস্ত লেয়ার খামার আছে তার যেকোনো একটির স্থান নির্বাচনের বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ কর।

১.১.২ খামারের অবকাঠামো নির্মাণ (Construction of Farm Infrastructure)

মুরগির ঘর নির্মাণে কোনো ভুল বা ত্রুটি করা চলবে না। মুরগিকে আরামদায়ক পরিবেশ নিরাপদ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য ঘরের প্রয়োজন। খোলামেলা উঁচু জায়গায় প্রচুর আলো ও বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় ঘর তৈরি করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে প্রধানত দুই ধরনের ঘরে মুরগি পালন হয়। যথা:

(১) খোলামেলা ঘর

(২) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত ঘর।

লেয়ার খামারের খোলামেলা ঘর তৈরির বিবেচ্যবিষয় (Considerations of constructing an open house layer farm):

১. ঘরের অবস্থান ও প্রকৃতি:

- এ ঘর দক্ষিণে খোলা থাকে।
- প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘরের খোলামেলা স্থানে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- ঘরের মধ্যে মুরগি আবদ্ধ রাখার জন্য খোলা স্থান জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়।
- ঘরে লিটার ধরে রাখার জন্য খোলা স্থানের নিচের অংশ ১-১.৫ ফুট দেয়াল দ্বারা ঘিরে দেওয়া থাকে।
- নিরাপত্তার জন্য ঘরের সম্পন্ন অংশ তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে।

২. ঘরের প্রশস্ততা:

- সাধারণত ছোট খামার ঘরের প্রশস্ততা খাঁচার আকার অনুসারে করতে হয়।
- লিটার পদ্ধতিতে ঘরের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ১০ ফুট এবং উর্ধ্বে ২৫ ফুট করা যায়।
- বাণিজ্যিক খামার সর্বনিম্ন ৩০ ফুট এবং সর্বাধিক ৪০ ফুট করা যায়।
- ৪০ ফুটের অধিক প্রশস্ত হলে ঘরে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়।
- অধিক প্রশস্ত ঘরে অতিরিক্ত খুঁটি ও পিলার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।
- ঘরের মধ্যে অতিরিক্ত পিলার মুরগির জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম রাখতে অসুবিধা হয় এবং ময়লা পরিষ্কার করতে সমস্যা হয়।
- ঘরের এই প্রশস্ততা বাড়ন্ত ও লেয়ার মুরগি পালনের উপযোগী।

৩. ঘরের দৈর্ঘ্য:

- যে কোনো পরিমাপের সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য থাকতে হবে।
- স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র স্থাপন করতে হলে খাদ্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়।
- বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ডিজাইন ও পরিমাপের স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র তৈরি করে।
- স্বয়ংক্রিয় খাদ্য পাত্র ঘরের মাঝ বরাবর স্থাপন করা হয়।

৪. ঘরের উচ্চতা:

- ছোট চালা ঘরের উচ্চতা মেঝে থেকে চালের ছাচ সর্বনিম্ন ৬(ছয়) ফুট এবং ঘরের মেঝের মধ্য বরাবর চালের উচ্চতা ১০(দশ) ফুট হওয়া উচিত।
- বাণিজ্যিক খামারে সিলিং বা চালার তল পর্যন্ত সর্বনিম্ন ৮(আট) ফুট, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য ১০(দশ) ফুট করা ভালো।
- খাঁচা বা মাচার নিচে ময়লা জমা হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে হাইরাইজ ঘর তৈরি করতে হয়। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বহুতল ঘরের দেয়ালের উচ্চতা ১০(দশ) ফুট এবং ঘরের মাঝ বরাবর চালের শীর্ষদেশ ২০ ফুট।

৫. ঘরের চালা:

- ব্যবহারিকভাবে বেশির ভাগ মুরগির জন্য দু'চালা টিন বা এসবেস্টর শিট দ্বারা তৈরি করা হয়। চালের শীর্ষদেশের চাল এক চতুর্থাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়।
- চালের ছাদ বাড়ন্ত ও ঝুলন্ত রাখতে হয় (২.৫-৩ ফুট), যেন বৃষ্টির ভিতরে প্রবেশ না করে ।
- মুরগির ঘর কংক্রিট ছাদযুক্ত করা যায়।

৬. তাপ নির্গমন:

- ঘরের ভিতর উৎপাদিত দূষিত বাতাস গরম বাতাস ও তাপ নির্গমনের জন্য চালের উপর ব্যবস্থা রাখা হয়।
- গরম বাতাস চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ এগজষ্ট ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৭. তাপ নিরোধক:

- টিন বা এসবেস্টর চালাযুক্ত ঘরের তাপ নিরোধক সিলিং ব্যবহার করতে হয়।
- সমস্ত ঘরের এক প্রান্তে সম্ভব বিশেষ তাপ নিরোধক শিট, কাঠ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদির সাহায্যে ঠান্ডা স্থান তৈরি করা যায়। এই স্থানের সাথে গম্বুজাকৃতির ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকে। গরমের সময় এখানে মুরগি আশ্রয় নিতে পারে।

৮. ঘরের মেঝে:

- যখন খামারে কোনো বিশেষ রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তখন ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা করা প্রয়োজন।
- যে সমস্ত এলাকায় মাটি ভিজা অথবা দ্রুত আর্দ্রতা শোষণ করে এবং পরিবেশ দ্রুত আর্দ্র হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা করতে হয়।
- বালু ও কাঁকর মিশ্রিত স্থানে নির্মিত ঘরে কাঁচা মেঝের উপর ব্রয়লার, লেয়ার ও ব্রিডার মুরগি পালন করা যায়।

- খাঁচা বা মাচার নিচে ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে কাঁচা বা পাকা মেঝে নির্মাণ করা যায়।

৯. ঘরের দরজা:

- ঘরের এক প্রান্তে দরজা থাকে।
- বাণিজ্যিক খামারে ঘরের দরজা বড় ও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।
- বড় ও প্রশস্ত দরজার ভেতর দিয়ে ঘর পরিষ্কার করার সময় ট্রাক্টর ঢুকে ময়লা বের করে নিতে সুবিধা হয়।
- ছোট ঘরে ট্রলির সাহায্যে ময়লা পরিষ্কার করার উপযোগী দরজা থাকে।

১০. ঘরের অবস্থান:

- বাতাস প্রবাহ গতিবেগের বিপরীতে বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগির ঘর থাকবে।
- প্রচুর আলো বাতাস চলাচলের জন্য ঘরগুলো পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হলে ভালো।
- দুই শেডের মধ্যে কমপক্ষে ৩০-৪০ ফুট ফাঁকা স্থান থাকতে হয়।

১১. পরিবেশ:

- খোলামেলা ঘর স্থাপনের জন্য চারিদিকে পর্যাপ্ত ফাঁকা ও খোলামেলা স্থানের প্রয়োজন।
- আবহাওয়া অবস্থা ও মুরগির প্রকৃতি অনুসারে ঘরের আকৃতি ও এবং স্থান নির্বাচন করতে হয়।
- বিষ্ঠা ও লিটার নিষ্কাশনের সুবিধাজনক স্থান প্রয়োজন।

১২. বিভিন্ন পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি প্রতি মেঝেতে স্থান:

পদ্ধতি	সাদা হালকা জাত		রঙিন ভারী জাত	
	৬-২০ সপ্তাহ	২১ সপ্তাহের উর্ধ্বে	৬-২০ সপ্তাহ	২১ সপ্তাহের উর্ধ্বে
লিটার পদ্ধতি	১ বর্গ ফুট	১.৫৮ বর্গ ফুট	১.২ বর্গ ফুট	১.৭৫ বর্গ ফুট
মাচা পদ্ধতি	০.৭ বর্গ ফুট	১.০ বর্গ ফুট	০.৮৪ বর্গ ফুট	১.২৫ বর্গ ফুট
খাঁচা পদ্ধতি		৭২ বর্গ ইঞ্চি		৭৮ বর্গ ইঞ্চি

টেবিল: ১.০১

তাত্ত্বিক কাজ: ১০০টি ডিমপাড়া মুরগির ঘরের মেঝের পরিমাপ হিসেব করে দেখাও।

১.১.৩ ছাদের নকশার উপর ভিত্তি করে ঘরের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Houses Based on The Design of The Roof)

মোটামুটি আয়তাকার ঘর মুরগি পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী। ছাদের তারতম্য অনুসারে নানা রকম মুরগির ঘর তৈরি করা যায় যেমন:

১) সেড টাইপ

চিত্রঃ ১.১. সেড টাইপ

২) গ্যাবল টাইপ

চিত্রঃ ১.২ গ্যাবল টাইপ

৩) সেমি গ্যাবল টাইপ

চিত্র: ১.৩ সেমি গ্যাবল টাইপ

৪) মনিটর টাইপ

চিত্র: ১.৪ মনিটর টাইপ

৫) সেমি মনিটর টাইপ

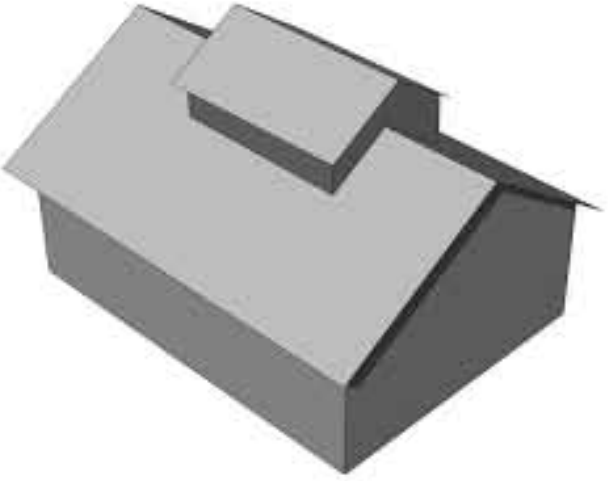

চিত্র: ১.৫ সেমি মনিটর টাইপ

৬) গোল টাইপ

চিত্র: ১.৬ গোল টাইপ

১. সেড টাইপঃ

এ ধরনের মুরগির ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। সাধারণত খোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।

২. গ্যাবল টাইপঃ

এ ধরনের ঘর তৈরিতে খরচ বেশি লাগে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু হয়ে থাকে।

৩. কম্বিনেশন টাইপঃ

এ ধরনের ঘরের ছাদ দুদিকেই ঢালু থাকে। বেশিরভাগ ঘরেরই উপরের দিকে বেশি ঢালু থাকে। এক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও বেশি হয়।

৪. মনিটর বা সেমি মনিটর টাইপঃ

যে সব ঘর বেশি প্রশস্ত করার দরকার হয় এবং ঘরের ভেতর উভয়দিকে মুরগির খোপ রাখতে হয় সেক্ষেত্রে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়ে থাকে। ব্রুডার ঘর এ ধরনের ডিজাইনে তৈরি করা হয়ে থাকে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

- কোন ধরনের ছাদের ঘর তোমার মতে উত্তম এবং কেন?

১.২ যন্ত্রপাতি ও লেয়ার সেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণ

Cleaning and disinfection of equipment and layer shed

১.২.১ লেয়ার বাচ্চা পালনের জন্য কক্ষ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করণ কৌশল

Washing, cleaning and disinfection techniques of shed for Rearing Layer chick

নতুন বা পুরাতন যে ঘর হোক না কেন, "অল ইন অল আউট" পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঘরে এক ব্যাচ লেয়ার বাচ্চার পালন করে পুলেট হিসেবে বিক্রি করার কমপক্ষে ১৪ দিন পর অন্য ব্যাচ উঠাতে হবে। এ পদ্ধতি শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধই করে না রোগের জীবাণুকেও ধ্বংস করতে সহায়তা করে ।

লেয়ার বাচ্চা পালনের জন্য ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

"অল ইন অল আউট"- একই জাতের একই বয়সের বাচ্চা/ মুরগি খামারে একত্রে উঠানো এবং পালন শেষে একত্রে বের করাকে বোঝায়।

(ক) ব্রুডার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা:

১) ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত সরঞ্জাম, হোভার, ব্রুডার গার্ড, লিটার, খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হবে।

২) পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩) ঘরের দেয়াল, দরজা, জানালা, নেট, পর্দা, ভেন্ট্রিলেটর, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৪) ঘরে কোনো মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) পরিষ্কার পানি দিয়ে দেয়াল, মেঝে, খাদ্য ও পানির পাত্র ধুতে হবে। পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার উত্তম।

চিত্র: ১.৭ মুরগির ঘর পরিষ্কার করার কৌশল

(খ) ঘরের মেঝে, খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ:

১) জীবাণুনাশক যেমন: (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসান) দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র, হোভার, ব্রুডার গার্ড, ব্রুডার হিটার, দেয়াল, মেঝে, ছাদ, পার্দা ও খামারের আশপাশে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২) ভিজা মেঝের উপর ১০০ বর্গফুট স্থানে ১ কেজি হারে শুকনা কস্টিক সোডা ছড়াতে হবে এবং ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর মেঝে শুকিয়ে গেলে কস্টিক সোডার উপর হালকা পানি স্প্রে করতে হবে।

৩) পরে সমস্ত ঘর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪) বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে বাচ্চার সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে।

(গ) ঘরের ভিতর লিটার বিছানো ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপন:

১) বাচ্চা ব্রুডিং এর ১(এক) দিন পূর্বে ঘর ভালোভাবে শুকানোর পর লিটার বিছাতে হবে।

২) লিটারের উপর গোল করে চিকগার্ড স্থাপন করে তার মাঝামাঝি স্থানে হোভার সিলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে দিতে হবে ।

৩) ব্রুডার গার্ডের ভেতর হোভারের নিচে লিটারের উপর কাগজ, চিক বক্সের ঢাকনি বা প্লাস্টিক শিট বিছাতে হবে।

৪) হোভারের সাথে হিটার (বাল্ব, ব্রুডার স্টোভ, গ্যাস বার্নার) সংযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) ফিউমিগেশন:

১) ব্রুডার ঘরে বাচ্চা গ্রহণের ১২ ঘন্টা পূর্বে সম্পূর্ণ ঘর চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউগেশন উপকরণ ব্যবহার করে ঘরের ফিউমিগেশন করতে হবে।

২) ব্রুডার ফিউমিগেশন করার জন্য ৩ গুণ ঘনত্বের ফিউমিগেশন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৩) প্রতি ১০০ ঘনফুট স্থানের জন্য ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ১২০ মি: লি: ফরমালডিহাইড ব্যবহার করতে হবে।

৪) ব্রুডিং স্থানের পরিমাণ হিসাব করে মোট পরিমাণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ৪/৫ টি মাটি, কাচ বা পোরসেলিন পাত্রে ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে সমদূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

৫) পরিমাণমতো ফরমালডিহাইড সমপরিমাণে খুব দ্রুত সবগুলো পাত্রে ঢেলে দিতে হবে এবং ঘর বন্ধ করে বের হয়ে আসতে হবে।

৬) ফিউমিগেশন করার সময় সমস্ত ঘর ও সরঞ্জাম একই সাথে জীবাণুমুক্ত হবে ।

৭) ফিউমিগেশন করার ২০-৩০ মিনিট পর পর্দা সরিয়ে সম্পূর্ণ গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিতে হবে।

৮) ফিউমিগেশনের পর বাচ্চা প্রদানের ২/৩ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত ঘর তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

ফগার মেশিন ব্যবহার করেও ফিউমিগেশন করা যায়।

চিত্র: ১.৮ফগার মেশিন দ্বারা ফিউমিগেশন

(ঙ) ঘরের চারিদিকে পরিষ্কারকরণ:

১) ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

২) পুরাতন মুরগি ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৩) বাচ্চা উঠানোর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবাণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১(এক) বার করে ঘরের বাইরের চতুর্পার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

৫) নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের আশেপাশে কোনো প্রাণি বা লোক চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ (ব্যবহৃত জীবাণুনাশকের নাম ও মাত্রা লেখ)	
নাম	ব্যবহার মাত্রা

১.২.২ লেয়ার এর বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কৌশল (Strategies for maintaining a healthy environment in and around Layer Shed):

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকবে-

(১) মুরগির জাত ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হবে, যাতে মুরগি পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়।

(২) খামারে পানি জমে স্যাঁতসেঁতে না হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৩) মুরগির খামারের উপরিভাগের তারের জাল দিয়ে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) ঘরে যাতে বৃষ্টির ছাট পড়ে লিটার ভিজে না যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৫) গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য-

ক) ঘরের চালে পানি ছিটানো হয়

খ) ঘরের চারিদিকে পানি ছড়ানো হয়

গ) ঘরের মধ্যে ফগিং মেশিন দিয়ে পানি স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি করা হয়

ঘ) ঘরের ভিতরে ও বাইরে ফ্যান ব্যবহার চালানো হয়

(৬) খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রথমে পানি দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানির সাথে জীবাণুনাশক মিশিয়ে খামার জীবনাণুমুক্ত করা হয়।

(৭) খামারে ভালো খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।

(৮) হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল লেয়ার বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সালমোনেলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে ।

(৯) খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

(১০) বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ মুরগির ঘরের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

(১১) খামারে যাতে বন্য প্রাণি ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বন্য প্রাণি ও ইঁদুর দ্বারা রাণীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সালমোনেলাসহ গুরুত্বপূর্ণ রোগ খামারে আসতে পারে।

(১২) খামারে কোনো মুরগি অসুস্থ হলে দ্রুত সম্ভব পৃথক করে ফেলতে হবে। মারা গেলে তা সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে অবশ্যই মাটি নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

(১৩) খামারে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে।

১.৩ লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং (Layer Baby Brooding)

১.৩.১ ব্রুডিং ঘরে লেয়ার বাচ্চা তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ (Preparing the brooding house before raising the layer chick brooding):-

লেয়ার এর বাচ্চা ঘরে তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কাজগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো-

- বাচ্চা তোলার ১ সপ্তাহ আগে সমস্ত পুরাতন লিটার ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ঘরের পর্দা, ভেতর ও বাইরের মাকড়সার জাল ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে।
- পুরাতন মুরগির ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- এরপর জীবাণুনাশক (যেমন- পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসোন) দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র, হোভার, ব্রুডার গার্ড, ব্রুডার হিটার, দেয়াল, মেঝে, ছাদ, পর্দা ও খামারের আশপাশে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- সম্ভব হলে পাটের চট বা পলিথিন দ্বারা ঘিরে ফিউমিগেশন করতে হবে।
- বাচ্চা আনার ১ দিন পূর্বে ঘরে ২´´-৪´´ পুরু করে রোদে শুকানো লিটার বিছাতে হবে ও জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করে নিতে হবে। ঘরের পর্দার অংশ অবস্থা বুঝে ৬´´ বা ১২´´ পরিমাণ খোলা রাখতে হবে।
- চিক গার্ডের ভেতর লিটারের উপর পাটের চট বিছাতে হবে বা খবরের কাগজ বিছাতে হয় যাতে বাচ্চা তুষ বা কাঠের গুঁড়া খেতে না পারে।
- চিক গার্ড গোলাকার করে তৈরি করতে হবে, তা না হলে বাচ্চা একদিকে থাকবে। চাটাই বা হার্ড বোর্ডের বা তারের জালের তৈরি চিক গার্ডের উচ্চতা হবে ১.৫ ফুট। তবে শীতের সময় ২.৫ ফুট হতে পারে। চিক গার্ড ব্রুডার থেকে ২.৫-৩ ফুট দূরত্বে গোলাকারভাবে বসাতে হয়। ১২ ফুট ব্যাসের একটি চিক গার্ডে ৫০০ বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়।
- পাঁচ ফুট ব্যাসের হোভারের নিচে ৫০০ বাচ্চা রাখা যায়।
- হোভারের নিচের দিকে গ্রীষ্মকালে ১০০ ওয়াটের ২টি ও ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ও শীতকালে ২০০ ওয়াটের ২টি ও ১০০ ওয়াটের ২ টি বাল্ব লাগালে ৫০০ বাচ্চাকে ভালোভাবে তাপ দেওয়া যায়।
- ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য দেয়ালের চারদিকে চটের পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে হয়।
- প্লাস্টিক পর্দার উপরিভাগে গ্যাস অপসারণের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।
- ঘরে আর্দ্রতার পরিমাণ ৭০-৮০ ভাগ রাখতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডারের ছাড়ার ৬ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করে উপযুক্ত তাপমাত্রায় অর্থাৎ ৯৫° ফারেনহাইট এ আনতে হবে।
- হোভারের বাইরে পানির ও খাদ্যের পাত্রগুলো সমান দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।
- ব্রুডার ঘর প্রস্তুত হলে বাচ্চা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

২০২৩

- ঘরের প্রবেশ মুখে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঘরে প্রবেশের পূর্বে এই পানিতে হাত ও পা জীবাণুমুক্ত করতে পারে।
- অসুস্থ কোনো ব্যক্তির দ্বারা ব্রুডার ঘরে কাজ করানো যাবে না।
- ঘরে ইঁদুর টিকা বা অন্য কোনো পশু পাখি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- খামারে হ্যাচারির ট্রাক প্রবেশের সময় জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানিতে চাকা ডিপিং করতে হবে।
- খামারে লেয়ার বাচ্চা পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করতে হবে।
- বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১ বার করে ঘরের বাহিরের চতুপার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: ১.৯ ফুটবাথে পা জীবাণুমুক্তকরণ

১.৩.২ ব্রুডার হাউজের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা

(Brooder house temperature management):

মুরগির বাচ্চাকে কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। সাধারণত ১ দিন হতে ৩/৫ সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগির বাচ্চাকে ব্রুডিং করা হয়।

উৎপাদিত বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা ১০৩° ফারেনহাইট, যেখানে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা ১০৭° ফারেনহাইট। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর তারা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাচ্চার দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করতে হয়। তাই পীড়নের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্যই ব্রুডিং করা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে।

ব্রুডার হাউজে ব্রুডিং শুরুর প্রথম সপ্তাহে সাধারণত তাপমাত্রা ৯৫° ফারেনহাইট থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। হোভার ও চিকগার্ডের মাঝখানে মেঝে থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচুতে থার্মোমিটার দিয়ে নিরূপণকৃত তাপমাত্রাকে ব্রুডারের তাপমাত্রা বলে।

ব্রুডিং এর প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা(The Required Temperature In The Brooding):

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি(ফারেনহাইট)	ডিগ্রি (সেলসিয়াস)	
১	৯৫	৩৫	ভ্যাকসিন দেওয়ার-পর তাপমাত্রা ১ সেন্টিগ্রেড বাড়িয়ে রাখলে ভ্যাকসিন ভালো সাড়া দেয়।
২	৯০	৩২	
৩	৮৫	২৯	
৪	৮০	২৭	
৫	৭৫	২৪	
৬	৭০	২১	

টেবিল: ১.০২

১.৩.৩ ব্রুডিং ঘরের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা (Brooding House Others Management)

লেয়ার বাচ্চা গ্রহণ:

- লেয়ার বাচ্চা গ্রহণের পূর্বে খামারের প্রস্তুতি বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ব্রুডার ও ব্রুডারে পানির পাত্রে সরবরাহকৃত পানির তাপমাত্রা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ব্রুডার ও ব্রুডার পানির পাত্রে সরবরাকৃত পানির তাপমাত্রা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- বাচ্চা পরিবহনকারীকে শেডে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।
- পূর্ব থেকে নির্বাচিত কর্মচারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে ও বাচ্চা পালন ঘরে রাখবে।
- সাধারণত সকাল বেলায় ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাচ্চা গ্রহণ করা উচিত, এতে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে এবং বাচ্চা পানি ও খাদ্য চিনে খাওয়ার সুযোগ পাবে।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের মধ্যে মৃত বাচ্চার সংখ্যা পরীক্ষা করতে হবে।
- বাচ্চার আচরণ ও গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে।
- বাচ্চার সংখ্যা ও নমুনা ওজনের হিসাব রাখতে হবে।
- বাচ্চা গ্রহণের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রুডারে ছাড়তে হবে।

১.৩.৪ খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Feed Management):

- প্রতি লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন সি ও ২ গ্রাম ভিটামিন ডাব্লিউ –এস মিশিয়ে নতুন আনা লেয়ার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। তবে পরিবহন ধকল কমানোর জন্য ৮০ গ্রাম গ্লুকোজ ব্যবহার করতে হয়।
- প্রথম ২-৩ দিন এই পানি খাওয়াতে হবে।
- তবে কোনো বাচ্চা এই পানি না খেলে হাত দিয়ে ধরে খাওয়াতে হবে।
- ভিটামিন মিশ্রিত পানি খাওয়ার ৩ ঘন্টা পরে বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য বা গম বা ভুট্টার দানা অল্প পরিমাণে ট্রেতে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রথম ১-২ দিন লিটারের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে এবং পরবর্তীতে ১-২ সপ্তাহ ফ্লাট ট্রেতে খাবার দেয়া হয়।
- ব্রুডারের নিচে কখনই খাবার ছিটানো উচিত নয়।
- ৩য় সপ্তাহ থেকে হপার বা টিউব ফিডারে খাদ্য সরবরাহ করা যায়। ১০০ বাচ্চার জন্য (দৈর্ঘ্য ২ × প্রস্থ ১.৩ × উচ্চতা ১.৫) মাপের হিসাবে ৫০০ বাচ্চার জন্য ৫ টি ফিডার দিতে হবে। অতিরিক্ত ১ টি ফিডার দেওয়া ভালো।
- দুই সপ্তাহ পর্যন্ত খাবার শেষ হওয়ার আগেই খাবার দেওয়া উচিত। তা না হলে কিছু বাচ্চা বড় হয়ে যাবে এবং কিছু বাচ্চা ছোট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে খাবার থাকা অবস্থাতেই খাবার দিতে হবে।
- চার সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩-৪ বার খাবার দেওয়া উচিত। এর পর দৈনিক ২ বার খাবার দিলেই চলবে। খাবার দেওয়ার সময় পাত্র কখনও পরিপূর্ণ করে দেয়া যাবে না। পাত্রের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হবে।
- ঠিক জায়গায় বাড়ানোর সাথে সাথে ফিডারের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হয়।

চিত্র: ১.১০ ট্রে ফিডার

১.৩.৫ পানি ব্যবস্থাপনা (Water Management):

- ব্রুডারে পূর্ব থেকে পাত্রে পানি প্রদান করা হয়।
- বাচ্চার প্রথম পানি কখনই ঠান্ডা হওয়া উচিত নয়।
- খাবার পানির তাপমাত্রা প্রথম দিকে ২৫°-৩০° সে. রাখতে হবে।
- প্রথম অবস্থায় কখনই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে পানি তিতা হয়, ফলে বাচ্চা পানি গ্রহণ করতে চায় না, তাই গ্লুকোজ পানি খাওয়ানোর পর প্রয়োজনে ১ ঘন্টা পর ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রথম অবস্থায় প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য ১(এক) লিটারের ৬-৮ টি ড্রিংকার (ছোট প্লাস্টিকের পাত্র) দিতে হয়।

চিত্র: ১.১১ চিক ড্রিংকার

- প্রতি ড্রিংকারে পানি ০.৫ লিটার করে দিতে হবে ও প্রতিবার পানি দেওয়ার পূর্বে ড্রিংকার ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খাবার পানিতে ক্লোরিন ৩ পিপিএম (parts per million) মাত্রায় ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, তবে ভ্যাকসিন বা ঔষধ পানিতে মিশিয়ে খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন ব্যবহার করা উচিত নয়।
- চিক ড্রিংকার ৮-১০ দিন রাখতে হবে।
- এরপর জায়গা বাড়ানোর সাথে নিপল ড্রিংকার বা অন্য কোনো ড্রিংকার দিতে হবে।
- প্রতিটি মুরগির বাচ্চার পানি পান করার জন্য ২.৫ সে.মি. জায়গা দিতে হবে।
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানি পান করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

তাত্ত্বিক কাজ:

৫০০ লেয়ার মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং এ পানি ও খাবার পাত্রে সংখ্যা হিসেব করে লেখ?

ক্রমিক নং	খাবার পাত্রের সংখ্যা	পানির পাত্রের সংখ্যা

২০২৩

১.৩.৬ বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা (Air Movement Management):

ব্রুডারের তাপের উৎস থেকে উৎপন্ন কার্বন মনো-অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ব্রুডার ঘরে জমা হয়ে বাচ্চার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে । এ ছাড়া মলমূত্র হতে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে । তাই ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ ও দূষিত বায়ু নিষ্কাশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই-

- ঘরের প্লাস্টিক পর্দার উপরিভাগে অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাস অপসারণের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।
- ঘরের পরিবেশ বার বার পরীক্ষা করতে হয় ও দূষিত বায়ু অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পর্দা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- গরমের সময় দিনে পর্দা তুলে দিয়ে রাতে ঢেকে দিতে হবে।
- শীতের সময় অতিরিক্ত ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য ২ পর্দা প্লাস্টিকের পর্দা ব্যবহার করতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ু বের করার জন্য এগজস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

১.৩.৭ তাপ ব্যবস্থাপনা (Temperature Management):

১) যদি লেয়ার বাচ্চা চিক গার্ডের মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকে ও চলাফেরা করে , খাদ্য ও পানি গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখার এবং বাচ্চাগুলোর চলাফেরায় চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝতে হবে ব্রুডারে কাম্য তাপমাত্রা বজায় আছে।

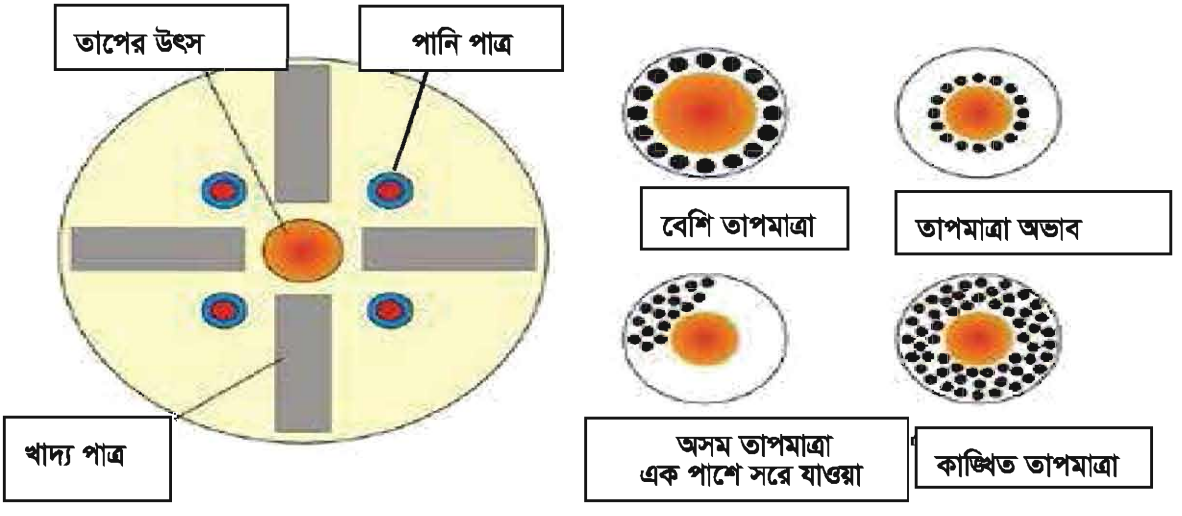

চিত্র: ১.১২ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

২) যদি লেয়ার বাচ্চা ব্রুডারে নিচে তাপের উৎসের কাছে সমস্ত জড়ো হয়, চি চি শব্দ করে ঘাড় ছোট করে গুটি সুটি মেরে থাকে ও একটির উপর আরেকটি উঠার প্রবণতা দেখায়, তখন ব্রুডার পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনে সক্ষম কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ উৎপাদনে সক্ষম ব্রুডার ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত বাল্বের এর তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।ঘরে যাতে অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ

করতে না পারে সেজন্য ঘরের নেট অংশে চট দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। পলিথিনের পর্দা ব্যবহার করা যাবে না।

৩) যদি লেয়ার বাচ্চাগুলো তাপের উৎস হতে দূরে সরে গিয়ে ব্রুডারের কাছাকাছি অবস্থান করে, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে, খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়, পানি গ্রহণের মাত্রা কমে যায়, তবে-

- তাপের উৎসের সুইচ বন্ধ করতে হবে।
- ঘর ঠান্ডা করার জন্য বেড়া দেয়া পর্দা তুলে দিতে হবে।
- ব্রুডার গার্ডের চারিদিকে চট ভিজিয়ে রাখলে ব্রুডিং তাপমাত্রা কিছুটা কমে।

তাত্ত্বিক কাজঃ ব্রুডার ঘরে কী পদক্ষেপ নিবে?	
বাচ্চা অবস্থা	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
• বেশি তাপমাত্রা হলে	
• তাপমাত্রা অভাব হলে	
• বাচ্চা ঘরে এক পাশে সরে গেলে	

১.৩.৮ আলো ব্যবস্থাপনা (Light Management):

লেয়ার বাচ্চার ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাচ্চা খাবার ও পানির পাত্র দেখতে পারে। একদিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত মুরগির বাচ্চার জন্য আলোক সময়কাল ও আলোর তীব্রতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে বাচ্চা আলোর সাহায্যে পানি ও খাদ্য চিনতে পারে। দিনে আলো থাকলে আলাদা আলো প্রদানের প্রয়োজন নেই, তবে রাতে বাল্ব জ্বালিয়ে আলো দিতে হবে।

চিত্রঃ ১.১৩ নিয়ন্ত্রিত ঘরে লেয়ার বাচ্চার আলোর ব্যবস্থাপনা

- ১ম ও ২য় সপ্তাহে ২৪ ঘন্টাই আলো রাখা প্রয়োজন।

- তবে প্রথম থেকেই প্রতি রাতে আধা ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচয় করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হলে বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে পাইলিং (চাপাচাপি) করে মারা যেতে পারে।
- ৩য় সপ্তাহে ২৩ ঘন্টা আলো ও ১ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন।
- ৪র্থ সপ্তাহে ২২ ঘন্টা আলো ও ২ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন।
- কৃত্রিম আলোর উৎস প্রধানত বৈদ্যুতিক বাল্ব, তবে বিকল্প হিসাবে কেরোসিন বাতি ব্যবহার করা যায়।
- প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- তার বা কর্ডের সাহায্যে বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বাতাসে বাল্ব দুলতে থাকলে ঘরে বা খাঁচায় ভৌতিক ভাব সৃষ্টি হয়।
- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ব্যবহার করতে হবে এবং ১০ ফুট দূরত্বে একটি বাল্ব থাকবে।
- আবার বিদ্যুৎ চলে গেলে আলো দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন চার্জার লাইট, হ্যাজাক লাইট, ছোট জেনারেটর, আইপিএস ইত্যাদি রাখতে হবে।
- বাল্বের সাথে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ।
- সপ্তাহে একবার বাল্ব পরিষ্কার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ।

বয়স অনুযায়ী মেঝেতে স্থান(Floor Place According to Age):

বয়স (দিন)	জায়গা/মুরগির বাচ্চা(বর্গফুট)	
	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে
১-৩	০.২০	০.৩০
৪-৭	০.৩৫	০.৪৫
৮-১১	০.৪৫	০.৬০
১২-১৪	০.৫০	০.৮৫
১৫-২০	০.৬০	১.০০
২১ দিনের উপর	১.০০	১.০০

টেবিল: ১.০৩

তাত্ত্বিক কাজঃ ৫০০ লেয়ার মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় মেঝেতে স্থান হিসেব কর।

১.৪ লেয়ার মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

Different Methods of Rearing Layer Chickens

১.৪.১ লেয়ার মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

(Different Methods of Rearing Layer Chickens)

মোরগ-মুরগির সঠিক উৎপাদন পেতে হলে অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে। মুরগির বাসস্থান যে এলাকায় তৈরি করা হবে, সে এলাকায় প্রাপ্ত উপকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত। এতে নির্মাণ ব্যয় অনেক কম হবে এবং খামারিরা অতি সহজেই নির্মাণ করতে পারবেন। আমাদের দেশে খামারিরা ৩টি পদ্ধতিতে ডিমপাড়া মুরগি পালন করে থাকে। যথা-

১) লিটার পদ্ধতি

২) মাচা পদ্ধতি

৩) খাঁচা পদ্ধতি

তবে সার্বিক ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী খরচ ও স্বাস্থ্যসম্মত দিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে মাচা ও খাঁচা পদ্ধতিতে ডিমপাড়া মুরগি পালন অধিক লাভজনক।

১. লিটার পদ্ধতি (Litter Method):

এই পদ্ধতিতে ঘরের মেঝের উপর বিছানা হিসাবে কাঠের গুঁড়া, তুষ, খড়ের ছোট ছোট টুকরা ইত্যাদি ব্যবহার করে মুরগি পালন করা যায়। লিটারের সহজলভ্যতা ও দামের উপর নির্ভর করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম লিটার ব্যবহার করা হয়।

লিটার পদ্ধতি আবার দুই প্রকার:

(ক) লাইট লিটার পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে ঘরের মেঝেতে ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছানো থাকে।

(খ) ডিপ লিটার পদ্ধতি: ঘরের মেঝেতে পুরু বা মোটা করে লিটার দেওয়া হয়। সাধারণত ৪-৮ ইঞ্চি, পুরু করে লিটার দেওয়া হয়।

লিটার পদ্ধতিতে বাচ্চা মুরগির জন্য ২-৩ ইঞ্চি, বাড়ন্ত মুরগির জন্য ৩-৪ ইঞ্চি ও ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জন্য ৪-৮ ইঞ্চি পুরু করা উচিত। মুরগি ঘরে উঠানোর ১ সপ্তাহে পূর্বে লিটার সরবরাহ করতে হবে।

চিত্র: ১.১৪ লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালন

এই পদ্ধতিতে সুবিধা:

- নির্মাণ ব্যয় কম।
- লিটার ব্যবহার করলে মুরগির বিষ্ঠা ঘরের মেঝের সাথে লেপ্টে থাকে না।
- ঘর শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে।
- ঘরে মুরগির অবস্থানকাল পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হয় না।
- ডিম পাড়া শেষে বাতিল মুরগি বিক্রয়ের পর লিটার পরিষ্কার করতে হয়।
- ডিমের গুণাগুণ ভালো হয় ও ডিম কম ভাঙে।
- ডিম উৎপাদন বেশি হয়।
- মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- মুরগি বেশি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ।
- তুলনামূলক সহজ ব্যবস্থাপনা।
- লিটারের মধ্যে এক প্রকার ভিটামিন ও আমিষ তৈরি হয় যা মুরগি লিটার থেকে খুঁটে খায়।
- লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যায় এবং জৈব খাদ্য হিসাবে মাছের জন্য ব্যবহার করা যায়।

এই পদ্ধতিতে অসুবিধা:

- শ্রমিক খরচ বেশি।
- ডিম ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিক জায়গা প্রয়োজন হয়।
- রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- মেঝেতে ডিম পাড়ার প্রবণতা হতে পারে।
- ভিজা লিটার মুরগির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ।
- লিটারের আর্দ্রতা বেশি থাকলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মুরগির জন্য ক্ষতিকর।

২. মাচা পদ্ধতি (Slat System):

ঘরের মধ্যে সমস্ত মেঝে জুড়ে মেঝের উপর ২৭ ইঞ্চি উঁচুতে মাচা তৈরি করা হয়। অনেক সময় পরিবেশ অনুসারে আরও উঁচু মাচা যুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। মাচার ফাঁক দিয়ে মুরগির বিষ্ঠা মাচার নিচে জমা হলে নিচে ঢুকে পরিষ্কার করতে হয়। ডিম পাড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘরের নিচে পায়খানা জমা হয়। এই পদ্ধতিতে মাচার নিচে মাছির উপদ্রব হয় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, ফলে মাঝে মাঝে বিষ্টা পরিষ্কার করে ফেলা হয়। বড় বাণিজ্যিক খামারে এ পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয় নয়।

চিত্র: ১.১৫ মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন

এই পদ্ধতির সুবিধা:

- রোগব্যাধি কম হয়।
- লিটার পদ্ধতির তুলনায় বেশি মুরগি রাখা যায়।
- বিছানার দরকার হয় না।
- মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবে বেশি উপযোগী।

২০২৩

এই পদ্ধতিতে অসুবিধা:

- নির্মাণ ব্যয় বেশি।
- ডিম ভাঙার সম্ভাবনা বেশি।
- প্রজননে জন্য অসুবিধা।
- মুরগির বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে অসুবিধা।
- মাছির উপদ্রব বেশি।

৩. খাঁচা পদ্ধতি:

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে খাঁচা পদ্ধতিতে দক্ষভাবে ডিমপাড়া মুরগি পালন করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি খাঁচার খোপের মাপ দৈর্ঘ্য ১৮″× প্রস্থ ১২″× উচ্চতা ১৯″ হলে, সেখানে অনায়াসে ৩ টি ডিম পাড়া মুরগি রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের খাঁচা বাজারে পাওয়া যায়।

(ক) একক ডেক খাঁচা:

ঘরের মধ্যে একক সারিতে স্থাপন করা হয়। প্রতি খাঁচা ঘরের মধ্যে একই সমতলে থাকে। মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি খাঁচার নিচে ঘরের মেঝেতে পড়ে। খাঁচা ঘরের সিলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে বা পিলারের উপর স্থাপন করা যায়।

চিত্র: ১.১৬ একক ডেক খাঁচা

(খ) দুই ডেক খাঁচা:

খাঁচা সিঁড়ির আকারে একটির উপর অপরটি দুই সারিতে স্থাপন করা যায়। প্রতি সারিতে খাঁচায় অবস্থিত মুরগির পায়খানা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝের উপর পড়ে। খোলামেলা ঘরের জন্য এই খাঁচা উপযোগী।

চিত্র:১.১৭ দুই ডেক খাঁচা

(গ) তিন ডেক খাঁচা:

এই প্রকৃতির খাঁচা একটির উপর অপরটি দুইভাবে সারিবদ্ধ করে স্থাপন করা যায়।

প্রথমত, সরাসরি একটি উপর অপর সারির খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি সারিতে খাঁচার নিচে মুরগির বিষ্ঠা জমা হওয়ার জন্য ট্রে দেওয়া থাকে। প্রতি দিন ট্রে পরিষ্কার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, তিন সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়। প্রতি তলার খাঁচার মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝেতে পড়ে। লোহার অ্যাঙ্গেল দ্বারা তৈরি করে এক সারিকে সিঁড়ির আকারে প্রতিটি অবকাঠামোর উপর ২৪ টি খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি খাঁচায় ৩ টি মুরগি হিসাবে ২৪ টি খাঁচায় ৭২ টি মুরগি পালন করা যায়। অনুরূপভাবে স্থাপিত খাঁচার প্রচলন বেশি। প্রতি অবকাঠামো ৬ -৭ এবং পায়াসহ উচ্চতা ৪.৫-৫। এভাবে ৪ বা ৫ ডেক স্থাপন করা যায়।

চিত্র: ১.১৮ তিন ডেক খাঁচা

(ঘ) ফ্লাট ডেক টাইপঃ

একই সারিতে একই সমতলে ঘরের মধ্যে খাঁচা স্থাপন করা হয়। প্রতি সারিতে খাঁচা খুব কাছাকাছি স্থাপন করা হয়। পরিচর্যা করার জন্য সারির মধ্যভাগে যাতায়াতের রাস্তা থাকে না। প্রতি সারির নিচ দিয়ে মটর চালিত চওড়া বেল্ট চালু থাকে। যেখানে মুরগির বিষ্ঠা পড়ে। এই চলন্ত বেল্ট বিষ্ঠা টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। ডিম সংগ্রহের জন্য চওড়া কনভেয়র বেল্ট মটরের সাহায্যে চালু করা হয়।

চিত্রঃ ১.১৯ ফ্লাট ডেক টাইপ

(ঙ) পিরামিড টাইপ বহুতল খাঁচাঃ

তিন সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়। এ ভাবে উভয় পার্শ্বে যখন ৩ সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়, তখন এতে পিরামিডের মতো মনে হয়। প্রতি তলার খাঁচার মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝেতে পড়ে। লোহার অ্যাঙ্গেল দ্বারা তৈরি করে এক সারিতে সিঁড়ির আকারে প্রতি অবকাঠামোর উপর ২৪ টি হিসাবে উভয় পার্শ্বে মোট ৪৮টি খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি খাঁচায় ৩ টি মুরগি হিসাবে ৪৮ টি খাঁচায় ১৪৪ টি মুরগি পালন করা যায়।

চিত্রঃ ১.২০ পিরামিড টাইপ বহুতল খাঁচা

(খ) এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া টাইপের বহুতল খাঁচায়ও মুরগি পালন করা হয়।

চিত্র: ১.২১ ক্যালিফোর্নিয়া টাইপের বহুতল খাঁচা

এ পদ্ধতির সুবিধা:

- অল্প জায়গায় বেশি মুরগি পালন করা যায়।
- পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়া সহজ।
- রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম।
- খাঁচার মধ্যে মুরগি কখনও কুঁচে হয় না।
- ডিম পাড়ার সাথে সাথে গড়িয়ে খাঁচার বাইরে চলে আসে।
- মুরগির ডিম খাওয়ার অভ্যাস জন্মাতে পারে না।
- ডিম ময়লা হয় না।
- মুরগির কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
- বিষ্ঠা দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়।

এ পদ্ধতির অসুবিধা:

- খাঁচার নিচে মুরগির বিষ্ঠা জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় ও মাছির উপদ্রব হয়।
- নিয়মিত বিষ্ঠা পরিষ্কার করা বিরক্তিকর।
- দুর্গন্ধে পার্শ্ববর্তী পরিবেশ দূষিত হয়।
- খাঁচা তৈরিতে প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি।
- ডিমে রক্তজমা সৃষ্টির হার বেশি।
- পায়ের নিচে খাঁচার ঘর্ষণে ফড়া পড়ে। একে 'বাম্বল ফুট' বলে।
- খাঁচায় পালিত মুরগির হাড় অত্যন্ত ভঙ্গুর হয় এবং বাজিল মুরগির দাম কম পাওয়া যায়।
- মুরগির ভিটামিন বি গ্রুপের অভাব বেশি হয়।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজঃ

লেয়ার পালন পদ্ধতির ৫টি করে সুবিধা-অসুবিধা লেখ।

পালন পদ্ধতি	সুবিধা	অসুবিধা
ক. লিটার পদ্ধতি		
খ. মাচা পদ্ধতি		
গ. খাঁচা পদ্ধতি		

জব ০১: মুরগির ঘর পরিস্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ।

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণের জন্য উপযুক্ত ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- যন্ত্রপাতি ও লেয়ার সেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা
- কর্মক্ষেত্রের বিধি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ স্থাপন করা
- যন্ত্রপাতির সক্ষমতা পরীক্ষা করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	জীবাণুনাশক	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	পানি	পরিষ্কার	যথেষ্ট পরিমাণ

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	স্প্রেয়ার	৫ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন	১টি
২	বালতি	৩০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন	১টি
৩	ঝাড়ু	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৪	মগ	১ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন	১টি

(খ) কাজের ধারাঃ

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।

২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান করো।

ডেটল

সেভলন

ভাইরোসিড

প্রতিসেপ্ত

চিত্রঃ ১.৮ বিভিন্ন প্রকার জীবাণুনাশক

৩. ঘরটি ঝাড়ু দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে নাও।

৪. নিরাপত্তা মূলক পোশাক পরিধান করে নাও।

৫. নির্দেশিত পরিমাণ পানি একটি বালতিতে নাও।

৬. নির্দেশিত মাত্রায় জীবাণুনাশক ঐ পানিতে মিশাও।

৭. মিশ্রণটি ভালভাবে নাড়াচাড়া করো।

৮. তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি স্প্রেয়ারে ভোল।

৯. এবার ঘরের মেঝে এবং দেয়ালে জীবাণুনাশক স্প্রে করো।

সতর্কতাঃ

- জীবাণুনাশক অবশ্যই মাত্রা মোতাবেক মেশাতে হবে।
- জীবাণুনাশক যেন শরীরে না লাগে ও নিঃশ্বাসে না যায়।

জব ০২ঃ লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং

পারদর্শিতার মানদন্ডঃ

- সুস্থ ও সবল লেয়ার হাইব্রিড বাচ্চা নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- বাচ্চা গণনা করে ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ব্রুডারে অবমুক্ত করা
- লেয়ার বাচ্চা পালনের উপযুক্ত পরিবেশ (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ) নিশ্চিত করা
- ব্রুডিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	-	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় মালামাল(Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	লেয়ার বাচ্চা	**গ্রেড-এ**	**৫০টি**
২	পেপার (পুরাতন)	**ভালো মানের**	**১ কেজি**
৩	চুন	**ভালো মানের**	**১০ কেজি**
৪	জীবাণুনাশক(আয়োসান/পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট)	২৫০ মিলি স্ট্যান্ডার্ড	**২ বোতল**

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	থার্মোমিটার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	হাইগ্রোমিটার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৩	সিরিঞ্জ	৫-১০ মিলি	১০টি
৪	নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	১০টি
৫	ব্রুডার	৪ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট	১টি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
৬	নিক্তি	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৭	স্প্রে মেশিন	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৮	ড্রপার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৯	পানির পাত্র	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
১০	খাবার পাত্র	স্ট্যান্ডার্ড	প্রয়োজনীয় সংখ্যক
১১	চিকগার্ড	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
১২	হোভার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
১৩	লিটার	৩০ কেজি বস্তা	১টি
১৪	চট/পর্দা	১০ মিটার	১টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. সহজে আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এমন একটি ঘর নির্বাচন করো।
২. ঘরটি ভালভাবে পরিস্কার করো।
৩. জীবাণুনাশক দিয়ে ঘরটি ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করো।
৪. ঘরটি শুকানোর পর মেঝেতে শুস্ক লিটার বিছিয়ে দাও ৩ ইঞ্চি হতে ৪ ইঞ্চি পুরু করে ।
৫. ঘরটির সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনানুসারে (এক /একাধিক) ব্রুডার স্থাপন কর। ৩০০-৪০০টি বাচ্চার জন্য ১টি ৪ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ব্রুডার নাও।
৬. বাচ্চার সংখ্যানুসারে ব্রুডারের চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে চিকগার্ড স্থাপন করো।
৭. চিকগার্ডের ভিতরে লিটারের উপর পেপার বিছিয়ে দাও।
৮. পেপারের উপর প্রয়োজনানুযায়ী খাবার ট্রে ও পানির ট্রে স্থাপন করো।
৯. থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার বাচ্চার গলার সমান উচ্চতায় ঝুলিয়ে দাও।
১০. বাচ্চা ছাড়ার ১২ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করে থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপ করো এবং খেয়াল রাখ তা কাঙ্খিত মাত্রায় আছে কি না।
১১. প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা উঠলে চিকগার্ডের ভিতরে একদিনের বাচ্চা ছাড়।

ব্রুডিং পিরিয়ডে বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বাচ্চার বয়স(সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)
১ম	৯৫
২য়	৯০
৩য়	৮৫
৪র্থ	৮০
৫ম	৭৫
৬ষ্ঠ	৭০

১২. ব্রুডিংকালে তাপমাত্রা কম বেশী হলে বাচ্চার অবস্থান নিম্নরূপ লক্ষ্য করা যায় তা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করোঃ

বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় :-

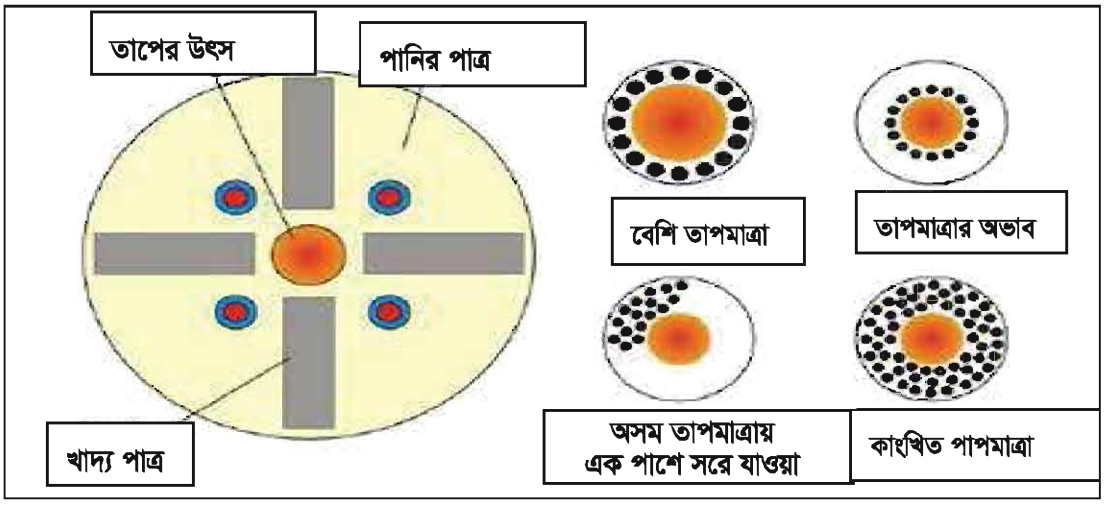

চিত্রঃ ১.১২ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

১৩. ব্রুডিং কালে বাচ্চাকে তালিকা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ষ্টার্টার রেশন ও বিশুদ্ধ পানি পরিবেশন করো।
১৪. নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক ঔষধপত্র ও টিকা প্রদান করো।
১৫. ছয় সপ্তাহ পর ব্রুডার এবং চিক গার্ড সরিয়ে ফেল।
১৬. বাচ্চাকে গ্রোয়ার শেডে স্থানান্তর করো।
১৭. সকল তথ্য রেকর্ড শীট ও রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতাঃ

- লিটার ভিজে গেলে দ্রুত সরিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।
- পানির পাত্র প্রতিদিন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- টিকাদান কর্মসূচী সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

জব ০৩: খাঁচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালন

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্ম ক্ষেত্রের বিধি অনুযায়ী বর্জ্য অপসারণ করা
- সূচি মোতাবেক টিকা প্রদান করা
- নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ প্রদান করা
- নির্দিষ্ট সময়ে ডিম সংগ্রহ করা
- কম উৎপাদনশীল মুরগি চিহ্নিত ও আলাদা করা
- কম উৎপাদনশীল মুরগি সুস্থ উৎপাদনশীল মুরগি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা
- মুরগিকে প্রযোজ্য সময়ে ডিবিকিং করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	ব্যহারের উপর নির্ভর করে	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	হাইগ্রোমিটার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	থার্মোমিটার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৩	সিরিঞ্জ	৫-১০ মিলি	১০টি
৪	ডিবিকার	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৫	ডিমের ট্রে	স্ট্যান্ডার্ড	৩টি
৬	ডিমের ঝুড়ি	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৭	চট পর্দা	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৮	কোদাল	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৯	বালতি	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
১০	ট্রলি	স্ট্যান্ডার্ড	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল(Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	খাদ্য	ভালো মানের	৫ কেজি
২	টিকা (ভ্যাকসিন)	বিসিআরডিডি, গামবোরো	১টি করে
৩	ঔষধপত্র	গামবোরো, ফাউল পক্স, ফাউল কলেরা, রানীক্ষেত	প্রয়োজনীয়

(ঘ)কাজের ধারাঃ

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।

২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান করো।

৩. ঘর নির্বাচন করে যথাযথভাবে পরিষ্কার করো।

৪. ঘরে খাঁচা, হাইগ্রোমিটার, থার্মোমিটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন কর এবং ফিউমিগেশন করে ঘর জীবাণুমুক্ত করো।

৫. খাঁচায় মুরগি প্রতিস্থাপিত কর। প্রতি ৩টি মুরগির জন্য মাপ (দৈর্ঘ্য ১৮// × প্রস্থ ১৭//×সামনের উচ্চতা ১৭.৫// এবং পিছনের উচ্চতা ১৫//)।

৬. খাঁচায় পানি ও খাদ্য সরবরাহ কর। বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য তালিকা মোতাবেক এবং লেয়ার প্রতি মুরগির জন্য দৈনিক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ১১৫-১২০গ্রাম খাদ্য/দিন।

৭. আলোক প্রদানঃ বাড়ন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে শিডিউল মোতাবেক এবং ডিম পাড়া মুরগির দৈনিক ১৬ ঘন্টা আলো ও ৮ঘন্টা অন্ধকার দাও। প্রতি ১০০ বর্গ ফুট জায়গার জন্য ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব ৭ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করো।

৮. তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করঃ লেয়ার মুরগির ঘরের কাংখিত তাপমাত্রা ২১°সে. এবং আর্দ্রতা ৬০-৬৫%।

৯. ঘরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করো।

চিত্রঃ ১.২২ খাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন

১০. সূচী মোতাবেক ভ্যাকসিন ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করো।

১১. বাড়ন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে (১৪ সপ্তাহ) ঠোঁট কাট।

১২. লেয়ার শেড হতে দিনে ২ বার ডিম সংগ্রহ করো।

১৩. নির্ধারিত সময় পরে কম ডিম দেয়া মুরগি গুলো ছাটাই করো।

১৪. রোগাক্রান্ত মুরগির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।

১৫. ৭২ সপ্তাহ পরে মুরগি বিক্রি করে দাও।

১৬. সকল তথ্য রেকর্ড শীট ও রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতাঃ

- বৈদ্যুতিক বাল্ব এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন আলো খাঁচায় প্রতি ধাপে ঠিকমত লাগে।
- পানির পাত্র নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগির জন্য ভিন্ন খাঁচা, পানি ও খাবার পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেয়ার খামার স্থাপনের জমির বৈশিষ্ট্য কী হবে?
২. কয় ধরনের ঘরে মুরগি পালন করা হয়?
৩. লিটার পদ্ধতিতে লিটার ধরে রাখার জন্য মেঝে থেকে কত উঁচু করে দেয়াল দেওয়া হয়?
৪. **"অল ইন অল আউট"** পদ্ধতি কী?
৫. এক ব্যাচ বাচ্চা পালন করার কত দিন পর অন্য ব্যাচে বাচ্চা উঠাতে হবে?
৬. পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে?
৭. ব্রুডিং কাকে বলে?
৮. পাঁচটি জীবাণুনাশক ঔষধের নাম লেখ।
৯. চিক গার্ডের উচ্চতা কত?
১০. শীতের সময় চিক গার্ডের উচ্চতা কত?
১১. কয়টি পদ্ধতিতে লেয়ার পালন করা যায়?
১২. লিটার পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাদা হালকা জাতের ক্ষেত্রে লিটার, মেঝে ও খাঁচা পদ্ধতিতে কতটুকু জায়গায় প্রয়োজন হয়?
২. রঙিন ভারী জাতের ক্ষেত্রে লিটার মেঝে ও খাঁচা পদ্ধতিতে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয়?
৩. গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য কী করতে হয়?
৪. ঘরের মেঝে, খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ কীভাবে করতে হয়?
৫. হোভারের বাইরে পানি ও খাদ্যপাত্র কীভাবে স্থাপন করা হয়?
৬. খাবার পানি কিভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়?
৭. ব্রুডারের তাপমাত্রা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?
৮. খাঁচা কত প্রকার ও কী কী?
৯. খাঁচা পদ্ধতির সুবিধা কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. লেয়ার খামারের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।
২. লেয়ার খামারের খোলামেলা ঘর তৈরির সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো।
৩. জীবাণুনাশক নির্ধারিত মাত্রায় মেশাতে হবে কেন? ব্যাখ্যা করো।
৪. ব্রুডিং ঘরে বাচ্চা তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করো।
৫. বাচ্চার আচরন দেখে কিভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায় তা বর্ণনা করো।
৬. ব্রুডিং হাউজে বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা করো।
৭. লেয়ার পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা করো।
৮. ব্রুডার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৯. ঘরে ফিউমিগশন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেয়ার মুরগির খাদ্য

Layer Chicken Feed

লেয়ার খামারে বিভিন্ন ধরনের খরচ হয়। এদের মধ্য স্থায়ী খরচ ও চলমান খরচ উল্লেখযোগ্য । একটি পোল্ট্রি খামারের মোট চলমান খরচের ৬৫-৭০% খাদ্য খরচ হয় । তাই খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর খামারের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে । যে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা যত ভাল, সে খামার তত লাভজনক । খামার লাভবান হলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এক জন দক্ষ পোল্ট্রি কর্মী দক্ষতার সাথে খাদ্য উপকরণ ক্রয়, লেয়ার মুরগির রেশন তৈরি, প্রস্তুতকৃত সুষম খাদ্য সংরক্ষণ ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করে একাজটি করতে পারবে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- যন্ত্রপাতি ও টুলস সংগ্রহ করতে পারব
- খাদ্য উপকরণ ক্রয় করতে পারব
- লেয়ার মুরগির রেশন তৈরি করতে পারব
- প্রস্তুতকৃত সুষম খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারব
- সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে পারব

২.১ লেয়ার মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Layer Chicken Feed Management)

মুরগির খাদ্যঃ

যে সমস্ত দ্রব্য আহার্য হিসেবে মুরগির শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, উৎপাদন, প্রজনন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে তাকে খাদ্য বলা হয়। একটি মুরগির খামারে মোট খরচের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগই খাদ্য বাবদ খরচ হয়।

লেয়ারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। খাদ্য উপকরণের মধ্যে যে উপাদান বেশি মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাকে সেই উপাদান যুক্ত খাদ্য বলা হয়। চালের কুঁড়ায় শক্তি বেশি থাকে বিধায় তা শর্করা জাতীয় খাদ্য।

২.১.১ লেয়ারের পুষ্টি উপাদান সমূহের নাম(Name of layer nutrient ingredients):

খাদ্য উপকরণে পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপাদান মোট ৬ ভাগে ভাগ করা যায়।
যেমন:

(১) শর্করা জাতীয় উপাদান
(২) আমিষ জাতীয় উপাদান
(৩) চর্বি বা তৈল জাতীয় উপাদান
(৪) খনিজ পদার্থ জাতীয় উপাদান
(৫) ভিটামিন জাতীয় উপাদান
(৬) পানি

হাঁস-মুরগির খাদ্যের ৭৫-৮০% ই শর্করা জাতীয় খাদ্য। সাধারণত যে দ্রব্যে ২০% এর কম আমিষ থাকে তাদের শর্করা জাতীয় খাদ্য হিসেব গণ্য করা হয়। প্রায় সব ধরনের দানা শস্যই শর্করা প্রধান খাদ্য।

শর্করা জাতীয় উপাদান আবার দুইভাগে বিভক্ত, যেমন-

(ক) দানা জাতীয় ও
(খ) আঁশ জাতীয়

দানা জাতীয়	আঁশ জাতীয়
গম	চালের মিহি কুঁড়া বা রাইস পালিশ
ভুট্টা	গমের ভুষি
কাউন	গমের দানা মিশ্রিত ভুষি
চাল	বিভিন্ন শাকসবজি
চালের খুদ	
সরগম বা জোয়ার	
যব	

টেবিল: ২.০১

চাল: চাল এবং চালের উপজাত দ্রব্যাদি মুরগির জন্য সহজপাচ্য ও সহজলভ্য শর্করা জাতীয় খাবার। খুদ বা ভাঙা চালের মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। তাই বাচ্চা মুরগি ও ডিমপাড়া মুরগির জন্য খুদ ব্যবহার করা

বাঞ্ছনীয়। খুদের মধ্যে আমিষ এবং ভিটামিন বি২ থাকে। খুদে ১০-১২% আমিষ, ১৩% চর্বি এবং গড়ে ১১-১২% আঁশ থাকে।

ভূট্টা: ভূট্টা সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হওয়ায় মুরগি বেশ পছন্দ করে । মুরগির খাদ্য হিসেবে ভূট্টা খুবই জনপ্রিয়। হলুদ ভুট্টার মধ্যে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ অধিক থাকে। ভূট্টা ছোট ছোট করে ভেঙে বা গুঁড়ো করে ও হাঁস-মুরগির খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গম: গমকে অনেকে হাঁস-মুরগির আদর্শ খাদ্য বলে মনে করেন। গম সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তদুপরি অন্যান্য দানাদার খাদ্যের তুলনায় আমিষের পরিমাণ অধিক। গমে সন্তোষজনক পরিমাণ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে। গম ভাঙা ও গমের ভুষি হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

যব: অন্যান্য দানা শস্যের সাথে মিশিয়ে যবকে মুরগির খাদ্য হিসেবে দেয়া যায়। যবে আঁশের পরিমাণ অধিক। অতিরিক্ত যব খাওয়ালে মুরগির চর্বি পরিমাণ বেড়ে যায়।

শাকসবজি: বেগুন, মিষ্টি আলু, লাউ, কুমড়া এবং অন্যান্য সবজির খোসা ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ সিদ্ধ করে মুরগিকে খেতে দেয়া যায়। এসব খাদ্য ভিটামিন সমৃদ্ধ। বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বীট, পালং শাক, পুঁইশাক, নটেশাক, মূলা প্রভৃতির পাতা কুঁচি কুঁচি করে কেটেও মুরগিকে খেতে দেয়া যায়। এসব খাদ্য ক্যারোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ।

চালের মিহি কুঁড়া: চালের কুঁড়া মুরগির একটি উৎকৃষ্ট খাবার। এতে চালের গুঁড়া থাকার ফলে শর্করার পরিমাণ অধিক। কুঁড়া সহজপাচ্য। কুঁড়া খাওয়ানোর আগে দেখে নিতে হবে তা ভেজা বা ছত্রাক আক্রান্ত কিনা।

গমের ভুষি: গমের দানার মোটা অংশই ব্যবহৃত হয় ভুষি হিসেবে। গমের ভুষির মধ্যে গড়ে ১৬% আমিষ থাকে। গম ও ভূট্টা তুলনায় গমের ভুষির আমিষ উন্নতমানের। এতে নিয়াসিন ও থায়ামিনের পরিমাণ অধিক। ডিমপাড়া মুরগির ক্ষেত্রে ১৫% গমের ভুষি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আমিষ জাতীয় উপাদান দুইভাগে বিভক্ত, যেমন-

(ক) প্রাণিজ আমিষ

(খ) উদ্ভিজ্জ আমিষ

প্রাণিজ আমিষ	উদ্ভিজ্জ আমিষ
বিভিন্ন মাছের শুঁটকি	সয়াবিন খৈল/সয়াবিন
মৎস্য উপজাত	তিল খৈল
চিংড়ি মাছ ও তার উপজাত	নারিকেল খৈল
পশুর নাড়িভুঁড়ি ও হাড়ের গুড়া	বাদাম খৈল
প্রোটিন কনসেনট্রেট	তিসি খৈল
ইপিল ইপিল পাতা	তুলাবীজের খৈল
শুকনা রক্তের গুঁড়া	ডাল ভাঙা
হাঁস-মুরগির উপজাত	ইপিল ইপিল পাতা
হ্যাচারি উপজাত	
ঝিনুক ও শামুকের মাংস	
কেঁচো মিল	
ননীযুক্ত গুঁড়া দুধ	

টেবিল: ২.০২

ফিস মিল বা শুটকি মাছের গুঁড়া: মাছ এবং তার বর্জ্য পদার্থকে শুকিয়ে চূর্ণ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে প্রাপ্ত দ্রব্যই ফিস মিল। এতে আমিষের পরিমাণ ৪৫-৫৫%। মুরগির জন্য ফিস মিল একটি আদর্শ খাদ্য। বাচ্চা মুরগিতে মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য অল্প পরিমাণে ফিস মিল ব্যবহার করতে হবে।

মিট মিল: মিট মিল হল শুকানো চূর্ণীকৃত মাংস বা মাংসের অংশ। এতে আমিষের পরিমাণ ৫০-৫৫%। মিট মিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও থাকে।

কেঁচো মিল: কেঁচো থেকে তৈরি খাদ্যকেই বলা হয় কেঁচো মিল। ফিস মিল, মিট মিল, বোন মিল প্রভৃতির বিকল্প হিসেবে কেঁচো মিল ব্যবহার করা যায়। এতে অশোধিত আমিষের পরিমাণ ৫৯.৪৭%।

হাড়ের গুঁড়া ও মাংসের অবশিষ্টাংশ: খুর, শিং ও হাড় ব্যতিত প্রাণীর দেহের মাংসের অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে ও গুঁড়ো করে এ খাদ্য পাওয়া যায়। এতে আমিষের পরিমাণ ৫৫%, খনিজ পদার্থের পরিমাণ ৪%। হাড়ের গুঁড়া ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ। উত্তমরুপে পরিশোধন করার পর এগুলো মুরগির খাদ্যের সাথে মেশানো হয়।

রক্তের গুঁড়া বা ব্লাড মিল: কসাইখানা থেকে পশুর রক্ত সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে চূর্ণ করা হয়। তবে এদেশে পর্যাপ্ত পশু রক্ত পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আমিষের পরিমাণ প্রায় ৭৫-৮০%। এতে সামান্য পরিমাণে খনিজ পদার্থও থাকে। বাচ্চা মুরগির খাদ্যের ব্লাড মিল দেয়া অনুচিত।

পোল্ট্রির শুকনা বিষ্ঠা: এতে অশোধিত আমিষ থাকার ফলে এটি চালের কুড়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির ক্ষেত্রে রেশনে যথাক্রমে ৫-১০% এবং ২০% হারে এটি ব্যবহার করা যায়।

সয়াবিন মিল: সয়াবিন ভালো করে সিদ্ধ করে শুকানোর পর গুড়ো করে বা তেল বের করে নেয়ার পর মিল হিসেবে মুরগিকে খাওয়ানো যায়। এতে প্রায় ৪৫% আমিষ ব্যতীতও সামান্য পরিমাণে চর্বি ও পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন থাকে।

তিলের খৈল: এতে আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫% ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ২.৩%। তিলের খৈল মুরগির জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। চীনা বাদামের খৈল ও তিলের খৈল অর্ধেক পরিমাণে মিশিয়ে মুরগির খাদ্য তৈরি করা যায়।

সরিষার খৈল: সরিষা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সরিষার খৈল। এতে ৩৭-৪০% আমিষ, ০.৬% ক্যালসিয়াম এবং ১.০% ফসফরাস থাকে। বিশেষ স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে মুরগি এ খৈল পছন্দ করে ।

চীনা বাদামের খৈল: চীনা বাদামের খৈল সুস্বাদু। অন্যান্য খাদ্যের সাথে চীনা বাদামের খৈল মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়। এতে আমিষ ৪৬.৫%, চর্বি বা স্নেহ পদার্থ ৪%, ক্যালসিয়াম ০.২৮% এবং ফসফরাস ১.২৮% থাকে।

নারকেলের খৈল: এ খৈলে আমিষের পরিমাণ ২০-২৫%। তবে বেশি দিনের পুরাতন খৈল মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ কিছুদিন রেখে দিলেই খৈলে ছত্রাক জন্মায় এবং খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

চর্বি জাতীয় উপাদান:

সয়াবিন	সূর্যমুখী ও তুলা বীজের তেল	মাছের তেল
তিল	সূর্যমুখী ও তুলা বীজের খৈল	গবাদি পশুর চর্বি
নারিকেল	চর্বি জাতীয় খাদ্য	হাঁস-মুরগি তেল

টেবিল: ২.০৩

খনিজ পদার্থঃ

ঝিনুক চূর্ণ	ডিমের খোসা ভাঙ্গা	শামুক চূর্ণ
সাধারণ লবণ	ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	ফিস মিল
ডিমের খোসা চূর্ণ	চুনা পাথর ক্যালসিয়াম কার্বনেট	ম্যাঙ্গানিজ লবণ

টেবিলঃ ২.০৪

শামুক ও ঝিনুক খোসাঃ

শামুক ও ঝিনুকের খোসা গুঁড়ো করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।। তবে এ খাদ্য সর্বোচ্চ ১-৩% মুরগির খাদ্যের সাথে মেশানো উচিত। ঝিনুকের গুঁড়ায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৭-৩৮%।

চুনা পাথরঃ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস হলো চুনা পাথর। মুরগির খাদ্যে ২-৪% হারে ব্যবহার করা যায়। এতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৮%। এটি মুরগির হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

বোনমিলঃ এটি একটি শুষ্ক খাদ্য। হাড়কে বায়ু চাপের উপস্থিতিতে বাষ্প ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়। মুরগির খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ খাদ্য লবণঃ মুরগির খাদ্যে অল্প পরিমাণে লবণ যোগ করা হলে মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি ও খাদ্য ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এটি সোডিয়াম ও ক্লোরাইডের প্রধান উৎস। তবে মুরগির খাদ্যে অধিক মাত্রায় লবণ যোগ করা ঠিক নয়। খাবারের সাথে ০.৫% মাত্রায় লবণ যোগ করতে হয়। লবণ মুরগির পানি গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । তাছাড়া লবণ মুরগির খাদ্যকে সুস্বাদু করে ও হজমে সাহায্য করে ।

ভিটামিন জাতীয় উপাদানঃ

শাকসবজি, মাছের তেল, অংকুরিত গম ও ছোলা, হলুদ ভুট্টা, সবুজ ঘাস, চালের মিহি কুড়া ইত্যাদিতে কম বেশি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন থাকে। তারপরও খাদ্যের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন প্রিমিক্স হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।

২.১.২ লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সুষম খাদ্য কী?

মুরগির দেহের নির্বাহী কার্য পরিচালনা, শারীরিক বৃদ্ধি, উৎপাদন, পালক গঠন ও দেহের মধ্যে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বা রেশন বলে। সুষম খাদ্যে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও পানি সঠিক অনুপাত অনুযায়ী বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে এ সকল উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যের গুরুত্বঃ

মুরগিকে সুষম খাদ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সুষম খাদ্য মুরগিকে সরবরাহ না করা হয় তবে যে খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকে তার কারণে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

মুরগিকে সুষম খাদ্য প্রদান করলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়ঃ

- উৎপাদন (ডিম, মাংস, ডিম ফোটার হার, সুস্থ সবল বাচ্চা) বৃদ্ধি পায়।
- অপুষ্টিজনিত রোগ এবং অন্যান্য রোগ কম হয়।
- সম্পদ ও শ্রমিকের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।
- খামারে লাভ বেশি হয়।
- খামারের ব্যবহারিক মান বৃদ্ধি পেয়ে বাজারের প্রসার ঘটে।
- উৎপাদন বাড়ায়, খামারি লাভবান হয়।
- ডিম এবং মাংসের গুণগতমান ভালো হয়।
- অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে মুরগি পালন করা যায়।
- অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থ সবল মুরগি পাওয়া যায়।
- মুরগির বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়।
- মুরগির মৃত্যু হার হ্রাস পায়।

পুষ্টির উৎস অনুসারে সুষম খাদ্যে উপাদান যোগ করার নিয়মঃ

১. শক্তির জন্যঃ দানাশস্য ও এর উপজাত ৬০-৬৫ %

২. আমিষের জন্যঃ প্রাণিজ উৎস; ৫-১৫%, উদ্ভিজ্জ উৎস; ১৮-২২%

৩. খনিজ মিশ্রণঃ ২-৯ %

৪. ভিটামিনঃ ভিটামিন প্রিমিক্স প্রতি ১০০ কেজিতে ২৫০-৩০০গ্রাম।

লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়-

১. খাদ্যসামগ্রী বা উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা:

সুষম খাবার তৈরিতে পরিচিত ও সহজলভ্য উপকরণ নির্বাচন করা উচিত। পরিচিত উপকরণের গুণগতমান সহজে জানা যায়। স্থানীয় মূল্য যাচাই করা যায়। কোনো উপকরণের ঘাটতি পড়লে সহজে সংগ্রহ করা যায়। সহজলভ্য উপকরণের পরিবহন খরচ কম হয়। বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও মজুদ করা যায়। উপকরণের গুণগতমান খারাপ হলে পরিবর্তন করা যায়।

২. উপকরণের মূল্য:

খাদ্য উপকরণ যত সস্তায় সংগ্রহ করা যায়, খাদ্য প্রস্তুতে খরচের তত সাশ্রয়ী হয়। ফলে ডিম উৎপাদনে খরচ কমে যায়। খামারে মোট খাদ্য খরচের ৬৫-৭৫ ভাগ পর্যন্ত খরচ হয় খাদ্যের জন্য। মানুষের খাদ্য উপকরণের সাথে প্রতিযোগিতা কমাতে যতদুর সম্ভব সস্তায় বিকল্প খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

৩. খাদ্যের গুণগতমান:

প্রস্তুতকৃত খাদ্য অবশ্যই গুণগতমানের হওয়া উচিত, খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বে প্রতি উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) পরীক্ষা করতে হয়। কোনো প্রকার পচাঁ, ছত্রাক যুক্ত অথবা গন্ধযুক্ত খাবার ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত কারণে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়, তা হলো-

- উপকরণে আর্দ্রতা (১২% এর উপরে হলে) বেশি থাকলে
- বেশি পুরোনো হলে
- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে
- ঘরের মেঝে ভিজা ও আর্দ্র থাকলে
- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকলে
- সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করার ফলে
- পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ হলে, ভেজাল থাকলে
- খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় কীটনাশক ব্যবহার করলে
- ছত্রাক ও মোল্ডযুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করলে

৪. খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতা:

রুচিসম্মত খাদ্য না হলে মুরগি খায় না। দানা জাতীয় খাদ্য বেশি মিহি হলে মুরগি কম খায়। কোনো উপকরণের দানা বড় থাকলে মুরগি বেছে বড় দানা আগে খায়, ফলে অন্যান্য উপাদান তলে পড়ে থাকে। বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপকরণের মিশ্রণ সুষম হতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের দানা যতদূর সম্ভব সুষম হতে হবে। খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত থাকলে এবং খাদ্য পচাঁ ও ছত্রাকযুক্ত হলে মুরগি খাদ্য পছন্দ করবে না। ক্রাম্বল ও পিলেট খাদ্য মুরগি বেশি পছন্দ করে ।

৫. জাতঃ

হালকা জাতের লেয়ারের তুলনায় ভারী জাতের লেয়ার বেশি খাদ্য খায়। সাদা জাতের লেয়ারের তুলনায় রঙিন জাতের লেয়ার বেশি খাদ্য খায়।

৬. বয়সঃ

বয়স অনুসারে বিভিন্ন পুষ্টিমানের খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বাচ্চা অবস্থায় বেশি শক্তি ও আমিষের প্রয়োজন, ডিম পাড়া মুরগির খাদ্যে শক্তি ও আমিষের প্রয়োজন পরিমাণ বাচ্চার তুলনায় কম লাগে।

৭. লিঙ্গঃ

মোরগ-মুরগির তুলনায় বেশি খাদ্য খায় এবং দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পায়।

৮. ওজনঃ

লেয়ার মুরগির ওজন বৃদ্ধি সমানুপাতে না হলে, কম ওজনের মুরগিকে আলাদাভাবে খাদ্যে আমিষের হার বৃদ্ধি করে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

৯. আবহাওয়াঃ

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যে পুষ্টিমান পুনর্বিন্যাস্ত করতে হয়।

১০. বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার পরিমাণ বা মাত্রাঃ

উপাদান	সর্বোচ্চ ব্যবহার মাত্রা (%)
ভুট্টা	৬০
গম	৫০
চালের কুঁড়া	১৫-২০
গমের ভুষি	১০
সয়াবিন মিল	৪০
তিলের খৈল	১০
সরিষার খৈল	৫
সূর্যমুখী খৈল	২০
শুটকি মাছের গুঁড়া	১০
রক্তের গুঁড়া	৩
পোল্ট্রির উপজাত	৫
লবণ	০.৩-০.৫

উপাদান	সর্বোচ্চ ব্যবহার মাত্রা (%)
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	১-২
ঝিনুক	১-৩
লাইম স্টোন	১-৩
অ্যান্টিবায়োটিক	০.১-০.৫
ভিটামিন	উৎপাদনকারীর পরামর্শ মতো

টেবিল: ২.০৫

২.১.৩ ভালো খাদ্যের গুণাগুণ সঠিক আছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন-

- খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহ অবশ্যই প্রয়োজনীয় পুষ্টি মাত্রার অধিকারী হতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই ফাংগাস বা আফলা টক্সিন মুক্ত হতে হবে।
- খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহ যেন কোনো অবস্থাতেই চাকা লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- খাদ্যের আর্দ্রতা ১২% এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং এটি অবশ্যই দুর্গন্ধমুক্ত ও পোকামুক্ত হতে হবে।
- ম্যাশ ফিডে গুঁড়া বা পাউডার থাকে। তবে এটি ২৫-৩০% এর বেশি যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

২.১.৪ লেয়ারের বয়স অনুযায়ী ব্যবহৃত সুষম খাদ্য

ডিমপাড়া মুরগির প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে যতটা সম্ভব বেশি প্রকারের খাদ্য উপাদান দিয়ে মিশ্রিত খাদ্য তৈরি করতে হবে, এতে খাদ্য সুস্বাদু ও সুষম হবে। লেয়ারের খাদ্যকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা হয়। যথা-

১. স্টার্টার রেশন (০-৮ সপ্তাহ)
২. গ্রোয়ার রেশন (৯-১৭ সপ্তাহ)
৩. লেয়ার রেশন (১৮-৭২ সপ্তাহ)

বিভিন্ন পর্বে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ

পুষ্টি উপাদান	লেয়ার স্টার্টার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার (৯-১৭ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৮-৭২ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি(কি. ক্যালরি/কেজি খাদ্য)	২৯০০	২৮০০	২৮০০
আমিষ (%)	১৮-১৯	১৬-১৭	১৬-১৭
আঁশ (%)	৩.০	৫.০	৪.০
ক্যালসিয়াম (%)	১.০	১.০	৩.৫
প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম(%)	০.৫	০.৫	০.৫
চর্বি (%)	৩.৫-৪.০	৪.৫	৩-৩.৫
লাইসিন (%)	১.০	০.৭	০.৫
মিথিওনিন (%)	০.৪০	০.৩০	০.৩৫
জলীয় অংশ (%)	১০	১০	১০
ভিটামিন এ (ইউ এস পি)	১৪০০	১৪০০	৪০০০
ভিটামিন ডি৩ (আই চিক ইউ)	২০০	২০০	৫০০
ভিটামিন ই (আই ইউ)	৫	৪	৪
থায়ামিন (বি-১ মিলিগ্রাম)	১.৮	১.৮	১.৮
রাইবোফ্লোবিন (বি-২) (মি. গ্রাম)	০.৬	১.৮	১.৮
পেন্ট্রোথিনিক অ্যাসিড (মি. গ্রাম)	১০.০	১০.০	২.২
নিকোটিনিক অ্যাসিড (মি. গ্রাম)	৫	১১	১১
পাইরোডক্সি (মি. গ্রাম)	৩	৩	৩
বায়োটিন (মি. গ্রাম)	০.০৯	০.১০	০.১০
কলিন (মি. গ্রাম)	৯০০	৯৮০	৫০০
ফলিক অ্যাসিড (মি. গ্রাম)	১.২	১.০	০.২৫
ভিটামিন বি-১২ (মি. গ্রাম)	০.০০৩	০.০০৩৪	০.০০৩
সোডিয়াম (%)	০.১৮	০.১৮	০.২০
ম্যাঙ্গানিজ (মি. গ্রাম)	০.৬৬	০.৬৬	০.৬৬
আয়োডিন (মি. গ্রাম)	০.০০১	০.০০১	০.০০১
লৌহ (মি. গ্রাম)	০.৩৩	০.৩০	০.৩০
তামা (মি. গ্রাম)	০.০৪	০.০৪	০.০৭

দস্তা (মি. গ্রাম)	০.৬৬	০.৬৬	০.৬৬
পটাসিয়াম (%)	০.২	০.২	০.২
ম্যাগনেসিয়াম (%)	০.০৫	০.০৫	০.০৫

টেবিল: ২.০৬

লেয়ার মুরগির বিভিন্ন পর্বের জন্য খাদ্য তালিকা:

পুষ্টি উপাদান	লেয়ার স্টার্টার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার (৯-১৭ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৮-৭২ সপ্তাহ)
ভুট্টা কেজি)	৫৪.২৫	৫২	৪৪
চালের কুঁড়া (কেজি)	১৭	২২	২৪
সয়াবিন মিল (কেজি)	১৭	১১	১৩
প্রোটিন কনসেনট্রেট (কেজি)	১০	১০	
ঝিনুকের গুঁড়া (কেজি)	১.০	৪.২৫	৭.৫
লবন (সর্বোচ্চ)(গ্রাম)	৪৫০	৪৫০	৪৫০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স (গ্রাম)	২২৫	২২৫	২২৫
লাইসিন (গ্রাম)	৫০	৫০	৫০
মিথিওনিন (গ্রাম)	৫০	৫০	-
টক্সিন বাইন্ডার (গ্রাম)	-	-	৫০
কোলিন ক্লোরাইড (গ্রাম)	১০০	১০০	১০০
মোট =	১০০কেজি	১০০কেজি	১০০কেজি

টেবিল: ২.০৭

উপরের উপাদানগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়, যেখানে মুরগির বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপস্থিত থাকবে।

বাচ্চা মোরগ-মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন(%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	৪৬	১৪৯৫০০	৫.৫২	০.০১৮৪	০.০৫৯৮
২. চালের কুড়া	১৫	৪২৯০০	১.৮০	০.০০৬০	০.০২৪০
৩. চালের ক্ষুদ	১০	১৬৩০০	১.১০	০.০১২০	০.০২১০
৪. তিলের খুদ	১২	২২৯২০	৪.২০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুটকি মাছের গুড়া	১৫	৩৯৬০০	৭.৫০	০.৬০০০	০.৪২০০
৬. হাড়ের গুঁড়া	১.০			০.২৪০০	০.১২০০
৭. ঝিনুক চূর্ণ	০.৫			০.১৮৫০	
৮. লবণ		০.৫			
মোট=	১০০.০	=২৭১২০০	=২০.১২	=১.৩০১৪	=০.৬৮০৮
এম্বাভিট-জি.এস	০.২৫গ্রাম				
তৈরীকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭১২.২০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২০.১২%	১.৩০১৪ %	০.৬৮০৮%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২০%	১%	০.৫%

টেবিল: ২.০৮

তাত্ত্বিক কাজঃ

২০ সপ্তাহ বয়সের ১০০০টি ডিম পাড়া মুরগির জন্য ৫০ কেজি মিশ্রিত খাদ্য(রেশন) তৈরী করো।

বাড়ন্ত বয়সের মোরগ-মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন(%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	৪৬	১৪৯৫০০	৪৬×১২/১০০ =৫.৫২	০.০১৮৪	০.০৫৯৮
২. চালের কুড়া	২০	৫৭২০০	২.৪০	০.০০৮০	০.০৩২০
৩. চালের খুদ	১০	১৬৩০০	১.১০	০.০১২০	০.০২১০
৪. তিলের খুদ	১২	২২৯২০	৩.৬০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুটকি মাছের গুড়া	১০	২৬৪০০	৫.০০	০.৪০০০	০.২৮০০
৬. হাড়ের গুঁড়া	১.০	-	-	০.২৪০০	০.১২০০
৭. ঝিনুক চূর্ণ	০.৫	-	-	০.১৮৫০	-
৮. লবণ		০.৫	-	-	-
-					
মোট (কেজি)	১০০	=২৭২৩২০	=১৭.৬২	=১.১০৩৪	=০.৫৪৮৮
এম্বাভিট-জি.এস	২.২৫				
তৈরীকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭২৩.২০ কিলোক্যালোরি /কেজি	১৭.৬২%	১.১০৩৪%	০.৫৪৮৮%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি /কেজি	১৬%	১%	০.৫%

টেবিল: ২.০৯

লেয়ার রেশন মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি(কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন(%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	২৪	৭৮০০০	২.৮৮	০.০০৮৯৬	০.০৩১২
২.ভুট্টা ভাঙা	২০	৬৭৪০০	১.৮০	০.০৪০	০.০২০০
৩. চালের কুড়া	১৯.৭৫	৫৭২০০	২.৪০	০.০০৮০	০.০৩২০
৪. তিলের খৈল	১২	২২৯২০	৪.২০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুটকি মাছের গুড়া	১৪	৩৬৯৬০	৭.০০	০.৫৬০০	০.৩৯২০
৬. হাড়ের গুঁড়া	৫.৫	-	-	২.০৩৫০	-
৭. ঝিনুক চূর্ণ	৩.০	-	-	০.২০০	০.৩৬০০
৮.সয়াবিন তেল	১.০	৮৮০০	-	-	-
৯. লবণ	০.৫	-	-	-	-
১০ এম্বাভিট-জি.এস	০.২৫গ্রাম				
মোট	১০০	২৭১২৮০	১৮.২৮	৩.৫৭৬৬	০.৭১২
তৈরীকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭১২.৮০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৮.২৮%	৩.৫৭৬৬%	০.৭১২%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৮%	৩.৫%	০.৫%

টেবিল: ২.১০

২.১.৫ লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ

লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরি ধাপ:

- প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু- দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভুট্টা, গম, কুড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কানসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে।
- খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে এক সঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তুপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- সমস্ত মিশ্রণেকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।
- এ ধরণের মিশ্রিত খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন:

- রেশন ফর্মুলেশনের পূর্বে অবশ্যই খাদ্য উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ এবং ভৌত অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে।
- ভেজা ছত্রাকযুক্ত , দলাপাকা এবং দূষিত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না।
- খাদ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ কখনও ১২ শতাংশের বেশি হওয়া যাবে না।
- ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে এবং অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রণ করা যাবে না।
- খাদ্য তৈরির পর অধিক সময় ধরে খাদ্য মাটিতে বা মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না।
- খাদ্য প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

সুষম খাদ্য সংরক্ষণ:

- খাদ্য সংরক্ষণাগারে /গুদামে সঠিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা খাদ্যকে আর্দ্র হওয়া থেকে মুক্ত করবে।
- খাদ্য বস্তা মেঝে/ মাটিতে না রেখে কিছুটা উঁচুতে তাক বা মাচা করে রাখতে হবে।
- খাদ্য বস্তা দেয়াল ঘেঁষে রাখা উচিত নয়।
- খাদ্য গুদাম বিষাক্ত পোকামাকড়, ইঁদুর এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি যেন খাদ্য গুদামে না প্রবেশ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদের আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাবারের ব্যাগের মুখ খোলা থাকলে বাতাসে অধিক আর্দ্রতার কারণে ফাংগাস জন্মাতে পারে সে জন্য মুখ বন্ধ রাখতে হবে।
- খাবার খোলা অবস্থায় মাটিতে স্তূপ আকারে রাখা সঠিক নয়, কারণ স্তূপে অধিক তাপ উৎপাদন হয়ে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
- খাদ্যের সাথে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক ব্যবহারের অন্তত ২৪ ঘন্টা পর সেই খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।
- খাবারের পাত্রে মুরগি যাতে পায়খানা করতে না পাওে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মিশ্রিত খাদ্য বেশি দিন রাখা যাবে না, তিন দিনের বেশি খাদ্য একবারে তৈরি করা যাবে না।
- মুরগির খাদ্য ও ডিম একত্রে রাখা যাবে না।

২.১.৬ তৈরিকৃত খাদ্য ও প্রকারভেদ:

তৈরিকৃত খাদ্য ৩ প্রকার

১. ম্যাশ খাদ্য।
২. পিলেট খাদ্য।
৩. ক্রাম্বল খাদ্য।

(ক) ম্যাশ খাদ্য:

খাদ্যের সমস্ত উপকরণ গুড়া করে একত্রে মিশানোকে ম্যাশ খাদ্য বলে। হাতে মিশ্রণ করলে প্রথমে পরিমাণে অল্প উপকরণসমূহ একত্রে মিশাতে হবে। ক্রমান্বয়ে বেশি উপকরণের সাথে একত্র করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে মিশালে মিশ্রণ সুষম হয়। পিটার পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগির জন্য এই খাদ্য বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে মুরগি খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে মুরগির ঠোকরা-ঠুকরী করার সম্ভাবনা কমে। পিলেট খাদ্য দিলে তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে ফেলে, ফলে মুরগি ঠোকরা-ঠুকরী করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

চিত্র: ২.১ ম্যাশ খাদ্য

(খ) পিলেট খাদ্য:

ম্যাশ খাদ্যকে লোহার জালিযুক্ত ছাকনির মধ্য দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করলে পিলেট তৈরি হয়। পিলেট খাদ্য ব্যবহার করলে খাদ্যের অপচয় কমে ও মুরগি বেশি পছন্দ করে। ব্রয়লারের জন্য এ খাদ্য বেশি ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ-২.২ মুরগির বিভিন্ন ধরনের পিলেট খাদ্য

(গ) ক্রাম্বল খাদ্য : ম্যাশ খাদ্যের অন্য প্রকৃতি ক্রাম্বল খাদ্য। ক্রাম্বল খাদ্যের দানা পিলেট দানার চেয়ে ছোট। এ খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের অপচয় কম হয়। পিলেটের মতই যন্ত্রের সাহায্যে ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। স্টার্টার রেশন হিসেবে এ খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক ফিড মিলগুলোতে পিলেট খাদ্য ও ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। বড় লেয়ার খামারগুলোতে ডিমপাড়া মুরগির জন্য পিলেট খাদ্য এবং বাচ্চার জন্য ক্রাম্বল খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ-২.৩ ক্রাম্বল খাদ্য

অনুসন্ধানমূলক কাজঃ

- তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেকোনো একটি লেয়ার খামার পরিদর্শণ করো।
- খামারে ব্যবহৃত খাদ্যের ধরনের উপর মতামত দাও।

"পরিদর্শণ ছক"

▪ খামারের নাম	
▪ ঠিকানা	
▪ লেয়ার মুরগির সংখ্যা কত?	
▪ লেয়ার মুরগির বয়স(সপ্তাহ) কত?	
▪ কোন ধরনের খাদ্য খাওয়ানো হয়?	
▪ খাদ্য তৈরিতে কী কী উপাদান ব্যবহৃত হয়?	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১.
▪ শিক্ষার্থীর নাম	
▪ শ্রেণি	
▪ রোল নম্বর	
▪ প্রতিষ্ঠানের নাম	
▪ শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
[বি.দ্রঃ এই ছকটি পুরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও	

লেয়ার মুরগির খাদ্য সরবরাহঃ

লেয়ার মুরগির খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়, সরবরাহের পরিমাণ, বয়স অনুযায়ী ওজন, মুরগির জাত ও রং ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়, যা নিচে বর্ণনা করা হলো-

(ক) নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য প্রদান:

- লেয়ার মুরগিকে সুনির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- দিনের খাদ্যকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করে সকাল -বিকাল বা সকাল -দুপুর -বিকালে দেওয়া যায়।
- তবে বর্তমানে ডিমপাড়া মুরগিকে ৪-৫ বার খাদ্য দেয়া যায়।
- খাদ্য দেওয়ার সময় পাত্রের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হয়।
- পাত্র পূর্ণ করে দিলে মুরগি ঠোঁট দ্বারা খাদ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপচয় করে ।
- মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময় পর পর পাত্রের খাদ্য নাড়াচাড়া করে দিলে খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং মুরগি আগ্রহ নিয়ে খায়।

(খ) বয়স ও ওজন অনুযায়ী খাদ্য প্রদান:

- ১০ বা ১৫ সপ্তাহের পুলেট ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
- বয়স ও ওজন অনুসারে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পরিমিত খাদ্য প্রদান করতে হয়।
- প্রতি সপ্তাহে পুলেটের ওজন গ্রহণ করতে হয়।
- নির্দিষ্ট বয়সে নির্ধারিত ওজন না হলে খাদ্যের পরিমাণ বা খাদ্যে আমিষের পরিমাণ বাড়াতে হয়।
- ওজন বেশি হলে খাদ্য সরবরাহ বা খাদ্যে আমিষের পরিমাণ কমিয়ে ওজন কমাতে হয়।
- ডিম পাড়ার পূর্বে বা ডিম পাড়া শুরু করলে আনুপাতিক হারে ওজন বেশি থাকলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে ওজন কমানো যাবে না। এতে মুরগি দ্রুত অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে।
- প্রথম ডিম উৎপাদন শুরু হলে স্বাধীনভাবে খেতে দিতে হয়।

(গ) জাত ও বর্ণ অনুসারে খাদ্য প্রদান:

- জাত ও বর্ণ অনুসারে হালকা জাতের মুরগি ভারী জাতের মুরগির তুলনায় কম খাদ্য খায়।
- সাদা হালকা জাতের মুরগি রঙিন ভারী জাতের মুরগির তুলনায় কম খাদ্য খায়।

(ঘ) জাত ও স্ট্রেইন অনুসারে খাদ্য প্রদান:

- জাত ও স্ট্রেইন অনুসারে খাদ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ পরিবর্তন করা হয়।

(ঙ) খাদ্য সরবরাহের জন্য খাবার পাত্রে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা:

মুরগির জাত	ট্রাফ পাত্রে মুরগি প্রতি স্থান	পানি পাত্রে প্যান প্রতি মুরগির সংখ্যা	টিউব ফিডার প্রতি পাত্রে মুরগির সংখ্যা
সাদা হালকা জাত	৩.৫ইঞ্চি(৮.৭৫ সে.মি.)	১৪	১৮
রঙিন ভারী জাত	৪.০ ইঞ্চি (১০ সে.মি)	১২	১৫

টেবিল: ২.১১

বাণিজ্যিক লেয়ারের গড় খাদ্য গ্রহণ (হালকা জাতের ক্ষেত্রে):

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন/মুরগি)	সর্বমোট খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)
১	৬০	১০	৬০
২	১০৫	১৫	১৬৫
৩	১৭০	২০	৩০৫
৪	২৪০	২৮	৫০১
৫	৩১০	৩৬	৭৫৩
৬	৩৯০	৪০	১০৩৩
৭	৪৮০	৪৩	১৩৪৪
৮	৫৬৬	৪৫	১৬৫৯
৯	৬৪৬	৪৮	১৯৯৫
১০	৭২৪	৫০	২৩৪৫
১১	৮০৬	৫২	২৭০৯
১২	৮৮১	৫৫	৩০৯৪
১৩	৯৫৬	৫৭	৩৪৯৩
১৪	১০২১	৫৯	৩৯০৬
১৫	১০৮৩	৬২	৪৩৪০
১৬	১১৪৩	৬৫	৪৭৯৫
১৭	১২০১	৬৭	৫২৬৪
১৮	১২৫৭	৭০	৫৭৫৪
১৯	১৩০২	৭৭	৬২৯৩
২০	১৩৫৮	৮৪	৬৮৮১
২১-৭২	১৪২০-২০০০	৯০-১১৫	৪৮০০০

টেবিল: ২.১২

জন্ম হতে ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিটি লেয়ার এর ক্রমপুঞ্জিত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ৪৮ কেজি ও পানি গ্রহণ ১০০-১৩৫ লিটার। ডিম উৎপাদনকালীন সময় প্রতিটি মুরগি গড়ে দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম খাবার ও ৩০০-৫০০ মিলি. পানি খেয়ে থাকে।

জব ০৪ : লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য তৈরিকরণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও টুলস এর তালিকা তৈরি করা
- যন্ত্রপাতি ও টুলস নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা
- খাদ্য উপকরণ নির্বাচন করা
- পুষ্টি চাহিদার ম্যানুয়েল সংগ্রহ করা
- পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা
- রেশন তৈরির জন্য খাদ্য উপকরনের পরিমাণ নির্ধারণ করা
- রুটিন মোতাবেক রেশন তৈরি করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	-	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	নিক্তি	০-১০০ কেজি	১টি
২	ক্যালকুলেটর	সায়েন্টিফিক	১টি
৩	ব্যালচা	স্ট্যান্ডার্ড	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল(Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা	লেয়ারের জন্য	১টি
২	কাগজ, কলম, পেনসিল	প্রয়োজনীয়	১টি করে
৩	ভূট্টা	ভাঙ্গা	১ কেজি
৪	চাউলের কুঁড়া	মিহি	১ কেজি
৫	তিলের খৈল	ভাঙ্গা গুড়া	১ কেজি
৬	সয়াবিন মিল	ভাঙ্গা গুড়া	১ কেজি
৭	ঝিনুক চূর্ণ	ভাঙ্গা	১ কেজি
৮	খাদ্য লবন	সাধারণ	১ কেজি
৯	ফিশমিল	ফ্রেশ(সতেজ)	১ কেজি
১০	প্রোপ্যাক	ফ্রেশ(সতেজ)	১ কেজি
১১	ডিসিপি	ফ্রেশ(সতেজ)	১ কেজি
১২	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	লেয়ার প্রিমিক্স	১০০ গ্রাম
১৩	কক্সিডিওস্ট্যাট	ভালো উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের	১০০ গ্রাম
১৪	সিটিসি	ভালো উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের	১০০ গ্রাম
১৫	এনজাইম	ভালো উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের	১০০ গ্রাম
১৬	টক্সিন বাইন্ডার	ভালো উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের	১০০ গ্রাম
১৭	পলিথিন	ভালো মানের	১০ মিটার

কাজের ধারা:

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।

২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান করো।

৩. তালিকা মোতাবেক ভাল মানের খাদ্য উপাদানসমুহ সংগ্রহ করো।

৪. বয়স ও উৎপাদন অনুসারে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা মোতাবেক রেশন ফর্মুলেশন করো।

৫. খাদ্য উপাদানসমুহ তালিকা মোতাবেক মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ।

৬. কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমুহ একসাথে মিশ্রিত করো।

৭. কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমুহ অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের সহিত পর্যায়ক্রমে মেশাও।

৮. খাদ্য উপাদানসমুহ ভালভাবে মিশ্রিত করার পর ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ কর ও মুরগিকে খেতে দাও।

৯. নিম্নে লেয়ার মুরগির নমুনা খাদ্য তালিকা প্রদান করা হল:

লেয়ার মুরগির খাদ্য তালিকা:

উপাদানের নাম	লেয়ার স্টার্টার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার (৯-১৮ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৯ সপ্তাহের উর্দ্ধে)
গম/ ভূট্টা ভাঙ্গা (কেজি)	৫০	৪৭	৪৫
তিলের খৈল (কেজি)	১০	১২	১০
প্রোটিন কনসেনট্রেট ৬০%(কেজি)	৫	৫	৭
বোনমিল ও মিটমিল৫০%(কেজি)	৩	-	-
সয়াবিন মিল(কেজি)	১২	৬	৬
রাইস মিল(কেজি)	১৬	২৬.৫	২৬.৭
ঝিনুক চুর্ন(কেজি)		৪	৮
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট(গ্রাম)	৯২৫	-	-
লবণ(গ্রাম)	২৫০	৫০০	৫০০
জি এস ভিটামিন(গ্রাম)	৩০০	২৫০	-
এল ভিটামিন(গ্রাম)	-	-	৩০০
ডট(গ্রাম)	৫০	৫০	-
সালফিন/সালষ্টপ(গ্রাম)	২০০	২০০	২০০
সর্বাটক্স/মন্ডষ্টপ(গ্রাম)	১০০	২০০	১০০
মিথিয়নিন(গ্রাম)	৫০	৫০	৫০
লাইসিন(গ্রাম)	১০০	১০০	১০০
কলিন(গ্রাম)	২৫	৫০	৫০
মোট (কেজি)	১০০	১০০	১০০

সতর্কতাঃ

- প্রতিটি সতেজ খাদ্য উপাদান ব্যবহার করতে হবে।
- টক্সিন বাইন্ডারের মিশ্রণ সুষম ও যথোপযুক্ত মাত্রায় করতে হবে।
- মিশ্রিত খাদ্য ৭-১০ দিনের বেশি রাখা যাবে না।

আত্মপ্রতিফলন:

- তোমার বাড়ির নিকটবর্তী কোনো লেয়ার খামারে গিয়ে তাদের ম্যাশ খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ /তৈরিতে অংশ গ্রহন করে জবটি অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেয়ার খামারের মোট খরচের কত ভাগ খাদ্য খরচ?

২.খাদ্য উপকরণে পুষ্টিমাত্রার আধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপকরণকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

৩.মুরগির খাদ্যের কতভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য?

৪.দানা জাতীয় খাদ্যের উপকরণের নাম লেখ।

৫.আঁশ জাতীয় খাদ্যের উপকরণের নাম লেখ।

৬.প্রাণিজ আমিষ খাদ্যের নামগুলো কী কী?

৭.পিলেট খাদ্য কী?

৮.ক্রাম্বল খাদ্য কী?

৯.খাদ্য কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুষম খাদ্য সরবরাহের সুবিধাগুলো কী কী?

২. রেশনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখ করো।

৩. লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির মিশ্রণ প্রক্রিয়া উল্লেখ করো।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১.লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

২.ভালো খাদ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কী কী শর্ত বিবেচনা করা হয়?

৩.লেয়ারের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত সুষম খাদ্য তৈরি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ আলোচনা করো।

৪.লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির কৌশল বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

লেয়ার মুরগির রোগ-ব্যাধি

Layer Chicken Diseases

যেকোনো জীবের মতো পোল্ট্রিও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যেহেতু পোল্ট্রি তার রোগ সম্পর্কে বলতে পারে না। তাই পোল্ট্রির সফল উৎপাদন নিশ্চিত করতে রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। আর রোগ হয়ে গেলে এ চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল ও দুরুহ। রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করাই উত্তম। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অধিকতর শ্রেয়'। লাভজনক পোল্ট্রি উৎপাদন পেতে হলে দক্ষ পোল্ট্রি টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে প্রতিপালন করাই উত্তম। এতে লাভবান হবে ব্যক্তি তথা জাতি, উন্নত হবে অর্থনৈতিক অবস্থা। পোল্ট্রি খামার দক্ষ পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক ইকুইপমেন্ট (পিপিই)নির্বাচন ও সংগ্রহ, লক্ষণ দেখে রোগ সংক্রমণ নির্ণয়, রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মুরগির খামারের জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মুরগির বিভিন্ন রোগের লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারব
- লক্ষণ দেখে রোগ সংক্রমণ নির্ণয় করতে পারব
- রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব
- মুরগির খামারের জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব

৩.১ লেয়ার মুরগির রোগ-ব্যাধি (Layer Chicken Diseases)

জীবদেহ রোগ-ব্যাধির কারখানা এবং জীবমাত্রই রোগের কবলে পড়ে। অন্যান্য প্রাণিদের মত মুরগির রোগ হয়। মুরগীর মৃত্যুর হার খুব বেশি। একজন মুরগি পালনকারী কাছে রোগ একটা বিরাট সমস্যা। মৃত্যুর হার দেখে যেকোনো পালনকারী নিরুৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক। তবে সতর্ক দৃষ্টি ও ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমানো যায়। মাত্র কয়েকটি রোগ ছাড়া অনেক রোগকে ভাল করা যায় না। তাই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা দরকার। রোগাক্রান্ত মুরগিকে সরিয়ে ফেলাই ভাল। কঠিন রোগ-ভোগের পর মুরগী ভাল হয়ে গেলেও আগের বা স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কোনো দিনই ফিরে পায় না এবং ডিমপাড়ার হারও উল্লেখ ভাবে কমে যায়। এছাড়া এদের মাধ্যমে ঝাঁকের অন্যান্য মুরগির মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৩.১.১ রোগ সম্পর্কে ধারণা ও প্রকারভেদ (Disease Concepts and Types):

রোগ: পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার পরও যদি শরীরের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে তাকে রোগ বলে।

লেয়ার মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা যায়:

- সংক্রামক রোগ বা জীবাণুঘটিত রোগ (Contagious Disease) ।
- পরজীবী ঘটিত রোগ (Parasitic Disease)।
- অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Disease)।

১. সংক্রামক রোগ:

যেসব রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় ও অসুস্থ পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। এদেরকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়, যথা-

সংক্রামক রোগ

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া	মাইকোপ্লাজমা	ছত্রাক	প্রটোজোয়া	অন্যান্য
রাণীক্ষেত গামবোরা এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা	সালমোনেলোসিস কলিবেসিলোসিস (ইনফেকশাস করাইজা) নেক্রেটিক এন্টারাইটিস ওফ্যালাইটিস	মাইকোপ্লাজমোসিস	ব্রুডার নিউমোনিয়া আফলাটক্সিকোসিস	ককসিডিওসিস	অ্যাসাইটিস

টেবিল: ৩.০১

পরজীবীজনিত রোগঃ

পরজীবী এক ধরনের জীব যা অন্য জীব দেহে বসবাস করে জীবন ধারণ করে । যে জীবের দেহের উপর এরা জীবন ধারণ করে তাদেরকে হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে । এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী অন্ত:পরজীবী বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাহিরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতি সাধন করে। এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বা বহিঃপরজীবী বলে। উভয় পরজীবী আক্রমনের ফলে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এরা পাখির দেহে বসবাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী পাখির দেহে বসবাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

পরজীবী দুই প্রকারঃ

১. অন্তঃপরজীবীঃ কৃমি

২.বহিঃপরজীবীঃ উকুন, আঠালি ও মাইটস

অপুষ্টি জনিত রোগঃ

গৃহপালিত পাখি পালনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল পাখিকে সুষম খাদ্য প্রদান করা। পাখির মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং দৈনিক বৃদ্ধি সাধনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে যেকোনো খাদ্য উপকরণের অভাব হলে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, এমনকি পাখির মৃত্যুও হতে পারে।

অপুষ্টি জনিত রোগঃ জেরোপথ্যালামিয়া, প্যারালাইসিস, পেরোসিস, ক্যানাবলিজম, রিকেট ইত্যাদি।

৩.১.২ লেয়ার মুরগির জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি (Names, causes, symptoms, treatment and prevention of various layer diseases):

৩.১.২.১ ভাইরাসজনিত রোগসমূহ (Virul diseases)

(ক) রাণীক্ষেত রোগ

Ranikhet/ New Castle diseases

রাণীক্ষেত মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশের মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্বক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি

মারাত্মক আক্রান্ত হয়। সাধারনত শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন- শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শনাক্ত করা হয়। তাই তাকে নিউক্যাসল ডিজিজ বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে এ রোগকে রাণীক্ষেত রোগ বলা হয় ।

রোগের কারণঃ প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারণ।

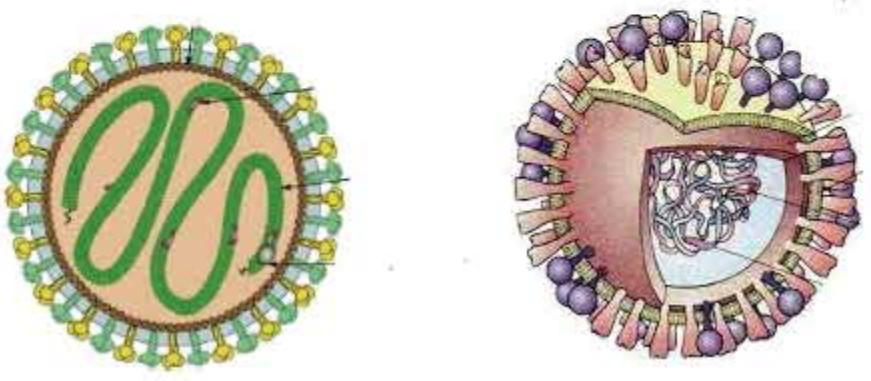

চিত্রঃ ৩.১ প্যারামিক্সো ভাইরাস

রোগ সংক্রমণ -

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

- বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, হাঁচি-কাশি থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- মৃত মুরগি বা পাখি যেখানে সেখানে ফেললে।
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণঃ রাণীক্ষেত রোগ প্রধানত তিন প্রকৃতির । যথা-

ক.ভেলোজেনিক প্রকৃতির লক্ষণ

খ.মেসোজেনিক প্রকৃতির লক্ষণ।

গ.লেন্টোজেনিক প্রকৃতির লক্ষণ ।

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতির লক্ষণঃ এ প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্বক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমনের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলো প্রকাশ পায়। যেমন-

* প্রথম দিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
* শরীরে কাঁপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে ।
* সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দূর্বল হয়ে পড়ে।
* মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাকমুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
* শরীর শুকিয়ে যায়।
* মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখ মুখ ফুলে যায়।
* ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতির লক্ষণঃ

মেসোজেনিক প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগ লক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়ঃ

* ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
* ডিম উৎপাদন কমে যায়।
* পাখির কাশি হয় ও মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
* হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে ।
* জীবাণু আক্রমনের দুই সপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘুরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।
* মাথা একপাশে বেঁকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দুপায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণঃ

* এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-
* শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।
* সামান্য কাশি থাকে।
* কিছুটা ক্ষুধামন্দা ভাব থাকে।
* ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

চিত্রঃ ৩.২ রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ

রোগ নির্ণয়ঃ

ময়না তদন্তে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখেঃ

* শ্বাসনালীতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চয়ন।
* স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে রক্তাক্ত হয় ।
* প্লীহা বড় হয়ে যায়।
* খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে, রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত দেখা দেয়।
* অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল।

চিত্রঃ ৩.৩ রাণীক্ষেত রোগের ময়না তদন্ত লক্ষণ

চিকিৎসাঃ

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিতে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ দু'ধরনের টিকা ব্যবহার করা হয়। যথা- বি.সি.আর.ডি.ভি. এবং আর. ডি. ভি.।

বি.সি.আর.ডি.ভি.: এ টিকাবীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি. লি. মূল টিকাবীজ থাকে। প্রতিটি শিশির টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিশ্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর ৪ দিন ও ১৯ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোটা করে ড্রপারের সাহায্য নিতে হবে।

২০২৩

আর. ডি. ভি.: এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিমশুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ টিকা দু'মাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী। প্রথমে ভায়ালের টিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

টিকা ছাড়া খামার থেকে রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা-

ক) রাণীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।

খ) খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন-আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ(বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর. ডি. ভি. ব্যবহার ও মাত্রা লেখ)		
টিকার নাম	ব্যবহারের বয়স	মাত্রা
বি.সি.আর.ডি.ভি.		
আর. ডি. ভি		

(খ) গামবোরো রোগ (Gumboro Disease)

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্বক সংক্রমণ রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগের পাখির রোগ প্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সাল ফ্যাব্রিসিয়াস আক্রান্ত হয় বলে প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যেকোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রোগকে বার্ড এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও বলা হয়। এই রোগটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো জেলায় শনাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ । এ রোগে সাধারণত ২-৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যুহার খুব কম (৫-১৫%)। তবে কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০% ও মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ:

বিরনাভাইরিডি পরিবারের অন্তর্গত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দুটো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন- ক্লাসিক্যাল ও ভেরিয়েন্ট স্ট্রেইন।

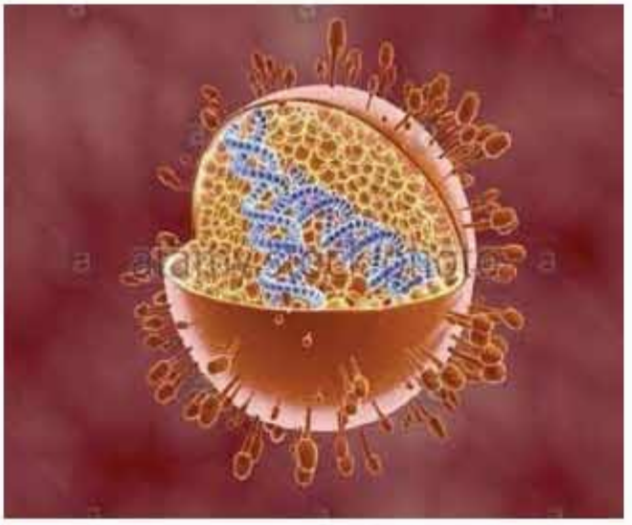

চিত্রঃ ৩.৪ বিরনা ভাইরাস

সংক্রমণঃ

* একই ঘরে রাখা অসুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে।
* বাতাসের মাধ্যমে।
* কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি মাধ্যমে।
* খাদ্য, লিটার, পোকামাকড়ের মাধ্যমে।
* পরিচর্যাকারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে।

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়ঃ

১) ক্ষুধামন্দা

২) পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।

৩) শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মালদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।

৪) প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।

৫) পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।

৬) পাখি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে যায়।

৭) শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।

৮) তীব্র রোগে পাখির শরীরে কাঁপুনি হয় ও অবশেষে মারা যায়।

৯) বেঁচে যাওয়া পাখির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

১০) বাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে।

১১) ক্রিম সবুজ রঙের ডায়রিয়া হয়।

চিত্র: ৩.৫ গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ নির্ণয়:

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়:

* রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
* মৃত বাচ্চার ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে-
  - থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা পাওয়া যায়।
  - পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখা দেয়।

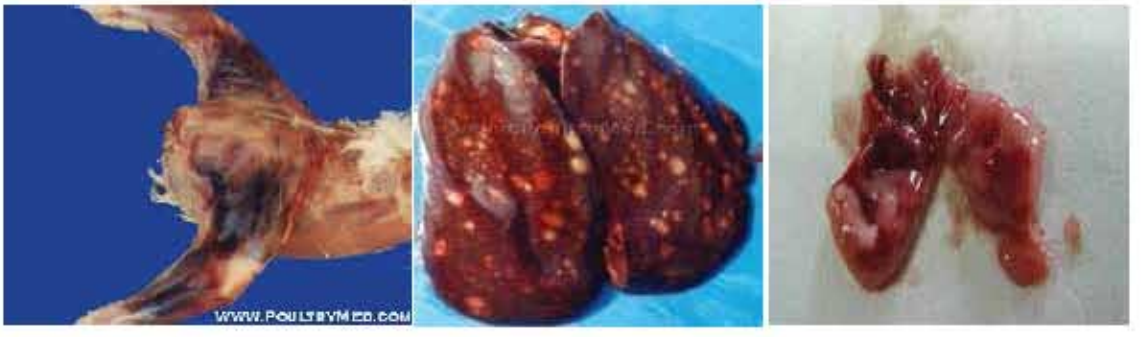

চিত্র: ৩.৬ গামবোরো রোগের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই । তবে আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩-৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি +২৫০ গ্রাম আখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়। এরা পায়ে শক্তি পায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

রোগ প্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় সাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক, যেমন ফরমালিন (ফরমালিনঃ পানি = ১ঃ৯), আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। বাংলাদেশে গামবোরোর বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয় যেমনঃ

* নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮
* ভি১ বার্সা জি
* বার ৭০৬
* গামবোরাল সিটি ইত্যাদি।

এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে/মুরগিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১০-১৪ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪-২৮ দিন বয়সে বুষ্টার ডোজ হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(গ) মারেক্স রোগ (Murex Disease)

মারেক্স রোগ পাখির স্নায়ুতন্ত্রের টিউমার সৃষ্টিকারী মারাত্বক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এটি লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ রোগ, যা পাখির ক্যান্সার। এ রোগে পাখির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, যৌন গ্রন্থি, চোখের আইরিস, পেশি ও ত্বক আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৬-১০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম হাঙ্গেরিতে মারেক নামে এক ব্যক্তি এ রোগটি আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে এ রোগের এরুপ নামকরণ করা হয়। অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে একে ফাউল প্যারালাইসিসও বলে।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি পরিবারের অন্তর্গত হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

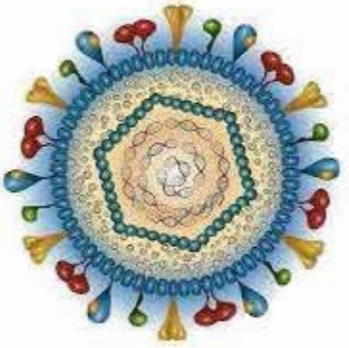

চিত্র: ৩.৭ হারপেস ভাইরাস

রোগ সংক্রমণ

- বাতাসের সাহায্যে জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে।
- খাদ্যের ব্যাগ বা বস্তা, যন্ত্রপাতি, জামা-জুতা ইত্যাদির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল ইত্যাদির মাধ্যমে।
- কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে, ডার্কলিং বিটলের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর এ রোগের লক্ষণ নির্ভর করে । সাধারণভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়:

- প্রান্তীয় স্নায়ু আক্রান্তের ফলে এক পা, এক ডানা বা দুই পা, দুই ডানা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।
- ঘাড়ের মাংসপেশি আক্রান্ত হলে মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।
- আইরিস বা চোখের উপরের পাতা আক্রান্ত হলে পাখিতে অন্ধত্ব দেখা দেয়।

চিত্র: ৩.৮ মারেক্স রোগে আক্রান্ত মুরগির অবশতা ও হা করে নিঃশ্বাস নেয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে-

- ক্ষুধামন্দা দেখা যায়।
- ফ্যাকাশে দেখায়।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখি খোড়ায়, পা ও ডানা ইত্যাদি অবশ হয়ে যায়।
- হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- অনাহার ও পানি শূন্যতার কারণে পাখি মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

ময়না তদন্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়:

- বার্সা ও থাইমাস ছোট হয়ে যাবে।
- প্রান্তীয় স্নায়ু যেমন- সায়াটিক স্নায়ু মোটা হবে।
- যেকোনো অভ্যন্তরীন অঙ্গে এবং ফলিকুল বা গোড়ায় টিউমার হবে।
- চোখের আইরিসের বর্ণের বিকৃতি ঘটবে

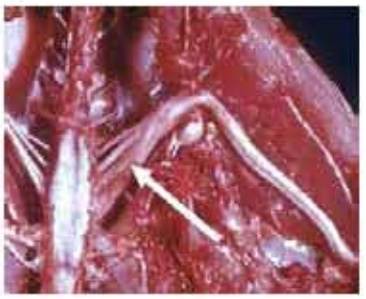

চিত্র: ৩.৯ সায়াটিক স্নায়ু মোটা ।

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে মাধ্যমিক সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ

- স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থায় খামার পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন বয়সের মুরগি বা কোয়েল আলাদা আলাদা পালন করা।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- সুস্থ মুরগির বাচ্চার টিকা প্রদান করা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগ করা সর্বোত্তম পন্থা। যেকোনো ধরণের ক্যানসারের বিরুদ্ধে এটি প্রথম উদ্ভাবিত টিকা। বাংলাদেশে মারেক'স রোগের টিকা প্রস্তুত হয় না। তবে, বাজারে আমদানি করা টিকা কিনতে পাওয়া যায়। মারেক'স রোগের বিভিন্ন ধরণের টিকা রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে এইচ.টি.ভি.-১২৬ অর্থাৎ মারেক্সিন সি এ ভালো কাজ করে । এ টিকা একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিতে ০.২ মি.লি. মাত্রায় ঘাড়ের ত্বকের নিচে প্রয়োগ করা হয়।

(ঘ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza)

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ:

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস এরোগের কারণ। মানুষে ছড়ালে একে বার্ড ফ্লু বলে। মানুষে সংক্রমণের কারণে বার্ড ফ্লু বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত রোগ।

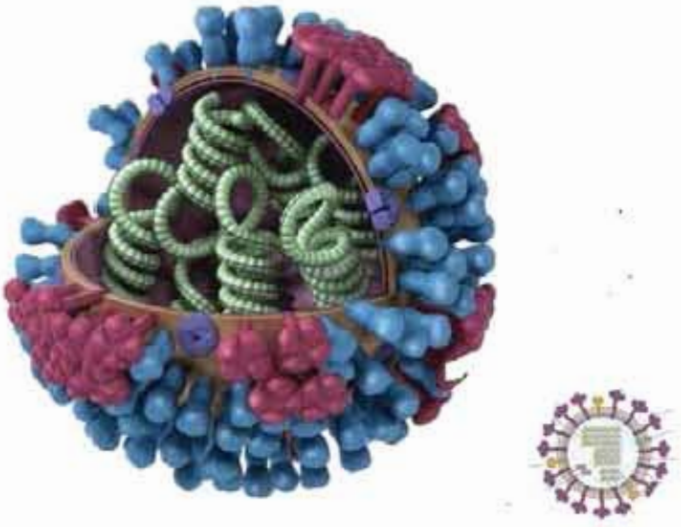

চিত্র: ৩.১০ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

রোগের বিস্তার:

- রোগাক্রান্ত মুরগির প্রত্যেক বা পরোক্ষ সংস্পর্শ, মুরগির মল, লালা ইত্যাদি ব্যবহৃত খাদ্য, পানি, যন্ত্রপাতি, পাত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- এছাড়া আক্রান্ত খামারের যানবাহন, ব্যক্তি, দর্শনার্থী ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- মুরগির খাবার চাহিদা কমে যায়।
- চোখ, মাথা ও ঝুঁটি ফুলে যায়
- চোখে দিয়ে পানি পড়ে।
- শরীরের পালকবিহীন অংশে রক্ত জমে কালো হয়ে যায়।
- মুরগি দুর্বল হয়ে প্যারাইসিস হয়ে যায়।

- আক্রান্ত মুরগির শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ঘড় ঘড় শব্দ করে ।
- ঝুঁটি বেগুনি রং ধারণ করে ।
- সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা দেখা যায়।
- আক্রান্তের হার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

চিত্রঃ ৩.১১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণঃ

শরীরের বিভিন্ন অংশে ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। চামড়ার নিচে, শ্বাসনালী, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ঘা দেখা যায়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাবে পাঠাতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়ঃ

জৈব নিরাপত্তা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া কোনো খামারে এ রোগ দেখা দিলে সম্মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্ত মুরগিকে ধ্বংস করতে হবে। কোনো ভাবেই আক্রান্ত মুরগি খামার থেকে বের করা যাবে না।

(ঙ) ফাউল পক্স (Fowl Pox)

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের সব প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পাখির বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। অসস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে । তখন মৃত্যু হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পাখির বসন্ত রোগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও, যেমন- পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখা যায়। এ রোগের পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীন অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল সৃষ্টি হয় যা বসন্তের গুটি নামে পরিচিত।

রোগের কারণ:

পক্সভিরিডি পরিবারের ফাউল পক্স ভাইরাস নামক ভাইরাস বসন্ত রোগের কারণ।

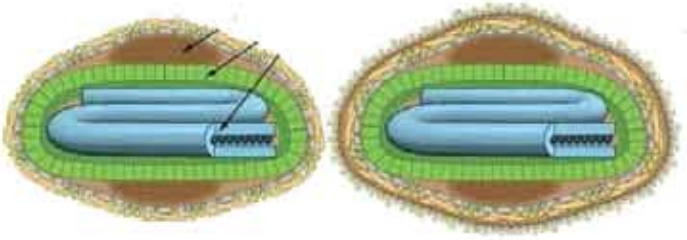

চিত্র: ৩.১২ ফাউল পক্স ভাইরাস

সংক্রমণ: নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। যথা-

* রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে সুস্থ পাখিতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
* ত্বকের ক্ষত বা কাটা ছেঁড়ার মাধ্যমে।
* কিউলেক্স ও অ্যাডিস মশার মাধ্যমে।
* তাছাড়া কখনো কখনো রক্তশোষক মাছি, ফ্লি ও আঠালির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

বসন্ত রোগ প্রধানত দু'প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা-

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম প্রকৃতি: এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখমন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্তও বলা হয়।

চিত্র: ৩.১৩ ত্বকীয় বা হেড ফর্ম ডিপথেরিটিক প্রকৃতির লক্ষণ

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি: এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে । ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত নামে পরিচিত।

এ দু'প্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- মৃদু প্রকৃতির বসন্তে:

*পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোসকা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

* মুরগির ঝুটি, গলকম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।

* চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে:

* দেহের মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ও অন্ত্রের দেয়ালেও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
* শ্বাসনালী আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
* এতে ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
* এতে পাখির মৃত্যু হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়-

* আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।

* পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজপূর্ণ হয়, পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে । এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।

চিকিৎসা:

এ রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষত জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন- মারকিউরিক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পাখিদের টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। বসন্ত প্রতিরোধের জন্য এ দেশে দু'ধরনের টিকা প্রয়োগ করা হয়। যথা-

১। পিজিয়ন বক্স টিকা: এটি ৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে দু'সপ্তাহের বয়সের বাচ্চার ডানার পালকবিহীন অংশে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল বা সুঁচ দিয়ে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করা হয়।

২। ফাউল পক্স টিকা: এ টিকা হিমশুষ্ক অবস্থায় ০.৩ মি.লি. মাত্রায় কাচের অ্যাম্পুলে থাকে। এ পরিমাণ টিকা পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে দু'শ পাখিতে প্রয়োগ করা যায়। পিজিয়ন পক্স টিকার মতো এ টিকাও এ পদ্ধতিতে বাইফর্কেড স্ট্রিকিং নিডল দিয়ে পাখির ডানার পালকবিহীন স্থানে ২-৩ বার বিদ্ধ করতে হবে । প্রতিবারই পরিশ্রুত পানিতে গুলানো টিকার নিডল চুবিয়ে নিতে হবে। এ টিকা প্রয়োগের ৫,৭ বা ১০ তম দিনে টিকাবিদ্ধ স্থানে বসন্তের গুটি দেখা গেলে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। এ টিকা একমাসের বেশি বয়সের পাখিকে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বিদেশে প্রস্তুত বসন্ত রোগের টিকা পাওয়া যায়। যেমন- ওভোডিপথেরিন ফোর্ট (ইন্টারভেট) যা কোম্পানির নির্দেশমতো মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। বছরে একবার পাখিতে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়।

(চ) ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস (Infectious Bronchitis)

করোনা ভাইরাস এ রোগের কারণ। সাধারণত বাচ্চা মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাদা জাতের মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মৃত্যুহার ১০-১৫ % পর্যন্ত হতে পারে। বাচ্চা মৃত্যুর হার ৯০% হতে পারে।

রোগের বিস্তার: বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত মুরগি ও তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ:

- খামারে এ রোগের আক্রমণ হঠাৎ করে ঘটে ও প্রায় সকল মুরগি এক সাথে আক্রান্ত হয়।
- শ্বাসকষ্ট হয় ও মুখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।
- সকালে ও রাতে লক্ষণগুলো প্রকট হয়।
- অনেক সময় পানির মত পাতলা ডাইরিয়া হয়।
- চোখের ঝিল্লি লাল হয়।
- ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায় ও ডিমের খোসা পাতলা ও অমসৃণ থাকে।

চিত্র: ৩.১৪ ডিমের খোসা পাতলা অমসৃণ ও শ্বাসকষ্ট

পোস্টমর্টেম লক্ষণ: শ্বাসনালীতে প্রচুর শ্লেষ্মা ও মৃদু রক্তরক্ষরণ দেখা দিবে। অস্বাভাবিক ডিমের কুসুম দেখা যাবে।

প্রতিরোধ:

নিয়মমতো টিকা প্রদান করতে হবে এবং জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

চিকিৎসা:

কার্যকরী চিকিৎসা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ এড়াতে অ্যান্টিবায়োটিক (মাইক্রোনিড, ডক্সাসিল ভেট) নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

(ছ) ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়াইটিস (Infectious Laryngo tracheitis):

ভাইরাস ঘটিত এই রোগটির অপর নাম এভিয়ান ডিপথেরিয়া। ৮-১৬ সপ্তাহ বয়সে এবং ডিমপাড়া অবস্থায় যেকোনো সময় এ রোগের সংক্রমণ হয়। মৃত্যুহার ১০-১৬%।

রোগের বিস্তার:

- আক্রান্ত মুরগির শ্বাস-প্রশ্বাস বা দেহ নিঃসৃত পদার্থের সংস্পর্শের মাধ্যমে খামারে ব্যবহৃত জিনিস পত্রের মাধ্যমে ।
- এ রোগে আক্রান্ত মুরগি সুস্থ হওয়ার পর তার থেকে রোগ ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- শ্বাসনালীতে রক্তক্ষরণ ও শ্লেষ্মা জমার কারণে শ্বাসকষ্ট হয়।
- নাক ও চোখ দিয়ে পানি গড়াতে থাকে।
- আক্রান্ত মুরগি মুখ খোলা রাখে এবং অনেক সময় দু'পায়ের উপর ভর করে ঘাড় লম্বা করে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে ।
- ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে।
- কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই আক্রান্ত মুরগির মৃত্যু হতে পারে।

চিত্র:৩.১৫ ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়াইটিস রোগে আক্রান্ত মুরগি ঘাড় লম্বা ও মুখ হা করে শ্বাস নিচ্ছে

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

মুরগির শ্বাসনালীতে সাদা আঠালো তরল পদার্থ পাওয়া যায়। ফুসফুস রক্তের মত লাল হবে।

চিকিৎসা: কার্যকরী চিকিৎসা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ এড়াতে অ্যান্টিবায়োটিক (মাইক্রোনিড, ডক্সাসিল ভেট) নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

(জ) এগ ড্রপ সিনড্রম (Egg Drop Syndrom):

এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। শুধুমাত্র ডিম পাড়া মুরগিতে এ রোগ ক্ষতিসাধন করে । ডিম পাড়া মুরগি ডিম পাড়ার শুরুতে বা ডিম পাড়ার যে কোনো সময় ডিম্বাশয় আক্রান্ত হয়। ডিম পাড়ার সময় হঠাৎ করে ডিম উৎপাদন কমে যায় বলে এ রোগকে এগড্রপ সিনড্রম বলে।

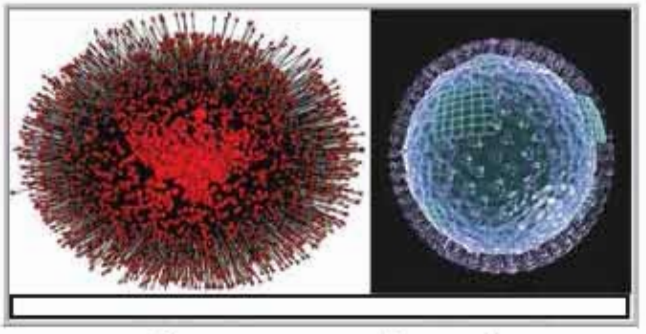

চিত্র: ৩.১৬: এগ ড্রপ সিনড্রম ভাইরাস

রোগের বিস্তার:

আক্রান্ত মুরগির ডিম পাড়া শুরু করলে ভাইরাস নিঃসৃত হয় এবং ফ্লোরের অন্য মুরগিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ:

- সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময় ডিম পাড়া হঠাৎ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- ডিমের খোসার গুণগতমান খারাপ হয়।
- বাদামি ডিমের রং বিবর্ণ হয়।

- আক্রান্ত মুরগির রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়।
- ডায়রিয়া দেখা যেতে পারে।
- পাতলা খোসার, নরম খোসার বা খোসাবিহীন ডিম পাড়তে দেখা যায়।

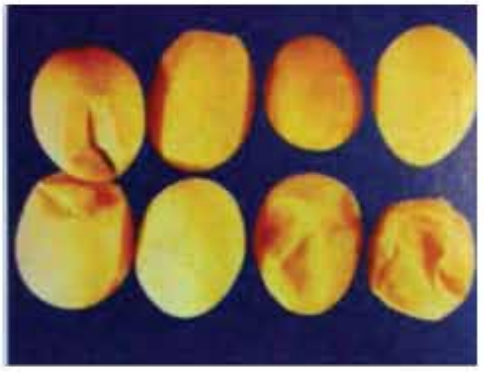

চিত্র: ৩.১৭ এগ ড্রপ সিনড্রম রোগে আক্রান্ত মুরগির অগঠিত ও নরম খোসা বিশিষ্ট ডিম

প্রতিরোধ:

ডিমপাড়া শুরুর পূর্বে টিকা প্রদান করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ডিম সংগ্রহ ও বহনের ট্রে নিয়মিত জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা: কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই।

তাত্ত্বিক কাজঃ			
রোগের নাম	সাধারন লক্ষণ	ময়নাতদন্তের চিহ্ন	চিকিৎসা
রাণীক্ষেত			
গামবোরো			
কলেরা			
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা			

৩.১.২.২ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগসমূহ:

(ক) সালমোনেলোসিস (Salmonellosis)

সালমোনেলা গোত্রের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগগুলোকে সালমোনেলোসিস বলে। যে কোনো বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে ১ দিন হতে ২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এ রোগে বেশি

২০২৩

আক্রান্ত হয়। প্রধানত ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাতে এ রোগ বিস্তার লাভ করে । মৃত্যুহার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। সালমোনেলা পুলোরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে পুলোরাম রোগ বলে। সালমোনেলা গ্যালিনেরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে ফাউল টাইফয়েড রোগ বলে।

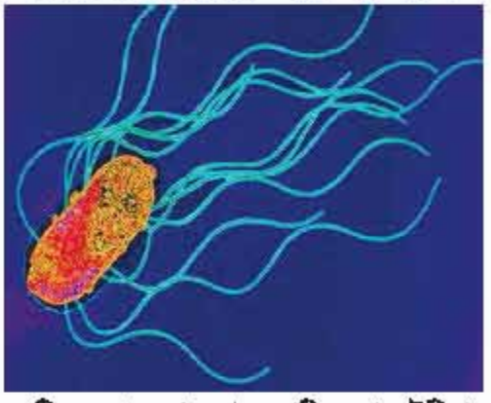

চিত্রঃ-৩.১৮ সালমোনেলোসিস ব্যাকটেরিয়া

রোগের লক্ষণঃ

- মুরগির বাচ্চার পাছা ভিজা থাকবে ও হলদে বর্ণের পাতলা পায়খানা করবে।
- বাচ্চা চি চি শব্দ করবে এবং মাথা একদিকে করে তাপের কাছে জমা হবে।
- পাখা এলোমেলো হবে, চুপচাপ বসে ঝিমাবে।
- খাবারের প্রতি অনীহা থাকবে।
- তীব্র পানি শুন্যতার কারণে মুরগি মারা যায়।
- মৃত বাচ্চার উদর গহ্বরে ডিমের কুসুম লেগে থাকে।
- বাড়ন্ত মুরগিতে খোঁড়া পা ও হাড়ের জয়েন্ট ফুলে উঠার কারণে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- মুরগির হক জয়েন্ট ফুলে যায় ও খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটে।
- ঝুঁটি সাদা হয়ে যায়।

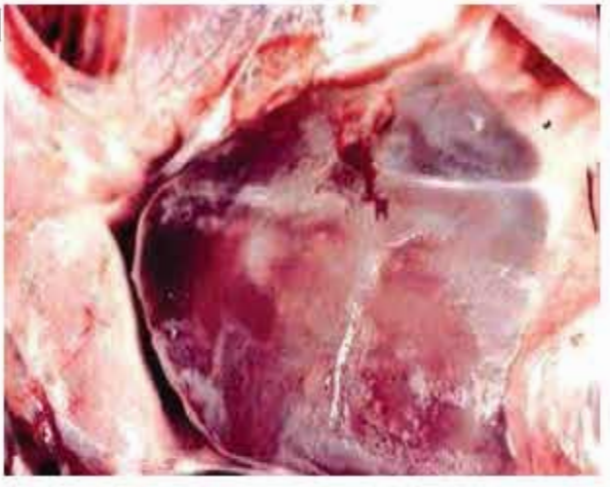

চিত্রঃ ৩.১৯ সালমোনেলোসিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

বাচ্চাতে কুসুম অশোষিত অবস্থায় থেকে যায়। বিকৃত ও বিবর্ণ ডিম দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ:

- বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখতে হবে।
- বাহক মুরগি নিধন করতে হবে সালমোনেলা মুক্ত বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করতে হবে।
- নিয়মিত আইওসান মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর, খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা:

ইএসবি ৩০% পাউডার বা কসুমিক্স প্লাস ১ লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন স্যালাইন খাওয়াতে হবে। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক সালমোনেলা দূর করা সম্ভব নয়। সালমোনেলা কিলার (যেমন: বায়োট্রনিক এস ই) নিয়মিত ব্যবহারে রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(খ) সংক্রামক সর্দি (Infectious Coryza)

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজা মুরগির শ্বাসতন্ত্রের এর একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। সব বয়সের মুরগি এতে আক্রান্ত হলেও সাধারণত বয়স্ক মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়। মুরগির মুখমন্ডল ফুলে যাওয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগকে ঠান্ডা লাগা, আনকমপ্লিকেটেড করাইজাও বলে। এ রোগ ১০০% পাখি আক্রান্ত হতে পারে, তবে মৃত্যু হার আনুপাতিক হারে অনেক কম।

রোগের কারণ:

হিমোফিলাস গ্যালিনেরাম নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র দন্ডাকৃতির বা কক্কোব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়ার এ. বি. ও সি. টাইপ এ রোগ সৃষ্টি করে ।

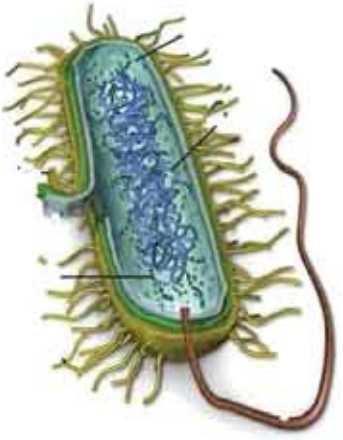

চিত্র: ৩.২০ হিমোফিলাস গ্যালিনেরাম ব্যাকটেরিয়া

সংক্রমণ পদ্ধতি:

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হয়। যথা-

- আক্রান্ত মুরগি সুস্থ মুরগির সংস্পর্শে আসলে।
- কলুষিত শ্লেষ্মার দ্বারা দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- পাশাপাশি অবস্থিত মুরগির ঘরে বাতাসের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা:

- মুখমন্ডল ও মাথা ফুলে যায়।
- নাকমুখ দিয়ে পানি ঝরে।
- অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ হয়ে চোখ ফুলে যায় ও আঠাযুক্ত হয়।
- গলার ফুল বিবর্ণ হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে।
- খাদ্য ও পানি পান করা বন্ধ হয়ে যায়।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- কাঁশি হয় ও গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয়।
- শ্বাসকষ্ট হয়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।
- লক্ষণ প্রকাশের ২-৩ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত পাখি মারা যেতে পারে।

চিত্র: ৩.২১ করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগির মুখমন্ডল, মাথা ও চোখ ফুলা।

রোগ নির্ণয়:

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- নাকের ঝিল্লিপর্দা ও সাইনাসের শ্লৈষ্মিক প্রদাহ থাকে।
- অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ, মুখমন্ডল ও গলার ফোলা থাকে।

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজার চিকিৎসা:

- খাদ্যের সঙ্গে সালফাডাইমিথোক্সিন ও সালফাথায়জল ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে পুনঃচিকিৎসা দিতে হবে।
- তাড়াতাড়ি সুফল পেতে হলে ভেটেরিনারি সার্জনের নির্দেশিত মাত্রায় স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন ও খাদ্যের সঙ্গে সালফোনেমাইড ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ:

নিম্নলিখিতভাবে সংক্রামক করাইজা রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা-

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
- যেহেতু এ রোগ থেকে সেরে ওঠা পাখি রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে তাই পালনের জন্য বয়স্ক মুরগি না কিনে একদিন বয়সের বাচ্চা কেনা উচিত।
- টিকার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য ইনঅ্যাকটিভেটেড ইনফেকশাস করাইজা টিকা ব্যবহার করা। নেদারল্যান্ডের ইন্টারভেট কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত এ টিকার নাম নভিভ্যাক করাইজা। প্রতিটি পাখির পেশি বা ত্বকের নিচে ০.৫ মি.লি. মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা হয়। প্রথমবার ৬ সপ্তাহ বয়সে ও দ্বিতীয়বার ৮ সপ্তাহ বয়সে টিকা প্রদান করলে ৮ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশে করাইজার কোনো টিকা প্রস্তুত হয় না।

তাত্ত্বিক কাজঃ সংক্রামক করাইজা রোগের টিকা প্রদান		
টিকার নাম	বয়স	ব্যবহারের মাত্রা ও স্থান

(গ) নেক্রোটিক এন্টারাইটিস (Necrotic enteritis)

এন্টারাইটিস কথাটির অর্থ হলো অন্ত্রের প্রদাহ। নানা কারণে অন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। অন্ত্রে উত্তেজক পদার্থের উপস্থিতি বা বিভিন্ন জীবাণু ও পরজীবীর কারণে এন্টারাইটিস হয়। সাধারণত ২-৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে ১(এক) সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাও আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ৫-৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

নেক্রোটিক এন্টারাইটিস রোগের কারণ:

বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, (যেমন: সালমোনেরা, ই-কলাই ও ক্লোস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস) ও প্রোটোজোয়া(কক্কসিডিয়া) এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ:

- আক্রান্ত মোরগ-মুরগি ভীষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
- প্রচন্ড ডায়রিয়া দেখা দেয়, লক্ষণ প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়।
- অনেক সময় লাল রঙের গুড়ের মতো বিষ্ঠা হয় যা কক্সিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় হিসাবে ভুল হতে পারে।
- তাছাড়া অনেক সময় পানির মত পাতলা বিষ্ঠা হয় এবং বদ হজমকৃত খাদ্য বিষ্ঠা সাথে বেরিয়ে আসতে পারে।
- মোরগ-মুরগির ডানা ঝুলে পড়ে, দাঁড়াতে পারে না।
- পালক উস্কো-খুস্কো হয়ে যায়।
- ঠোঁট দিয়ে লালা পড়ে।
- বুকের মাংস কালো হয়ে যায়।

চিত্র: ৩.২২ নেক্রোটিক এন্টারাইটিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

কলিজা বড় হয়ে যায়, হলুদাভ রং এর এবং রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। অন্ত্রে রক্তক্ষরণ হয় এবং গ্যাস জমে বেলুনের মতো ফুলে উঠে। অনেক সময় ক্ষুদ্রান্ত্রে সাদা রঙের ঘা দেখা দেয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর মোটা হয়ে যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ:-

বায়োসিকিউরিটি মেনে চলতে হবে। সংক্রমিত ঘর ও সরঞ্জাম ১:২০০ বা ১:৫০০ কস্টিক সোডা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

- **ভাইরাস:** ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের মাধ্যমে ভাইরাসজনিত রোগ দমন করা হয়।
- **প্রোটোজোয়া:** কক্সিডিয়া নামক প্রটোজোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোল্ট্রি খাদ্যে কক্সিডিয়া বিরোধী ঔষধ ও ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়।
- **ব্যাকটেরিয়া:** এন্টারাইটিস সৃষ্টিকারী ২ ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে-

(ক) সালমোনেলা, ই. কলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া- খাদ্যে বিভিন্ন এসিডিফায়ার (সালমোনেলা কিলার), এন্টিবায়োটিক (সি.টি.সি./অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন/ফুরাজলিডন/টাইলোসিন ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

(খ) ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস*(Clostridium perfringens)* **:** নামক গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি নেক্রোটিক এন্টাররাইটিস রোগটি দমনের জন্য আমরা কার্যকর তেমন কিছু ব্যবহার করি না। নেক্রোটিক এন্টারাইটিস যেকোনো বয়সের মোরগ-মুরগির হতে পারে। মৃত্যুহার লেয়ার মুরগির তুলনায় ব্রয়লার মুরগির বেশি। রোগটির সংক্রমণ কোনোরূপ পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ না করেই ঘটতে পারে। পুরাতন লিটার পুনঃব্যবহার করলে রোগটি ছড়াতে পারে। পুরাতন লিটারের মধ্যে রোগটির স্পোর বা বীজ থাকার সম্ভাবনা বেশি।

চিকিৎসা:

যেকোনো অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন- টেট্রাসাইক্লিন বা রেনামাইসিন এর যেকোনো একটি ঔষধ বিধি মোতাবেক পানির সাথে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

(ঘ) কলিবেসিলোসিস (Colibacillosis)

ইসকারিসিয়া কলাই নামক এক প্রকার ব্যাটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে কলিবেসিলোসিস রোগ বলে। এই জীবাণুটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সব প্রাণির শরীরের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে যেমন- খাদ্য বা পানির ভিতর এই জীবাণু উপস্থিত থাকে। সময় সুযোগমত জীবাণুটি শরীরের ভেতর রোগ সৃষ্টি করে । শরীরের অন্য কোনো রোগের উপস্থিতিতে বা অন্য কোনো ধরনের কারণে শরীর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই এই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে । আবহাওয়াগত বা অন্য কোনো কারণে বাতাসের আর্দ্রতা বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়

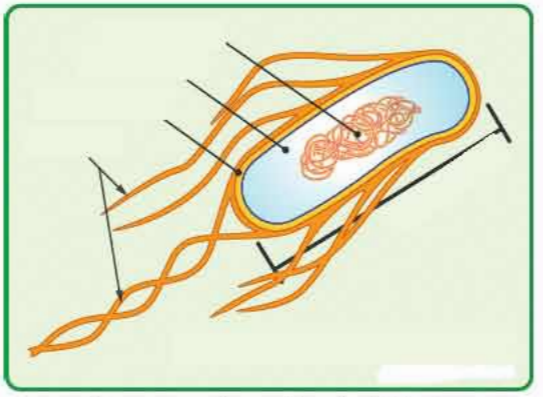

চিত্র: ৩.২৩ ই. কলাই ব্যাকটেরিয়াম

সংক্রমণের উপায়:

- ডিম পাড়া মুরগির প্রজনন নালিতে জীবাণু বিদ্যমান থাকলে তা ডিমকে আক্রান্ত করতে পারে বা ঐ ডিম হতে যে বাচ্চা ফুটে তাকে সংক্রমিত করতে পারে।
- আক্রান্ত মুরগির সংস্পর্শে আসলে বা হাঁচি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অন্য মুরগিতে ছড়াতে পারে।
- ইনকিউবেটরের আর্দ্রতা বেশি থাকলে এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে এই রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকলে সদ্য ফোটা বাচ্চার রোগ দেখা দিতে পারে।
- মোরগ-মুরগি স্থানান্তর করার সময় পরিবহন বা অন্য কোনো ধকল পীড়নের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- ঘরের মধ্যে এমোনিয়া গ্যাস জমে গেলে যে পীড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলেও মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

এ রোগের লক্ষণগুলো নির্ভর করে মুরগির কোনো অঙ্গে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করেছে তার উপর। যেমনঃ

১. অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis):

- পাতলা বিষ্ঠা হয়ে থাকে এবং পিছনের পালকে বিষ্টা লেগে থাকে।
- পালক উস্কো খুস্কো থাকে।

২. কলিসেপটিসেমিয়া (Colisepticaemia):

- হঠাৎ করে মোরগ-মুরগি অসুস্থ হয়ে পড়ে ও নিস্তেজ হয়ে যায়। নড়চড়ায় অনীহাভাব প্রকাশ পায়।
- মৃত্যু হার বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- শরীরের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে রক্তকরণ দেখা দেয়।

- ডিমের মাধ্যমে সংক্রমণ হলে ভ্রুণ মারা যায় বা বাচ্চা ফুটলেও রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত মৃত্যু হতে থাকে।
- যকৃতের মধ্যে সবুজ ক্ষত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো দেখা যায়।

৩. কলিগ্র্যানুলোমা (Coligranuloma):

- মুরগির যকৃত, অন্ত্র ইত্যাদির ঝিল্লীতে গুটিগুটি দানার মত দেখা যায়।

৪. এয়ার স্যাক ডিজিজ (Air Sac Disease):

- ৬-৭ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- শ্বাসনালী ও শ্বাস থলির মধ্যে এই ইনফেকশন হয় বলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- হৃৎপিন্ড, যকৃত ও চোখে প্রদাহ দেখা দেয়।

৫. প্যানঅপথ্যালমাইটিস ও সোলেন হেড ডিজিজ (Panopthalmitis & Swollen Head Disease):

- কলি সেপ্টিসোমিয়া রোগে আক্রান্ত মুরগির চোখের ভিতর ও তার চারিধারে দধির মত অথবা পুঁজ জাতীয় পদার্থ জমা হয় বলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ বন্ধ করে রাখে। কখনও কখনও চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এটাই প্যানঅপথ্যালমাইটিস নামে পরিচিত।
- আবার দেখা যায় ব্রয়লার মুরগির চোখের চারিধারে পানি ও পুঁজ জমে ফুলে যায়। ফলে মনে হয় মাথা ফুলে গেছে। এটাকেই "সোলেন হেড ডিজিজ" বলে। এ সমস্ত মুরগি বার বার মাথা নাড়ে ও ঘাড় বাঁকিয়ে রাখে।

৬. চর্ম প্রদাহ (Dermatitis):

- চামড়ার নিচে জলপূর্ণ স্ফীতি ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ পরিলক্ষিত হয়।
- চামড়ার ঘা দেখা যেতে পারে।

৭. সাইনোভাইটিস (Syovitis):

- রক্তের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে হাড়ের জয়েন্ট বা অস্থি সন্ধিতে ইনফেকশন করে ।
- সাধারণত বাচ্চা মুরগি আক্রান্ত হয়। ফলে অস্থি সন্ধি বা গীড়া ফুলে যায় ও মুরগি হাঁটতে পারে না।

৮. ওম্ফ্যালাইটিস (Omphalitis):

- নাভীর প্রদাহে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে।
- অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে বাচ্চারা জড়ো হতে থাকার প্রবণতা দেখা যায়।
- এই রোগে আক্রান্ত হলে বাচ্চার নাভীর ঘা শুকায় না এবং বাচ্চার মৃত্যু হয়।

প্রতিরোধের উপায়:

- জৈব নিরাপত্তা মেনে চলতে হবে।
- ডিম ফোটানোর জন্য সুস্থ, নিরোগ ও জীবাণু মুক্ত ডিম বেছে নিতে হবে।
- কোনো রূপ ধকল বা পীড়নে আক্রান্ত হওয়া মাত্র ভেট বেট পাউডার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসাঃ সিপ্রোফ্লক্স সলুশন ১ মিলি ১-২লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে । ডায়রিয়া হয় বিধায় খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হয়।

(ঙ) ওফ্যালাইটিস/ন্যাভাল ইল (Neval Ill)

ওফ্যালাইটিস একটি ইসকারিসিয়া কলাই জীবাণুঘটিত রোগ তবে সংক্রামক নয়। ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে এ রোগটি মোরগ মুরগিকে আক্রমণ করে । ঘর বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে, হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মধ্যে আর্দ্রতা বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, কোনো কারণে বাচ্চা অবস্থায় মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত থাকলে, বাচ্চা অবস্থায় জীবাণুর সংস্পর্শে আসলে ওফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা খুব বেশি বা কম হলে এবং পরিবহন জনিত পীড়নের কারণে মৃত্যু হার অধিক হয়।

রোগের লক্ষণ:

- মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত মুরগির বাচ্চা সাধারণত সুস্থ দেখায়।
- অসুস্থ বাচ্চার ঝিমুনি হয় ও মাথা ঝুলে পড়ে।
- আলো-তাপের উৎসের দিকে জড়ো হয়ে থাকে।
- নাভি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেটি লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। এ সময় সে স্থানে বাচ্চার ব্যাথা অনুভূত হয়।
- জন্ম হতে ১০-১৫ দিন বয়স পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু হার ১৫% পর্যন্ত হয়।
- বুকের চামড়ার নিচে ইডিমা (মাংস পেশিতে পচন ও পানি জমা) দেখা দিতে পারে ।

চিত্র: ৩.২৪ ওম্ফালাইটিস রোগের লক্ষণ (মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত)

প্রতিরোধ

হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মাধ্যমে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগের প্রতিরোধ ও বিস্তার রোধ করা সম্ভব। ইনকিউবেটরে পরিষ্কার ও ভালো ডিম বাছাই করতে বসাতে হবে।

চিকিৎসা:

টেট্রা-স্টেট পাউডার অথবা ডক্সাসিল-স্টেট পাউডার নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে।

(চ) ফাউল কলেরা (Fowl Cholera)

হাঁস-মুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা হাঁসমুরগির ও অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য পাখির একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রামক রোগ। উচ্চ হারে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব বয়সের পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁসমুরগির ঘর স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ব্যবস্থাপনা ঘাটতি থাকলে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। সঠিকভাবে রোগ সনাক্ত করে চিকিৎসা করতে না পারলে মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া এ রোগ একবার দেখা দিলে দমন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যদিও এ রোগকে ফাউল কলেরা বলে, কিন্তু অ্যাভিয়ান পাস্চুরেলোসিস, অ্যাভিয়ান হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। তবে হাঁসের ক্ষেত্রে রোগকে হাঁসের কলেরা বা ডাক কলেরা বলা হয়।

মুরগির কলেরা রোগের কারণ:

পাস্চুরেলা মালটুসিডা নামক একপ্রকার গ্রাম নেগেটিভ ক্ষুদ্র দণ্ডাকৃতির বাইপোলার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের একমাত্র কারণ।

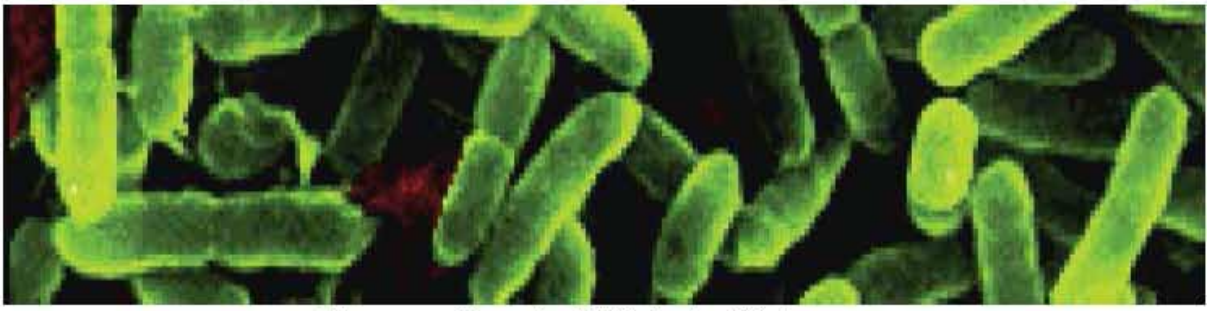

চিত্রঃ ৩.২৫ পাস্তুরেলা মালটুসিডা ব্যাকটেরিয়া

মুরগির কলেরা রোগের সংক্রমণঃ

মুরগির কলেরা রোগের রোগ নিম্নলিখিতভাবে সংক্রমিত হয় । যথা-

১. সংবেদনশীল মুরগির ঘরে কোনো বাহক মুরগি থাকলে বা প্রবেশ করলে।

২. বন্য পাখি বা অন্যান্য বাহক প্রাণির সংস্পর্শে সংবেদনশীল পাখি আসলে।

৩. একই ঘরের বা খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিম্নলিখিত ভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়। যথা-

ক. আক্রান্ত মুরগির নাকের সর্দির মাধ্যমে।

খ. এ রোগের মৃত মুরগিকে ঠোকর দিলে।

গ. কলুষিত পানির মাধ্যমে।

ঘ. মানুষের জামা জুতো ঘরের ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।

ঙ. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আক্রান্ত মোরগ থেকে সুস্থ মুরগিতে ।

মুরগি ও অন্যান্য পাখিতে সাধারনত দু'প্রকৃতিতে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমনঃ

১. তীব্র প্রকৃতির লক্ষণ।

২. দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ।

১. তীব্র প্রকৃতির লক্ষণঃ

ক. হঠাৎ ধপ করে পড়ে মারা যায়। রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে অর্থাৎ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়।

খ. সবুজ রংয়ের পাতলা বিষ্ঠা ত্যাগ করে । অনেক সময় বিষ্ঠা ফেনাযুক্ত হয়।

গ. নাক মুখ দিয়ে পানি পড়ে।

২. দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণঃ

ক. গলার ফুল ফুলে যায়। (বিশেষ করে মোরগের ক্ষেত্রে)।

খ. মাথার ঝুটি একেবারে কালো হয়ে যায়।

গ. সন্ধিপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিস হয় এবং পা খোড়া হয়ে যায়।

ঘ. ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়। দুই মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকে।

ঙ. অবশেষে আস্তে আস্তে মারা যায়।

রোগ নির্ণয়:

নিম্নলিখিত ভাবে হাঁস-মুরগির কলেরা রোগ নির্ণয় করা যায় যথা:

ক. রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।

খ. ময়নাতদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যথা:

১. অন্ত্রের রক্তক্ষরণ

২. যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ।

৩. হৃদপিন্ডের বাহিরের সাদা অংশে রক্তের ফোঁটা।

৪. মৃত মুরগির সমস্ত অঙ্গে রক্তক্ষরণ ও রক্তাধিক্য।

৫. গবেষণাগারে জীবাণু কালচার করে ।

চিত্র: ৩.২৬ মুরগির কলেরা রোগের লক্ষণ(যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ)।

চিকিৎসা:

কলেরা রোগের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইট গ্রুপের ঔষধ উল্লেখিত মাত্রায় প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১.ফ্লুমেকুইন ১০%পাউডার ১গ্রাম/২লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।

২. ফ্লুমেকুইন ২০%সলুশন ১মিমি/৪লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ:

১) কলেরা রোগ প্রতিরোধে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে

ক) এই ভ্যাকসিন ৭৫দিন বয়সে ১ সি সি করে রানের মাংসে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয় ।

খ) প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়ার ১৫ দিন পর পুনরায় ১ সি সি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।

গ) তারপর ৬ মাস পরপর ১ সি সি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয় ।

২. সব সময় খামারের আশেপাশে জীবাণুনাশকের ব্যবহার বাড়ানো।

৩. লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।

৪. এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার সময় জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

৫. খামারে জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

৩.১.২.৩ মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট রোগ

(ক) মাইকোপ্লাজমোসিস (Mycoplasmosis)

মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগসমূহকে মাইকোপ্লাজমোসিস বলে। সাধারণত মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম ও মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি নামক জীবাণু মুরগির মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। সকল বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যু হার সাধারণত কম তবে অন্য রোগে সৃষ্ট জটিলতার জন্য মৃত্যু হার ৩০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার:

- আক্রান্ত মুরগি ও ডিমের মাধ্যমে সুস্থ মুরগি বা বাচ্চাতে রোগটি হতে পারে।
- গৃহপালিত মুরগি, বন্যপ্রাণি , আটালী, ইঁদুর প্রভৃতির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- রোগটির সংস্পর্শে আসা মানুষের হাত পা ও আক্রান্ত ফার্মের আসবাসপত্র, যন্ত্রপাতি বা পরিবহন যানের মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে

রোগের লক্ষণ:

- চোখ দিয়ে পানি ও নাক দিয়ে লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে থাকে।
- গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
- চোখের পাতা, মাথা, মুখ ও পায়ের গিরা ফুলে থাকে। যার জন্য খুড়িয়ে হাঁটে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মুরগি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।
- পায়ের তলায় ফুলে যায়, পুঁজ হতে পারে।
- বুকের মাংসে ফোসকা দেখা যায়।

চিত্র:৩.২৭ মাইকোপ্লাজমোসিস রোগে চোখ, নাক দিয়ে পানি, লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে পায়ের তলায় ফুলে যায়

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

শ্বাসনালীতে প্রচুর হলুদাভ সর্দি (মিউকাস) জমে এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। গিরায় চিজের মত আঠালো পদার্থ দেখা যায়।

প্রতিরোধ:

রোগ ছাড়ানোর উপায়গুলো ভালোভাবে জেনে সেগুলো সম্পর্কে সতর্কতামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত টিকা দিতে হবে। মাইকোপ্লাজমা মুক্ত খামার থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। হ্যাচিং ডিম ইনকিউবেটরে রেখে ২-৩ ঘন্টা ভাপ (৩৭-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) দিয়ে ০.০৪% -০.১০ টাইলোসিন টারট্রেট বা জেন্টামাইসিন দ্রবণের মধ্যে ২৫ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০-৩০ মিনিট রেখে দিলে ডিমের মধ্যেকার মাইকোপ্লাজমা জীবাণু মারা যায়। মুরগির শেডে অতিরিক্ত ধুলাবালি ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

চিকিৎসা:

টাইলোসিন টারট্রেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

৩.১.২.৪ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ সমূহ:

(ক) এসপারজিলোসিস (Aspergillosis)

এসপারজিলাস ফ্লেভাস নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এ রোগকে এসপারজিলোসিস বলা হয়। মুরগির বাচ্চার ব্রুডিংকালীন সময়ে এ রোগ নিউমোনিয়া প্রকৃতির হয় বিধায় একে ব্রুডার নিউমোনিয়াও বলা হয়। এছাড়া

অন্যান্য বয়সের মুরগির আক্রান্ত হতে পারে। পুষ্টির অভাবজনিত কারণে দুর্বল মুরগি এবং বাড়ন্ত মুরগি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ব্রুডিংকালীন সময়ে হলে ১০-৫০% মুরগি মারা যেতে পারে।

রোগের বিস্তার:

- হ্যাচারিতে ডিম হতে বাচ্চা ফোটার পর বা ব্রুডার হাউজে ব্রুডিং এর সময় শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই ছত্রাকের স্পোর ফুসফুসে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- লিটার বেশি আর্দ্র হলে এই রোগের জীবাণু জন্ম নেয়। উক্ত স্পোর শ্বাসনালীতে যেয়ে রোগ সৃষ্টি করে ।

রোগের লক্ষণ:

- শ্বাসকষ্ট হয় ও হাঁ করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ।
- নিঃশ্বাসের সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
- খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দুর্বল হয়ে যায়।
- পিপাসা বেড়ে যাওয়ার ফলে বারবার পানি পান করে ।
- বাচ্চা মুরগিতে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।
- চোখে আক্রান্ত হলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ দিয়ে সবসময় পানি পড়ে।
- মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে অবশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না।

চিত্র: ৩.২৮ ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগে চোখ ফুলে যায়, ফুসফুসে সাগু দানার মত নডিউল

পোস্টমর্টেম লক্ষণ:

শ্বাসনালী, কণ্ঠনালী ও ফুসফুসে সাগু দানার মত সাদা বা হলুদাভ নডিউল দেখা যায়। ফুসফুসে ধূসর বর্ণের ফেনা পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ:

- হ্যাচারি যন্ত্র বাচ্চা ফোটানোর আগে ফিউমিগেশন করা উচিত। ছত্রাকমুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর আগে বেছে নিতে হবে। স্যাঁতস্যাঁতে বা বেশি শুকনা লিটার ব্যবহার করা উচিত না।

- বেশি দিনের পুরনো ছত্রাকযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না, খাদ্য উপাদান মেশানোর পর বেশি দিন রাখা যাবে না। ময়লা আবর্জনামুক্ত শুকনা পরিবেশ রাখতে হবে। খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। খাবারে নিয়মিত কপার সালফেট এবং মোল্ড বাইন্ডার যোগ করতে হবে।

চিকিৎসা:

কোনো সঠিক চিকিৎসা নেই। মাইকোফিক্স প্লাস প্রতি কেজি খাদ্যে ১.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। অথবা নিষ্টাটিন জাতীয় ঔষধ খাবারে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

(খ) আফলা-টক্সিকোসিস (Afla-toxicosis)

এটি মাইকোটক্সিন জনিত মারাত্মক রোগ। অ্যাসপাজিলাস নামক ছত্রাক থেকে এই মাইকোটক্সিন তৈরি হয় বা খাদ্যের মাধ্যমে বিশেষ করে সয়াবিন, ভূট্টা, চালের গুঁড়া ইত্যাদির মাধ্যমে খামারের মুরগিতে বিস্তার লাভ করে । নিম্নমানের খাদ্য (১৪% এর অধিক আর্দ্রতা), উপযুক্ত ভাবে গুদামজাত না করা, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ পোল্ট্রি খাদ্য মাইকোটক্সিন দ্বারা আক্রান্ত। সকল বয়সের মুরগি আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার:

- খাদ্য যদি কোনো কারণে ভিজে যায় এবং সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়।
- খাদ্য মেশানোর পর বেশি দিন রাখা হয় এবং তা যদি মুরগিকে খাওয়ানো হয়।

রোগের লক্ষণ:

- পালক ঠোকরাবে।
- পায়ের রং ফ্যাকাসে হবে ও খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবে।
- খাদ্যে অরুচি ও পাতলা পায়খানা হবে।
- মুখে ঘা দেখা দিবে।
- পালক উসকো-খুসকো হবে।
- ঝিমাবে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিবে।
- শরীরের ওজন কমে যায়।
- পুষ্টি দ্রব্যের শোষণ হ্রাস পায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।
- পরবর্তীতে মুরগি মারা যাবে।

চিত্রঃ ৩.২৯ আফলা-টক্সিকোসিস রোগে পালক উসকো-খুসকো, লিভার ফালচে বর্ণ হয়ে যাওয়া

পোস্টমর্টেম লক্ষণঃ লিভার ফালচে বর্ণের। চামড়ার নিচে রক্তের ফোঁটা। পেটের ভিতরে প্রচুর রক্ত পাওয়া যাবে।

প্রতিরোধঃ

খাবারে টক্সিন বাইন্ডার নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত লিটার ও খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাঝে মাঝে খাবারে অফলাটক্সিন-এর পরিমাণ জানার জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে হবে। লিটার শুকনা ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পঁচা, ভেজা ও নষ্ট খাবার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। পরিষ্কার খাবার ও পানি সরবরাহ করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

* মাইকোফিক্স প্লাস বা যেকোনো টক্সিন বাইন্ডার খাদ্যের মেশাতে হবে।
* পানিতে আখের গুড় ও কপার সালফেট মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
* পঁচা খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

৩.১.২.৫ প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগঃ

(ক) রক্ত আমাশয় (Coccidiosis)

ককসিডিয়া নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে ককসিডিওসিস বলে। অল্প বয়সের মুরগি বিশেষ করে ৪-৮ সপ্তাহের মুরগি এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে বেশি বয়সী মুরগিতেও কখনও কখনও এ রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশে আইমেরিয়া টেনেলা ও আইমেরিয়া নেকাট্রিক্স নামে ২টি জীবাণু দ্বারা রক্ত আমাশয় হয়। মুরগির বাচ্চার মড়কের কারণগুলোর মধ্যে এই রোগ অন্যতম।

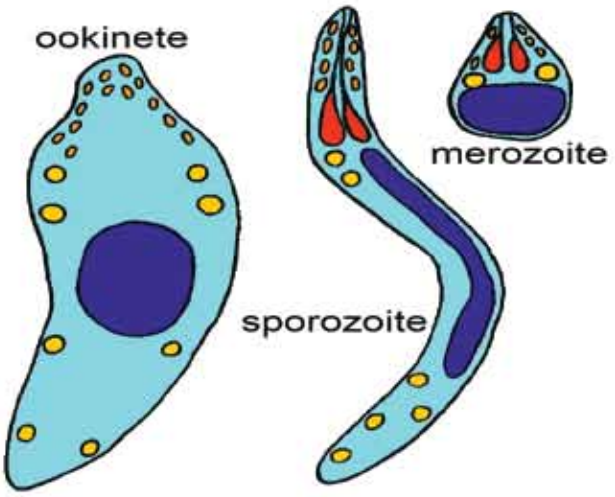

চিত্রঃ ৩.৩০ ককসিডিয়া নামক প্রটোজোয়া

রোগের লক্ষণঃ

- হঠাৎ করে খাদ্য ও পানি গ্রহণে অনীহা দেখাবে।
- পালক উসকো খুসকো হবে।
- রক্ত মিশ্রিত চুনা পায়খানা করবে ও মলদ্বারের পালকগুলো পায়খানায় ভিজা থাকে।
- বাচ্চা চোখ বুজে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে।
- শরীরে কাঁপুনি হয়।
- ঠোঁট,পা,ঝুঁটি ও গলার ফুল ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চিত্রঃ ৩.৩১ রক্ত আমাশয় আক্রান্ত মুরগির বিষ্ঠা ও আক্রান্ত অন্ত্র

পোস্টমর্টেম লক্ষণঃ

আক্রান্ত মুরগিতে রক্তমিশ্রিত বিষ্ঠা থাকে। অন্ত্রের আক্রান্ত স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায় ও অন্ত্রের দেয়ালের বাইরে থেকে রক্ত আবরণের চিহ্ন দেখা যায়। সিকামে রক্ত মিশ্রিত তরল বিষ্ঠা থাকবে।

২০২৩

প্রতিরোধঃ

- স্বাস্থ্যসম্মত লিটার ও পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
- মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাড়ন্ত মুরগির সাথে বাচ্চা মুরগি রাখা যাবে না।
- পানির পাত্রের নিচের ও চারিপার্শ্বের লিটার প্রতিদিন উল্টে পাল্টে দিতে হবে।
- বাচ্চা মুরগির ঘরে কাজ করার পর বড় মুরগির ঘরে কাজ করতে হবে।
- বিধি মোতাবেক ঘর পরিষ্কার ও লিটার পরিবর্তন করে নতুন ব্যাচে বাচ্চা তুলতে হবে।
- লিটার সব সময় শুষ্ক রাখতে হবে। ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৫-৭ কেজি চুন ছিটিয়ে মিশিয়ে দিয়ে লিটার ওলট পালট করে দিলে লিটার শুষ্ক থাকবে। ফলে ককসিডিয়ার জীবাণুসহ অন্যান্য জীবাণু মারা যাবে।
- প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৫০ গ্রাম বাজারে প্রাপ্ত ককসিডিওস্ট্যাট মিশিয়ে খাদ্যে ব্যবহার করতে হয়।
- জৈব নিরাপত্তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- টিকা ব্যবহার করে ও বাচ্চার ককসিডিওসিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিকিৎসা

ইএসবি৩ (৩০%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন পান করাতে হবে।

যদি রোগ মুক্ত না হয় তবে ২দিন পর আবার ইএসবি৩ (৩০%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ দিন পান করাতে হবে।

এমবাজিন পাউডার ১.৫-২.০গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন পান করাতে হবে।

৩.১.২.৬ অন্যান্য রোগঃ

(ক) পেটে পানি জমা রোগ (Acytis)ঃ

এসাইটিস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্রয়লার মুরগির একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের কারণ একাধিক তবে রক্ত সংবহন তন্ত্রের ত্রুটির জন্যই শেষ পর্যন্ত এসাইটিস দেখা দেয়। যেকোনো বয়সের মুরগিই আক্রান্ত হতে পারে তবে ৫-৬ সপ্তাহের মুরগিই বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণ ঝাঁকের ছোট মুরগিগুলোই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- পালক উসকো খুসকো হয়।

- ঝুঁটি ফ্যাকাসে ও কুচকানো থাকে।
- হাঁটা বা নড়াচড়ায় অনীহা দেখায়।
- শ্বাসকষ্ট হয় এবং পেট বড় হয়ে যায়।

পোস্টমর্টেম লক্ষণঃ

আক্রান্ত মুরগির পেটে হলুদাভ বা বাদামি রঙের পানি জমা হয়। হৃৎপিন্ড বড় হয়ে যায়।

প্রতিরোধঃ

- বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ভালো থাকলে, ব্রয়লার প্রতি জায়গার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে, সেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লিটার শুষ্ক থাকলে, দুপুরের দিকে ২-৩ ঘন্টা খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখলে এবং পানিতে দ্রবণীয় মাল্টি ভিটামিন খাওয়ালে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- খাদ্যের সাথে নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতি টনে ১২৫ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে খাবারের অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ ব্যবহার করলে এবং পি এইচ কন্ট্রোলার ১মিলি/ ২মিলি পানিতে ৫-৭ দিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এনফ্লক্স- ভেট সলুশন ব্যবহার করলে রোগের প্রবণতা কমে।

৩.২ মুরগির পুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ অপুষ্টিজনিত রোগ

Name, cause, symptoms, treatment and prevention of malnutrition in chickens :

খাদ্যের যেকোনো এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের ঘাটতির কারণে লেয়ার মুরগির বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। নিচের লেয়ারে বিভিন্ন ভিটামিনসমূহের অভাবজনিত রোগ, তাদের চিকিৎসা ও প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

৩.২.১ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগঃ

(ক) ভিটামিন'এ'এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin A deficiency disease)

কতদিন পর্যন্ত মুরগিগুলো এই ভিটামিনের অভাবে ভুগছে তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিন-'এ' এর অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। বয়স্ক মুরগিতে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। কিন্তু মুরগিতে ২/৩ সপ্তাহে মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো অবস্থা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, চোখের পাতা ফুলে যায়।
- নাক ও চোখ দিয়ে আঠার মতো জলীয় পদার্থ বের হয় এবং রাতকানা রোগ হয়।
- পায়ের হাঁটু ও চামড়ার হলুদ রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে।
- খাবার গ্রহণে আগ্রহ কমে যায় ও পালকের চাকচিক্য কমে যেতে পারে।
- মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়। ঝুঁটি শুষ্ক ও ফ্যাঁকাশে হয়ে যায়।
- বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়।

অভাব নিরূপণ:

- খাদ্যে ভিটামিন-'এ' এর পরিমাণ সঠিক আছে কিনা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।
- রক্তের সিরামে ভিটামিন এর পরিমাণ নির্ণয় করা।
- চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় কিনা তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে এই ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

খাদ্যে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ছোট মাছ, ফলমূল, ফলমূলের খোসা, হাঙ্গর মাছের তেল খাওয়ালে ভিটামিন-'এ' এর অভাব দূর হয়। লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিদিন বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন এ.ডি.ই. দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত খাদ্য বা পানির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

(খ) ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin D deficiency disease)

শরীরের হাড় এবং ডিমের খোসার গঠনের জন্য অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস-এর কার্যকারিতার জন্য এই ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি। সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে বা খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে ভিটামিন ডি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মুরগি খাবার হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন ডি পায় না।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- পায়ের অস্থি নরম মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়, ফলে মুরগি ঠিক মতো হাঁটতে পারে না। একে 'রিকেট/অস্টিওম্যালেসিয়া" রোগ বলা হয়।
- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে হাড় বাঁকা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।
- ঠোঁট, হাড় ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়, ফলে মুরগি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলে।
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ও পাজর ফুলে যায়।

চিত্রঃ ৩.৩২ ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত লক্ষণ

রোগ নিরূপণঃ

- লক্ষণ দেখে রোগ নিরূপণ তথা ভিটামিন ডি এর অভাব বোঝা যায়।
- খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং
- সন্দেহজনক মুরগিকে যদি ভিটামিন ডি সরবরাহ করে ভালো ফল লাভ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ভিটামিন ডি এর অভাবে ভুগছিল।

সতর্কতাঃ অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন ডি খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োগ করলে মুরগির কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ

- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির এ.ডি.ই. দ্রবণ নির্দেশমত খাওয়াতে হবে।
- যেহেতু ভিটামিন ডিএর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত তাই একই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারে ছোট বাচ্চাগুলোকে সম্ভব হলে দিনের কিছুটা সময় রোদ্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলে এবং সকালবেলা মুরগির জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করলে ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

(গ) ভিটামিন ই এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin E deficiency disease)

ভিটামিন ই এর অভাবে মুরগির এনসেফালোমেলাসিয়া, মাসকুলার ডিসট্রোফি, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি রোগ হতে পারে। খাদ্যে অপর্যাপ্ত সেলিনিয়ামের উপস্থিতি, বিভিন্ন উপকরণের সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ না করা, তৈল জাতীয় খাদ্যের অক্সিডেশন ইত্যাদির কারণে ভিটামিন-ই এর অভাব হতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- আক্রান্ত হাঁটতে পারে না, পা টান করে ছেড়ে দেয়।
- বাচ্চার মাথার বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও জায়গাগুলো নরম হয়। এ রোগকে এনসেফালোমেলাসিয়া বলে।
- বুক ও উরুর মাংস শুকিয়ে যায়, একে মাসকুলার ডিসট্রোফি বলে।
- চামড়ার নিচে পানি জমার কারণে শরীর ফুলে যায়, একে'অ্যাকজুডেটিভ ডায়াথেসিস'বলে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

(ক) চিকিৎসার জন্য বাজারে প্রাপ্ত এ.ডি.ই. দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

(খ) রোগ প্রতিরোধের জন্য সর্বদা খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের মাত্রা বজায় রাখতে হবে।

(গ) খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তৈল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ রাখতে হবে।

(ঘ) সংরক্ষিত খাদ্যে এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ খনিজ বিশেষত সেলেনিয়াম খাদ্যে মিশাতে হবে।

(ঘ) ভিটামিন কে এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin K deficiency disease)

এই ভিটামিনটি শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এর অভাব হলে ঠোঁট কাটার সময় বা সামান্য আঘাতে অধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। আবার আমাশয় আক্রান্ত হলে পায়খানায় প্রচুর রক্ত দেখা যায়। খাদ্য ও পানিতে যদি সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয় তবে এই ভিটামিনটির মেটাবলিজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে অন্ত্রের মধ্যে ভিটামিন কে উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহ মরে যায়, ফলে দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন সংরক্ষণ করলেও খাদ্যের উপস্থিত এই ভিটামিনটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- এ ভিটামিনের ঘাটতির কারণে শরীরে কোথাও কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে, রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। ফলে মুরগির মৃত্যু ঘটে।
- ঠোঁট কাটার পর অধিক সময় ধরে রক্ত ক্ষরণ হয় ফলে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়ে মুরগি মরে যেতে পারে।
- চামড়া ও মাংস পেশিতে রক্তপাত হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

ক) ঠোঁট কাটার কয়েক দিন পূর্ব হতে খাদ্যে ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
খ) রক্ত আমাশয় এর চিকিৎসা চলাকালেও অতিরিক্ত ভিটামিন কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
গ) সবুজ ঘাস, মাছের গুঁড়া শাকসবজি ইত্যাদি খাওয়ালে ঘাটতি দূর হয়।
ঘ) চিকিৎসার জন্য খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।
ঙ) অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার সময় এবং তারপর কিছুদিন খাদ্য ভিটামিন কে সরবরাহ করতে হবে।

(ঙ) ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন) এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_1 Thiamin deficiency disease)

পানিতে দ্রবণীয় এ ভিটামিনটির অভাবে খুব তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন বি-১ বিদ্যমান না থাকলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- অরুচি এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
- দৈহিক ওজন হ্রাস।
- উসকো খুসকো পালক।
- দুর্বলতা এবং হাঁটতে অনীহা।
- ঝিমানো ভাব।
- ঘাড় বাঁকানো বা ঘুরিয়ে উল্টোভাবে রাখা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- কখনও কখনও মুরগি ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে । একে "স্টার গেজিং" বলে।

রোগ নির্ণয়:

- লক্ষণ অনুযায়ী ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে।
- আক্রান্ত মুরগির খাদ্যে ভিটামিন বি-১ এর পরিমাণ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এরা আসলে ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে কিনা।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১) পানি বা খাবারে ভিটামিন বি-১ সরবরাহ করা। প্রথম কয়েক দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

২) খুব অসুস্থ মুরগির জন্য আরও বেশি পরিমাণে ভিটামিন বি-১ খাবারে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৩) এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১ মিশিয়ে দিতে হবে।

(চ) ভিটামিন বি-২(রাইবোফ্লাভিন)এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_2 Riboflavin deficiency disease)

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং খাবার পানির পিএইচ (অম্লত্ব) ভিটামিন বি-২ কে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই খাদ্যে এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

বাচ্চা অবস্থায় প্রথম কয়েক সপ্তাহ ও ভিটামিনটির অভাব হলে মুরগির মধ্যে-

- দৈহিক দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়।
- শুকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক পালক গজায় না।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- তীব্র আক্রান্ত মুরগির পা অবশ হয়ে গিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হাঁটে।
- প্রায় সময় ও ভিটামিনের অভাবে পায়ের অবশতাজনিত রোগ দেখা যায় যাকে 'কার্ল-টো-প্যারালাইসিস'বলে । এক্ষেত্রে দুই পা দু'দিকে অর্থ্যাৎ সামনের দিকে এক পা চলে পিছনের দিকে চলে যায় ফলে পাগুলি অচল হয়ে যায় । তাই তারা হাঁটতে পারে না এবং না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে।
- ব্রিডার মুরগি হলে ডিম হতে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায় এবং ডিমের ভিতর বাচ্চা মারা যায় ।

রোগ নিরূপণ:

রোগের লক্ষণ দেখে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করলে যদি লক্ষণগুলো দ্রুত চলে যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ঐ ভিটামিনের অভাবে ভুগছিল ।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১) খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-২ থাকা দরকার ।

২) মাঝে মাঝে পানিতে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাতে এই ভিটামিনের অভাব না হয় ।

৩) আক্রান্ত মুরগিগুলোকে আলাদা ভাবে রেখে ভিটামিন বি-২ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায় ।

(ছ) ভিটামিন বি-৬(পাইরিডক্সিন)এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_6 Pyridoxine deficiency disease)

খাবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকলে এবং অনুযায়ী ভিটামিন বি-৬ এর স্বল্পতা থাকলে সাধারণত এ ভিটামিনটির অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায় । কারণ এটি প্রোটিনের বিপাকে সাহায্য করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অরুচি, উসকো খুসকো পালক ইত্যাদি।
- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত বা কম হওয়া।
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- গুরুতর আক্রান্ত মুরগিগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং সব শেষে খিঁচুনি দেখা যায় এবং মৃত্যু হয়।

রোগ নির্ণয়:

খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ও রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণার ভিত্তিতে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ ঝাঁকের মুরগিগুলি ভিটামিন বি-৬ এর অভাবে ভুগছিল।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

১) লক্ষণ প্রকাশ পেলে খাবারের বা পানির সাথে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করে এ রোগের লক্ষণ প্রশমিত করা যায়।

২) নিয়মিত পরিমাণমত ভিটামিন বি-৬ খাবারের সাথে সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় না।

(জ) বায়োটিন এর অভাবজনিত রোগ (Biotin deficiency disease)

অধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে বায়োটিন সৃষ্টিকারি জীবাণু মরে গিয়ে কিংবা খাদ্যের মধ্যে বায়োটিনের পরিমাণ কম হলে অথবা খাদ্যে বায়োটিন নষ্টকারি কোনো পদার্থের উপস্থিতি থাকলে মুরগিতে এটার অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। বাচ্চা মুরগির শরীরের অসাড়তার হাত থেকে রক্ষার জন্য এ ভিটামিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- পালক ভেঙে ঝুলে পড়া ও পরে হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে।
- অনেক সময় চোখের পাতা বুজে থাকে বা চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- বাচ্চা মুরগির পায়ের নিচে, মুখের কোণায় এবং চোখের পাতায় কড়া পড়ে যেতে পারে।
- ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরে যায়।
- ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

রোগ নির্ণয়:

১) লক্ষণ দেখে বায়োটিন প্রয়োগের ফলে যদি চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগির বায়োটিনের অভাবে ভুগছিল।

২) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ এবং রোগের লক্ষণ দেখে সমন্বয় করে ও রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়োটিন মিশাতে হবে।

২) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে পানিতে অতিরিক্ত বায়োটিন মিশাতে হবে।

৩) খাদ্য বা পানিতে অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

৪) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে খাদ্যে বায়োটিনের অভাব না হয়।

(ঝ) কলিন এর অভাবজনিত রোগ (Colin deficiency disease)

মোরগ-মুরগির শরীরে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে কলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারীরিক অসাড়তা দূর ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা কলার গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মুরগির খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কলিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- পায়ের হাড় নরম ও বাঁকা হয়ে মুরগি অসাড় হয়ে যায়।
- দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে।
- ব্রিডার মুরগির কলিজায় অতিরিক্ত চর্বি ও রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণ দেখা দেয়।
- ব্রিডার মুরগির মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায় ফলে ডিম পাড়াও কমে যায়।

রোগ নির্ণয়:

লক্ষণ দেখে এবং পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়াও খাদ্যস্থিত কলিন বৃদ্ধি করে যদি ফল পাওয়া যায় তবে ধরতে হবে কলিনের অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবিন মিল, গম ভাঙা, ফিস মিল ইত্যাদি থাকায় মোরগ-মুরগিতে কলিনের অভাব সাধারণত হয় না। কারণ সয়াবিন মিল ও ফিসমিলে প্রচুর পরিমাণে কলিন থাকে। বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে কলিন বা কলিন ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন মত খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই কলিনের অভাজনিত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

(ঞ) ভিটামিন বি ১২ (সায়ানো-কোবালামিন) এর অভাবজনিত রোগ
Vitamin B12 (cyano-cobalamin) deficiency disease

শরীরের কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরিতে, শর্করা ও চর্বির বিপাকীয় প্রকিয়ায় ভিটামিন বি-১২ সাহায্য করে। তন্ত্রের বিভিন্ন জীবাণু এই ভিটামিনটি তৈরি করে বিধায় এই ভিটামিনটির অভাবজনিত রোগ খুব কম দেখা দেয় এবং খাদ্যে এর প্রয়োজন অত্যন্ত নগণ্য। লিটারে পালিত মোরগ-মুরগির এই ভিটামিনের অভাব হওয়ায় সম্ভাবনা কম। যদি মোরগ-মুরগিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয় তবে এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- মৃত্যুর হার বেড়ে যায় এবং ডিম থেকে ডিম ফোটার হার কমে যায়।
- ডিমের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে।

রোগ নির্ণয়:

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ইতিহাস, লক্ষণ ইত্যাদি দেখে ভিটামিন বি-১২ দিয়ে চিকিৎসা দিলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিতে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১) লক্ষণ দেখা দিলে পানি বা খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১২ সরবরাহ করতে হবে।

২) সুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে পানির সাথে ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।

(ট) ভিটামিন সি এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin C deficiency disease)

স্ট্রেস বা পীড়ন প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসেবে ভিটামিন সি ব্যবহার হয়ে থাকে। মোরগ-মুরগি ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। দৈহিক বৃদ্ধি, বীর্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রকম বিষক্রিয়া, বিশেষত কিছু খনিজ লবণের বিষক্রিয়ার হাত থেকে মোরগ-মুরগিকে রক্ষা করার ক্ষমতা ভিটামিন সি এর রয়েছে। খাদ্যে ভিটামিন সি এর অভাব থাকলে বা মোরগ-মুরগি অত্যধিক গরম আবহাওয়ায় থাকলে বা পীড়ন (স্ট্রেস) সৃষ্টি হলে মোরগ-মুরগির ভিটামিন সি এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায়।
- খাদ্য হজম কম হয়।
- পীড়নের মধ্যে পড়লে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়
- মোরগ-মুরগির বিশেষত মোরগের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি মেশাতে হবে।
- মোরগ-মুরগির ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পীড়ন হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পানির সাথে অতিরিক্ত ভিটামিন সি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে ও পরে কয়েকদিন ভিটামিন সি সরবরাহ করতে হবে।

৩.২.২ খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ (Mineral deficiency disease)

(ক) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর অভাবজনিত রোগ

Diseases due to deficiency of calcium and phosphorus

আমিষ, শ্বেতসার, চর্বি এবং ভিটামিনের মতো পাখির খাদ্যে খনিজ পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রজননের জন্য খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক। তবে অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে । তাই পরিমিত পরিমাণ খনিজ পদার্থ খাদ্যের সাথে সরবরাহ করতে হয়।

কাজ:

- পাখি/মুরগির দেহের অস্থি গঠন, ডিমের খোসা তৈরিতে খনিজ পদার্থ অত্যাবশ্যক।
- দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করে ।
- খনিজ শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যে বিপাকে সাহায্যে করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।
- ডিমের খোসা নরম ও পাতলা হয়
- খোসা ছাড়া ডিম দেয়।
- অস্থির গঠন ঠিক মতো হয় না।
- রক্ত জমাট বাঁধে না।
- রিকেট রোগ ও কেজ লেয়ার ফ্যাটিগ রোগ হয়।
- বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

- মাছের গুঁড়া, ঝিনুক, হাড়, দানা শস্য, পালং শাক ইত্যাদি মুরগির খাদ্যে সরবরাহ করলে এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- মুরগির খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাচ্চা মুরগিতে ২.২ঃ১।
- মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে- বাড়ন্ত মুরগিতে ২.৫ঃ১।
- মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে-ডিমপাড়া মুরগিতে ৯ঃ১।

(খ) সোডিয়াম এর অভাবজনিত রোগ (Diseases due to deficiency of Sodium)

সোডিয়ামের কাজঃ

- দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- অস্থি গঠন করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
- ক্যানাবলিজম রোগ হয়।
- হাড় নরম হয়।
- রক্ত পাতলা হয়।
- ডি-হাইড্রেশন দেখা দেয় ও মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা: খাদ্যে সাধারণ লবণ সরবরাহ করে এর অভাব দূর করা যায়।

(গ) জিংক এর অভাবজনিত রোগ (Diseases due to deficiency of Zinc)

জিংকের কাজঃ

- পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো ও ডিম উৎপাদনের জন্য জিংক প্রয়োজন।
- অস্থির গঠনে জিংক প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
- পালক কম গজায় ও পায়ের চামড়া উঠে যায়।
- পায়ের হাড় খাটো ও মোটা হয়।
- মুরগি ঠোকরা ঠুকরি করে ।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

- মুরগির খাদ্যে জিংকের বা জিংক সমৃদ্ধ উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে ।

(ঘ) সেলেনিয়াম এর অভাবজনিত রোগ (Diseases due to deficiency of Selenium)

সেলেনিয়ামের কাজঃ

- সেলেনিয়াম হচ্ছে গ্লুটাথায়োন পারোক্সিডেজ(Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ:

- ডিম বসানোর ৪র্থ দিনে ভ্রুণের মৃত্যু হয়।
- চামড়ার নিচে পানি জমে।
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।

- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

- ছোলা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বা খাদ্যে সেলেনিয়াম যুক্ত করলে এর অভাব দূর হয়।

(ঙ) লৌহ ও কপার এর অভাবজনিত রোগ
(Diseases due to deficiency of Iron and Cupper)

অভাবজনিত লক্ষণ:

- রক্তশূণ্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
- লাল পালক এর রং ফ্যাকাশে হয়।
- স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা:

শাকসবজি, ঘাস, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ফেরাস সালফেট ও কপার সালফেট সংযোজন করতে হবে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজঃ

রোগের নাম	সাধারন লক্ষণ	কোন উপাদানের অভাবে হয়	চিকিৎসা
জেরোপথালমিয়া			
রিকেট			
প্যারোসিস			
কার্ল টু প্যারালাইসিস			

৩.৩ লেয়ার মুরগির টিকাদান কর্মসূচি (Layer Chicken Vaccination Program):

টিকা বীজ হচ্ছে রোগের প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্ট্রিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকা বীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক আমিষ পদার্থ তৈরি হয়, যাকে অ্যান্টিবডি বলা হয়। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক পদার্থ। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে টিকা প্রদানের যে সিডিউল তৈরি করা হয় তাই টিকাদান কর্মসূচি ।

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	ডোজ	প্রয়োগের মাধ্যম
১	মারেক্স	০.২ সিসি	চামড়ার নিচে
৪	গামবোরো + রাণীক্ষেত (কিল্ড)	হাফ ডোজ(০.২৫সিসি)	চামড়ার নিচে
৬	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস+ রাণীক্ষেত (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
১০	গামবোরো (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
১৫	মারেক্স	০.২ সিসি	চামড়ার নিচে
১৭	গামবোরো (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
২১-২৪	রাণীক্ষেত (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
৩৫	ফাউল পক্স	১ ডোজ	পাখার চামড়ার নিচে
৫৮-৬০	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস + রাণীক্ষেত (লাইভ)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে
১০৫	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস + রাণীক্ষেত (লাইভ)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে
১১০	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস + রাণীক্ষেত (লাইভ)	০.৩ মিলি	চামড়ার নিচে
প্রতি ২ মাস পর পর	রাণীক্ষেত (লাইভ) (এনডি ক্লোন-৩০)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে

টেবিল: ৩.০২

৩.৩.১ ভ্যাকসিন/ টিকা

জীবিত বা মৃত বা অর্ধমৃত অনুজীব বা অনুজীব নিঃসৃত বিষ বা এনজাইম যা শরীরে প্রবেশ করানোর পর নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই ভ্যাকসিন। কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদ্ধতিকে ভ্যাকসিনেশন বলে। ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়।

৩.৩.২ ভ্যাকসিনেশনের নিয়মাবলী:

- সঠিক মান ও জাতের ভ্যাকসিন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

- যে ভ্যাকসিন যে বয়সে দেয়ার নিয়ম সে বয়সেই দিতে হবে।
- ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে/ বোতলে তৈরি দুই বা ততোধিক ভ্যাকসিন এক সাথে দেয়া যাবে না।
- ভ্যাকসিন গুলানো, মাত্রা ও প্রয়োগ করতে প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাকসিন রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ভ্যাকসিন গুলানোর সময় পরিশ্রুত পানি ব্যবহার করতে হবে।
- ভ্যাকসিন প্রয়োগের সরঞ্জামাদি কোনক্রমেই কোনো রাসায়নিক বস্তু/ওষুধ/জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা যাবে না। পানিতে ফুটিয়ে সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত বা পীড়ন অবস্থায় ভ্যাকসিন দেয়া যাবে না।
- ভাইরাল ভ্যাকসিন প্রয়োগের সময় গুলানো ভ্যাকসিন ঠান্ডা স্থানে রেখে প্রয়োগ করতে হবে।
- ভ্যাকসিন প্রয়োগের তিন দিন পূর্বে থেকে তিন দিন পর পর্যন্ত প্রতি ৫ লিটার পানিতে ১ গ্রাম করে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ডব্লিউ.এস. মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- গুলানো ভ্যাকসিন ১-২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
- ভোরবেলা অথবা বিকাল বেলা অথবা রাত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।
- একটি ঘরের সকল পাখিকে একই সময়ে ভ্যাকসিন দিতে হবে।
- খাবার পানির মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে পানিতে যাতে ক্লোরিন না থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
- ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর ভ্যাকসিনের ভায়াল মাটির গভীর গর্তে পুঁতে রাখতে হবে অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।
- ভ্যাকসিন অবশ্যই থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে বরফ দিয়ে তার মধ্যে পরিবহন করতে হবে।

৩.৩.৩ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণ
The reason for the loss of effectiveness of the vaccine

বিভিন্ন কারণে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন-

- ভ্যাকসিনেশনে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, নিডল, ড্রপার যদি জীবাণুমুক্ত না হয়।
- ভ্যাকসিনের মাত্রা যদি নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে খুব কম বা খুব বেশি হয়।
- ক্লোরিনযুক্ত পানিতে ভ্যাকসিন গুলানো হলে ।
- নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের জন্য নির্দিষ্ট ডায়লুয়েন্ট (পানি) ব্যবহার না করলে।
- ভ্যাকসিন যদি শরীরের মধ্যে ঠিকভাবে প্রবেশ না করে ।
- বুস্টার ডোজ না দিলে।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন ব্যবহার করলে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ বা পরিবহন না করলে।
- রোগাক্রান্ত পাখিতে ভ্যাকসিন প্রদান করলে।

- খাদ্যে মাইকো টক্সিন এবং আফলা টক্সিন থাকলে।
- পীড়নকালে ভ্যাকসিন দিলে।
- জীবিত জীবাণু দ্বারা তৈরি ভ্যাকসিনের জীবাণুর মৃত্যু ঘটলে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

৩.৩.৪ ভ্যাকসিনেশনের বিভিন্ন উপায় (Different ways of vaccination)

দু'টি পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যায়-

(ক) একক ভ্যাকসিনেশন

(খ) সম্মিলিত ভ্যাকসিনেশন।

(ক) একক ভ্যাকসিনেশনের বিভিন্ন উপায়

১. চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে: সাধারণত ঘাড়ের বা পাখার চামড়ার নিচে এবং রানের বা বুকের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

২. চোখ বা নাকের ছিদ্রের মাধ্যমে: নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের জন্য নির্দিষ্ট আকারের ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে বা নাকের এক ছিদ্র পথে ১ ফোঁটা ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

৩. ঠোঁট ডোবানোর মাধ্যমে: নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দ্বারা ভ্যাকসিন গুলিয়ে তার মধ্যে নাকের ছিদ্র পর্যন্ত ঠোঁট ডুবিয়ে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়।

৪. ক্ষত তৈরির মাধ্যমে: রানের কোনো স্থানে কয়েকটি পালক উঠালে একটি ছোট ক্ষত তৈরি হয়। এই ক্ষতস্থানে ভ্যাকসিন মিশ্রিত পানি দ্বারা লেপে দিলে ভ্যাকসিনেশন হয়ে যায়।

(খ) সম্মিলিত ভ্যাকসিনেশনের উপায়

১.খাবার পানির সাথে: এই পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন ক্লোরিনমুক্ত পানি/পাতিত পানি/বৃষ্টির পানির সাথে মিশিয়ে ঐ পানি মুরগিকে পান করানো হয়। এ পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে-

- পাখিকে ৩ ঘণ্টাকাল পানি না দিয়ে তৃষ্ণার্ত করে ভ্যাকসিন মিশ্রিত পানি দিতে হবে।
- ভ্যাকসিন মিশ্রিত পানি পাত্রে ২-৩ ঘণ্টা সময় থাকতে হবে।
- ভ্যাকসিন ব্যবহারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মিশ্রিত করতে হবে।
- সকালে বা বিকালে ঠান্ডা আবহাওয়ার সময় ভ্যাকসিন মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

২. স্প্রে ভ্যাকসিনেশন:

পরিষ্কার, ক্লোরিন ও জীবাণুমুক্ত পানিতে/পাতিত পানিতে ভ্যাকসিন মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ৩-৩.৫ ফুট উপর থেকে বাচ্চার উপর স্প্রে করতে হবে। ভ্যাকসিন স্প্রে করার সময় দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

৩.৪ লেয়ার মুরগির বিভিন্ন ধরনের কৃমি সংক্রমণ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার
Layer chicken different types of worm infections, symptoms and its remedies

৩.৪.১ পরজীবীজনিত রোগ (Parasitic Diseases):

পরজীবী বা প্যারাসাইট এক ধরনের ক্ষুদ্র জীব যা অন্য জীব অর্থাৎ মানুষসহ পশুপাখির দেহে বসবাস করে জীবনধারণ করে । যে জীবের দেহের এরা জীবনধারণ করে তাদেরকে হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে । এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাইরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে । এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বলে। উভয় ধরনের পরজীবীর আক্রমণের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভারে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখি/মুরগির দেহে বাস করে পাখি/মুরগির কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি/মুরগির পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী আছে যারা পাখি/মুরগির দেহে বাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখি/মুরগির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। যেকোনো পরজীবী দ্বারা পাখি/মুরগি আক্রান্ত হোক না কেন, এদের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত পাখি/মুরগির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায়। এছাড়াও এক ধরনের পরজীবী আছে যাবা আক্রান্ত পাখি/মুরগির দেহ থেকে সুস্থ পাখি/মুরগির দেহে সংক্রামক রোগের জীবাণু সংক্রমিত করে থাকে। কাজেই পোল্ট্রি শিল্প থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে হলে পরজীবীজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ অপরিহার্য।

৩.৪.২ দেহাভ্যন্তরের পরজীবী (Internal Parasite):

পাখি/মুরগির দেহে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃপরজীবীর আক্রমণ নির্ভর করে পাখি/মুরগির পালন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধির ওপর। পাখি/মুরগির বাসস্থান যদি স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং পালন ব্যবস্থাপনা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, তাহলে এ ধরনের পরজীবীর আক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়। খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে সাধারনত পরজীবীর আক্রমণ খুব কম হয়। দেহাভ্যন্তরে পরজীবী আক্রমণের ফলে পাখি/মুরগির দেহে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় তা নিম্নরুপঃ

- কোষ বা কলার গঠন নষ্ট হয়ে যায়।
- পোষকের খাদ্য খেয়ে ফেলার কারণ পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।
- সংক্রামক রোগের জীবাণু ছড়ায়।
- খাদ্যনালি বন্ধ করে রাখে, ফলে আক্রান্ত পাখি মারা যায়।
- পরজীবী টক্সিন বা বিষ তৈরি করে যা পোষকের দেহের জন্য ক্ষতিকর।
- ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রজাতির দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্ত পরজীবীঃ

পরজীবী মুরগির দেহ আক্রান্ত করতে পারে। এগুলোর মধ্যে আমাদের দেশে মুরগির গোলকৃমি এবং ফিতাকৃমির আক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

৩.৪.২.১ বড় গোলকৃমি (Large Roundworm):

Ascardia galli (অ্যাসক্যারিডিয়া গ্যালি) হচ্ছে মুরগির বড় গোলকৃমি যা ক্ষুদ্রান্ত্রে আক্রান্ত করে ।

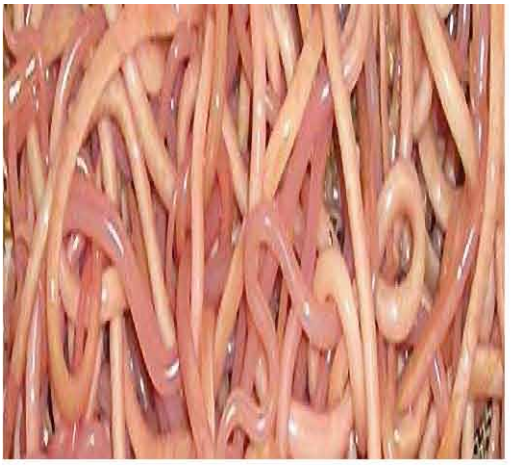

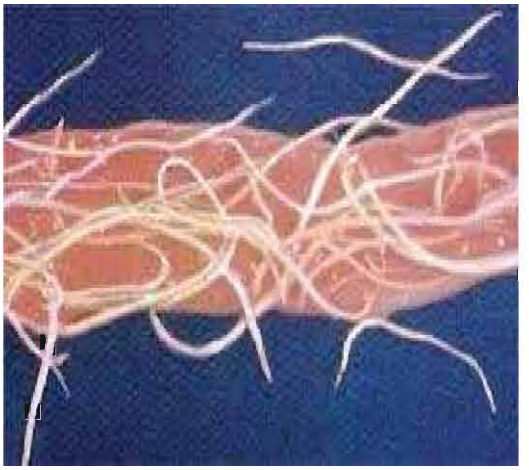

চিত্র: ৩.৩৩ অ্যাসক্যারিডিয়া গ্যালি(বড় গোলকৃমি)

জীবনচক্র:

পরিপক্ক স্ত্রী গোলকৃমি পাখির ক্ষুদ্রান্ত্রে ডিম পাড়ে। কৃমির ডিম মুরগির মলের সাথে বের হয়ে আসে। বাইরের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার ফলে ডিমের মধ্য লার্ভা জন্মায়। আস্তে আস্তে লার্ভা পরিপক্ক হয়। খাদ্য অথবা পানির সাথে পরিপক্ক লার্ভা মুরগির দেহে প্রবেশ করে । ২১ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপক্ক কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃমির বিস্তার

একটি পরিপক্ক স্ত্রী কৃমি কয়েক হাজার ডিম দেয়। লার্ভা সম্বলিত ডিমই হচ্ছে মারাত্বক। পরিবেশের মধ্যে কৃমির ডিম কয়েক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের ব্যবহৃত জামা, জুতো, খামারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ডিম এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়াতে পারে। এরপর খাদ্য বা পানির মাধ্যমে এগুলো মুরগির দেহে সংক্রমিত হয়।

বড় গোলকৃমি আক্রান্তের লক্ষণ

আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নবর্ণিত লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে। যেমন-

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা।
- খাদ্য কম খাওয়া।
- পালক উসকো খুশকো হয়ে যাওয়া।
- পাতলা পায়খানা হওয়া।
- শরীর রুগ্ন হওয়া এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।

চিকিৎসা:

পাইপারজিন গ্রুপের যে কোনো একটি কৃমিনাশক, যেমন- পাইপারজিন সাইট্রেট, পাইপারজিন অ্যাডিপেট বা পাইপারজিন ডাই-হাইড্রো-ক্লোরাইড খাদ্য বা পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে খালি পেটে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। কৃমিনাশক হিসেবে লেভামিজল ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ:

নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চললে মুরগিতে লোগকৃমির আক্রমণ হবে না। যথা-

- নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করাতে হবে।
- সব সময় মুরগিকে সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- বাসস্থানের লিটার সব সময় শুষ্ক রাকতে হবে।
- বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগির সাথে বয়স্ক মুরগি পালন করা যাবে না।
- ঘরে মুরগি পালনের পূর্বে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে বাসস্থান ও আশেপাশের এলাকা ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির সাথে যাতে মুরগির পায়খানা না লাগতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩.৪.২.২ ছোট গোলকৃমি (Small Roundworm):

মুরগির ছোট গোলকৃমির না হচ্ছে হেটারেকিস গ্যালিনেরাম। এদেরকে সিকাল কৃমিও বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কৃমি সাধারনত মুরগির খাদ্যনালির সিকাম নামক অংশে বাস করে ।

জীবনচক্র:

পায়খানার সাথে এ কৃমির ডিম বাইরে বের হয়ে আসে। বাইরের আবহাওয়ায় ডিম থেকে লার্ভা হয়। খাদ্য বা পানির সাথে মুরগির দেহে এ লার্ভা প্রবেশ করে । অতঃপর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে মুরগির সিকামে এরা পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃমির বিস্তার:

মানুষের ব্যবহৃত জামাকাপড়, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বন্য পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কৃমির ডিমের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও এ কৃমির ডিম সুস্থ মুরগিতে প্রবেশ করে ।

ছোট গোলকৃমি আক্রান্তের লক্ষণ

ছোট গোলকৃমি আক্রমণের ফলে মুরগির দেহে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তা হলো-

- বাদামি রঙের পাতলা পায়খানা হওয়া।
- ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।
- খাদ্য খাওয়া কমে যাওয়া।
- ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া।
- পালক এলোমেলো ও উসকো খুশকো হয়ে যাওয়া।

চিকিৎসা

পাইপারজিন গ্রুপের যেকোনো একটি কৃমিনাশক খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

এ কৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা বড় গোলকৃমি প্রতিরোধের মতোই।

৩.৪.২.৩ সুতাকৃমি:

মুরগির সুতাকৃমি হচ্ছে ক্যাপিলারিয়া গণের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েক প্রজাতির গোলকৃমি। এদেরকে চুলকৃমিও বলা হয়। ক্যাপিলারিয়া অ্যানুল্যাটা মুরগির খাদ্যনালি বা ইসোফেগাস ও খাদ্যথলি বা ক্রপে এবং ক্যাপিলারিয়া অব সিগন্যাটা ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। উভয় ধরনের কৃমির ডিমই মুরগির পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে। ডিমের মধ্যে লার্ভা জন্মায়। এর লার্ভা সম্বলিত ডিম কেঁচো খেয়ে ফেলে। কেঁচোর দেহের ভিতরে লার্ভা বৃদ্ধি লাভ করে। মুরগি যখন কেঁচো খায়, তখন কৃমির এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লার্ভা কেঁচোর দেহ থেকে মুরগির দেহে চলে আসে এবং পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

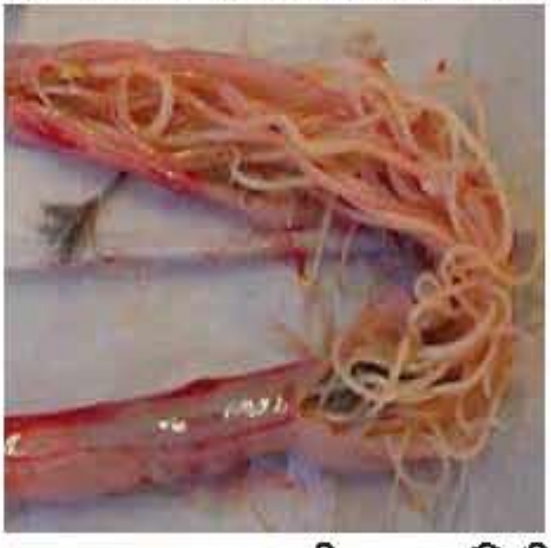

চিত্র: ৩.৩৪ ক্যাপিলারিয়া অ্যানুল্যাটা(সুতাকৃমি)

কৃমির বিস্তার:

মানুষের ব্যবহৃত জামাকাপড়, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বন্য পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কৃমির ডিমের বিস্তার ঘটে। খাদ্য অথবা পানির মাধ্যমেও সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

আক্রান্ত পাখির দেহে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা-

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- দৈহিক ওজন একেবারে কমে যায়।
- পালক উসকো খুশকো দেখায়।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- অবশেষে পাখি মারা যায়।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে আক্রান্ত পাখির চিকিৎসা করা যায়। যথা-

- পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় লেভামিজল মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- পাইপারজিন গ্রুপের কৃমিনাশকও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

সুতাকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্যান্য গোলকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতোই।

৩.৪.২.৪ ফিতাকৃমি (Tape Worm)

মুরগির মলের সাথে পরিণত বয়সের কৃমির অংশ বা সেগমেন্ট বের হয়ে আসে। কৃমির সেগমেন্টের মধ্যে ডিম থাকে। বিভিন্ন পোকামাকড়, যেমন শামুক, পিঁপড়া, মাছি ইত্যাদি কৃমির ডিম খেয়ে ফেলে। এদের দেহে ডিম থেকে কৃমির লার্ভা জন্মায়। মুরগি কৃমি আক্রান্ত শামুক, পিঁপড়া, মাছি ইত্যাদি খেয়ে ফেললে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

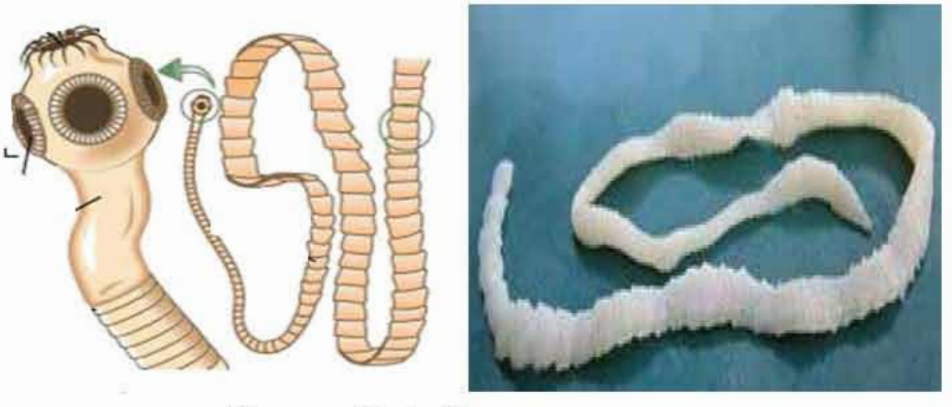

চিত্র: ৩.৩৫ ফিতা কৃমি

ফিতা কৃমির বিস্তার:

বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড়ের মাধ্যমে এদের বিস্তার ঘটে।

লক্ষণ

এ ধরনের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে পাখির দেহে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো-

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
- পালক উসকো খুশকো হয়ে যাওয়া।
- পাতলা পায়খানা হওয়া।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়া।

চিকিৎসা

নির্দিষ্ট মাত্রায় ডাইবিউটাইল-টিন-ডাইলাইউরেট পানি অথবা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে মুরগির দেহ থেকে ফিতাকৃমি সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে ফিতাকৃমির আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। যথা-

- মুরগির বাসস্থানে সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বাসস্থানের আশেপাশে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- মাঝে মধ্যে চিকিৎসার অর্ধেক মাত্রায় কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

৩.৪.৩ দেহের বহি:পরজীবী (External Parasite)

যেসব পরজীবী মুরগির দেহের বাইরের অংশ আক্রান্ত করে তাদেরকে বহিঃপরজীবী বা বহিঃদেহের পরজীবী বলে। যেমন-উকুন,আঠালি,মাইট এবং ফ্লি ইত্যাদি। এরা বেশির ক্ষেত্রেই মুরগির চামড়া এবং পালকের মধ্যে বসবাস করে । এ ধরনের পরজীবী পাখির দেহে কামড় দেয়,রক্ত শুষে নেয় এবং অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি করে । আমাদের দেশের গরম আবহাওয়া এদের আক্রমণের অনুকূলে। যেকোনো মুরগি পালনে এলাকায় এদের আক্রমণ দেখা যায়। খাঁচা বা লিটার যে পদ্ধতিতেই পালন করা হোক না কেন, এদের আক্রমণ সব জায়গায়ই বিরাজমান।

৩.৪.৩.১ উকুন (Lice)

এরা মুরগির বুক, পেট ও পাখার নিচের পালক ও ত্বকের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে। কামড়ানি ও শোষক এ দু'ধরণের উকুনের মধ্যে কামড়ানি উকুন মুরগিকে আক্রান্ত করে । উকুন তাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র মুরগির মধ্যেই সম্পন্ন করে । পাখির দেহ ছাড়া এরা ছয় ঘন্টার বেশি বাঁচতে পারে না। এরা মুরগির পালকের মধ্যে ডিম দেয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে উকুনের বাচ্চা হয় এবং পরবর্তীতে পরিপূর্ণ উকুনে পরিণত হয়।

চিত্রঃ ৩.৩৬ বিভিন্ন ধরনের উকুন

উকুনের আক্রমণের মুরগির দেহে যেসব লক্ষণঃ

ক) উকুন চামড়ার উপরের অংশে কামড় দেয়, তাই মুরগি ঠোঁট দিয়ে শরীরের মধ্যে চুলকায়।

খ) মুরগির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

গ) চামড়া নষ্ট হয়ে যায়

ঘ) মুরগি পালক খেয়ে ফেলে।

ঙ) ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ ও দমন

নিম্নলিখিতভাবে পাখিতে উকুনের আক্রমণ প্রতিরোধ ও দমন করা যায়। যথা-

ক) মুরগির ঘরে যাতে বন্য পাখি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

খ) মুরগির দেহে উকুন দেহে উকুন আছে কিনা তা প্রতিদিন যাচাই করতে হবে।

গ) সুস্থ মুরগির ঘরে উকুন আক্রান্ত মুরগি ঢুকতে দেয়া যাবে না।

ঘ) একই ব্যক্তিকে সুস্থ ও আক্রান্ত মুরগির ঘরে কাজ করতে দেয়া যাবে না।

ঙ) যে এলাকাতে প্রতিবছর উকুনের আক্রমণ দেখা দেয়, সে এলাকার মুরগির ঘরে মাঝে মধ্যে উকুননাশক স্প্রে করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

ম্যালাথিয়ন, কার্বারাইল, ফেনক্লোরোফস নামক কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানিতে বা বালিতে মিশিয়ে গোসল বা ধূলিস্নান করতে দিতে হবে।

৩.৪.৩.২ আঠালি

আঠালি মুরগির দেহে রক্ত শোষণ করে । রক্ত শোষণের পর দেহ থেকে নিচে নেমে আসে। পুরুষ আঠালি যৌন মিলনের পর মারা যায়। স্ত্রী আঠালি মুরগির ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ডিম দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। লার্ভা থেকে নিম্ফ এবং নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ আঠালি পরিণত হয়। রাতের বেলায় মুরগির দেহে বসে রক্ত শোষণ করে ।

চিত্র: ৩.৩৭ বিভিন্ন ধরনের আঠালি

আঠালি আক্রমণে মুরগির দেহে দেখা লক্ষণ:

১) আঠালি কর্তৃক মুরগির রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে মুরগি রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

২) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাঘাত ঘটে।

৩) বাচ্চা মুরগির সংখ্যা কমে যায়।

৪) মুরগির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

প্রতিরোধ ও দমন

মুরগির ঘর, ঘরের আশপাশ এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে শোধিত করতে হবে। আঠালি আক্রান্ত এলাকায় মাঝে মধ্যে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

চিকিৎসা:

ম্যালাথিয়ন, কার্বারিল, বেনজোরোফল নামক কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানিতে বা বালিতে মিশিয়ে গোসল বা ধূলিস্নান করতে দিতে হবে।

৩.৫ খামারের জৈব নিরাপত্তা (Farm biosecurity)

বর্তমান বিশ্বে খামার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। খামার স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে খামার পরিকল্পনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন, এমনকি ভোক্তার কাছে উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথা জীবাণুমুক্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবমুক্তভাবে সম্পন্ন করাই জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য:

- বহিরাগত রোগজীবাণুর যেমন: রাণীক্ষেত রোগ, বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগের কবল থেকে খামার রক্ষা করা।
- মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ ও জীবাণু যেমন- সালমোনেলা থেকে খামারকে রক্ষা করা।
- খামারের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমানো, লাভজনক উপায়ে খামার গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি কমানো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখলে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা যাবে

(Biosecurity measures can be strictly adhered to by paying attention to the following issues)

১. খামারের স্থান নির্বাচন:

- পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি করে ঘর তৈরি করতে হবে।
- চারিদিকে খোলা মেলা, প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সক্ষম এমন স্থান বেছে নিতে হবে।
- লোকালয় থেকে দূরে, কিন্তু খামারের পণ্য বিপণনের ভালো যোগাযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও শহর থেকে অনতি দূরে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে।

২. রোগ জীবাণুর উৎস ও প্রতিরোধের উপায় নির্বাচন:

- বাহক পাখি/মুরগি, বাইরে থেকে আমদানিকৃত জীবাণুবাহী ডিম ও ১ দিন বয়সের বাচ্চা, আক্রান্ত ডিম ও পাখি/মুরগি, মানুষের হাত পা ও পোশাকাদি, ধুলবালি, পালক, বিষ্ঠা, ও জৈব বর্জ্য, বন্যপাখি, শিকারি জীবজন্তু, ইঁদুর ইত্যাদি।
- দূষিত পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি।
- রোগ জীবাণু যুক্ত যন্ত্রপাতি যথা-ট্রাক, খাঁচা, ডিমের পাত্র ইত্যাদি।

রোগ বিস্তার প্রতিরোধের উপায়:

(ক) যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ-

- যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।
- সব ধরণের দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

- খামারের কর্মীদের খামারে ব্যবহৃত জুতা ও পোশাকাদি আলাদা রাখতে হবে এবং খামারের বাইরে বের করা যাবে না।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে ও পরে হাত পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে ও শরীরের বহিরাংশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- খামারের বন্য প্রাণি, পোষাপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- এক খামারে একই বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একটি ঘরে একই বয়সের মুরগি রাখতে হবে।

(খ) খামারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণঃ

- দর্শনার্থীদের জন্য একটি তথ্য বই সংরক্ষণ করতে হবে। খামার পরিদর্শনকারীর নাম-পরিচয়, সাক্ষাৎকারের তারিখ-সময় ইত্যাদি তথ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করে খামারের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারকর্মী ও খামার পরিদর্শনকারী বহিরাগত উভয়কেই কাজ করার সময় বা খামার পরিদর্শনের সময় জীবাণুমুক্ত জুতা ও পোশাকাদি পরিধান করতে হবে। খামার পরিদর্শন ও কাজের শেষে পুনরায় এদের জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
- উপকরণ সরবরাহকারী বাস/ট্রাক ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরও উপরোক্ত উপায়ে যথাসম্ভব জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে।
- বন্যপাখি নিয়ন্ত্রণের জন্য খামার ঘরের চারদিকে আলো বিকিরণকারী অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বেঁধে দিতে হবে।

গ) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতাঃ

- পোল্ট্রি খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অথবা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।
- প্রতিটি আলাদা শেডে ঢুকার পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে হাত-পা ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা অ্যাপ্রন, হাত পায়ের মোজা ও মাথার আবরণী ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে নিয়োজিক কর্মীবৃন্দ খামারে প্রবেশকারী যানবাহন, তাদের চালক ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মীবৃন্দের যেকোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন।
- ময়না তদন্ত করার জন্য বাতাসের অনুকুলে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে খামারে জীবাণু প্রবেশের কোনে সম্ভাবনা নেই। ময়না তদন্ত শেষে স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৩. নিয়মিত টিকা প্রয়োগঃ

খামারে মোরগ-মুরগিকে টিকা প্রয়োগের রোগ-মুক্ত রাখা একটি আধুনিক, জটিল ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আধুনিক কালে পোল্ট্রি শিল্পের সাফল্য সময়মত ও সফলভাবে টিকা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই টিকা প্রয়োগ কালে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করা বাঞ্ছনীয়।

টিকা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে-

- হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত স্বাস্থ্যকর্মীকে ১ দিন বয়সী বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে খামারিদের ধারণা দিতে হবে। মায়ের বা বাচ্চার শরীরের এন্টিবডি টাইটার লেভেল নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ্চার টিকা প্রদান কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হ্যাচারির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।
- সঠিকভাবে উৎপন্ন, সংরক্ষিত, পরিবাহিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- আমাদের দেশের স্থানীয় পর্যায়ে আক্রমণকারী জীবাণুর স্ট্রেইন সম্বন্ধে ভালোভাবে ধারণা নিয়ে সেই অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। অপরিচিত স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা প্রদান করলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণিভেদে টিকা প্রদানের সঠিক মাধ্যম অনুসারে টিকা প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবন্ত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে খাবার পানি, স্প্রে বা চোখে ফোঁটা প্রদানের মাধ্যমে ও মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুতকৃত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগিকে টিকা প্রয়োগ না করাই ভালো।
- টিকা প্রদানের পূর্বে ভিটামিন এ, ডি ও ই ব্যবহার করা ভালো।
- টিকা প্রদানের পর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম ব্যবহার করা ভালো।

৪. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ

- প্রতি সপ্তাহে মুরগির খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বা পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে।
- সঠিকভাবে আলো প্রদান করতে হবে।
- কোনোরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিয়মিত পরিচ্ছন্নতাঃ

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভজনক খামারের পূর্বশর্ত। তাই খামারের ভেতরের ও বাইরের চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। মেঝে বা লিটার পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে নতুন লিটার দেয়া ও ঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা উচিত। খামারের সকল যন্ত্রপাতি, যেমন- মুরগির খাঁচা, ডিম রাখার পাত্র, খাবার ও পানি পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বছরে অন্ততঃ একবার শেডসহ সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে অথবা ফিউমিগেশন করে পরিষ্কার করতে হবে। খামার পরিষ্কার রাখার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

- খামারে ব্যবহৃত পুরোনো লিটার যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণ কালে ব্যবহৃত লিটার দ্বারা কোনোভাবেই যেন খামারের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- সমস্ত ঘর ঝাড় দিতে হবে। খামারের প্রতিটি অংশ, যেমন- মেঝে, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব সহ অন্যান্য সরঞ্জাম, দরজা জানালার মাঝে থাকা ধুলাবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতি পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট বাল্বের জায়গায় নতুন বাল্ব লাগাতে হবে।
- শেডের ভিতরে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে ঘরের পিছন দিকে স্প্রে করা শুরু করে সামনের দিকে এসে শেষ করা উচিত। ঘরের ভেতরে প্রথমে ছাদ, পরে দেয়াল এবং সবশেষে মেঝেতে স্প্রে প্রয়োগ করার নিয়ম।
- শুকনো মেঝেতে অন্তত চার ইঞ্চি পুরু, শুষ্ক, শোষণক্ষম লিটার ছড়িয়ে দিতে হবে। লিটার হিসাবে ধানের তুষ সর্বোত্তম।
- লিটারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে কীটনাশক দেয়ালে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঘরের চারপাশে পর্দা হিসাবে পলিথিন বা নাইলনের বস্তা ব্যবহার না করে চটের বস্তা ব্যবহার করা উচিত। খাঁচা পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচ বাড়ন্ত মুরগি পালন শেষে সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি। লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্লক উঠানোর পূর্বে সমস্ত ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

৬. স্বাস্থ্য সম্মত ও আদর্শ খাদ্য প্রদান:

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন-সালমোনেলোসিস ও ছত্রাকজনিত যেমন-এসপারজিলোসিস, আফলা টক্সিকোসিস রোগের জীবাণু খামারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সত্যিকারের ভালো খাবার বলতে জীবাণুমুক্ত ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যকে বুঝায়।

৭. মুরগির ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা:

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসকারী জীবাণুনাশক অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রাতেই বেশি কার্যকর। বাতাসের তাপমাত্রা ৭০° ফা. এর উপরে এবং আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে থাকলে ফরমালডিহাইড গ্যাস সবচেয়ে কার্যকর।

ক) ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড দ্রবণ): ১ কন্টেইনার ক্লোরক্স দিয়ে ৮০ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি মুরগির ঘরের মেঝে, চালা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরক্স খুবই কার্যকরী।

খ) ভায়োডিন (আয়োডিন দ্রবণ): ১ বোতল ভায়োডিন ১০% সলিউশন দিয়ে ৫ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। গামবোরো ভাইরাস মারা, হাত পা জীবাণুমুক্ত এবং মুরগির জন্য আয়োজিন যৌগ ক্লোরক্স হতে উত্তম।

গ) চুন দিয়ে মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ১০০-২০০ মুরগি পালন উপযোগী একটি ঘরের মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২০ কেজি পাউডার চুন ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পানির পাত্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা:

১) পান করার জন্য মুরগির খামারে টিউবওয়েলের পানি অথবা বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকার সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত পানি অথবা ছাঁকা অথবা ১০০ লিটার পানির সাথে অন্তত: ৩০০ মি. গ্রা. ক্লোরিন পাউডার মিশ্রিত করে ৩-৬ ঘণ্টা সংরক্ষণ করার পর সেই পানি সরবরাহ করা উচিত।

২) শেডে মুরগি থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একবার বেকিং সোডা (সোডিয়াম বাই কার্ব) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ড্রিংকার, বাল্ব ও পাইপ লাইনে আঠালো বস্তু জমতে পারবে না। পানির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভিটামিন দেয়ার ঠিক পূর্বেই বেকিং সোডা মিশ্রিত পানি পরিচালনা করতে হবে। প্রতি গ্যালন মজুদ দ্রবণের সাথে এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিতে হবে।

৩) লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনে পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নতুন ব্যাচের ব্যবস্থাপনা:

পুনরায় মুরগি বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন-

১) সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ/সরবরাহ লাইন পরীক্ষা করতে হবে। মেরামতের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক ভাবে করতে হবে।

২) মুরগির খাঁচা, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) পানির পাত্র ও সরবরাহ লাইন প্রয়োজন মেরামত করতে হবে।

৪) থার্মোমিটার, থার্মোস্ট্যাট, গ্যাস ব্রুডার, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

৫) আগের ব্যাচের মুরগির বিষ্ঠা পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে অথবা কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে।

৬) মুরগির খাঁচা, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৭) টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্যসমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘন্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।

৮) দ্রব্যসমূহ ভালোভাবে শুকানোর পর নতুন বাচ্চা তুলতে হবে।

জব ০৫ঃ লেয়ার খামারে টিকাদান পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- টিকাদান সূচি সংগ্রহ করা
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাচামালের তালিকা তৈরি করা
- তালিকা মোতাবেক যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ করা
- টিকাদানের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- টিকা প্রদান সম্পন্ন করা
- টিকাদান পরবর্তী ধকল প্রশমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	তিন লেয়ার বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	বিসিআরডিভি	১০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
২	আরডিভি	১০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
৩	গামবোরো টিকা	৫০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
৪	মারেক্স টিকা	৫০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
৫	ফাউল পক্স টিকা	২০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
৬	ফাউল কলেরা টিকা	১০০ মাত্রার ভায়েল	১টি
৭	জীবাণু নাশক(আইয়োসান/লাইজল)	১০০ মিলি বোতল	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
৮	পাতিত পানি/ডায়লুয়েন্ট	১০০ মিলি বোতল	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
৯	বিকার	২৫০ মিলি	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সিরিঞ্জ	৫মিলি, ১০ মিলি	১টি করে
২	অটো ভেক্সিনেটর	০.২ মিলি হতে ১ মিলি পরিমাপযোগ্য	১টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করো।

২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান করো।

৩. টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে নাও।

৪. বিশ্বস্ত উৎস হতে টিকাবীজ সংগ্রহ করি।

৫. সূচি মোতাবেক সুস্থ বাচ্চার শেডে যাও।

৬. টিকা প্রদানের সময় হলে দিনের ঠান্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়লুয়েন্ট বা পাতিত পানির সাথে মিশ্রিত করো।

৭. এরপর বাচ্চা/মুরগিকে সঠিক ভাবে ধরে আয়ত্তে আন ও নিম্নলিখিত ভাবে টিকা প্রদান করো।

৭.১ বিসিআরডিডি টিকা প্রদান

ক) ১০০ মাত্রার ভায়াল ৬ মিলি পাতিত পানিতে মেশাও।

খ) প্রতি বাচ্চাকে ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোটা করে টিকা দাও।

গ) এই ভ্যাকসিন ৩-৭ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৫ দিন পর বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করো।

চিত্র: ৩.৩৮ বি সি আর ডি ডি টিকা

৭.২ আরডিডি টিকা প্রদান:

ক) ১০০ মাত্রার ভ্যাকসিন ১০০ মিলি পাতিত পানিতে মেশাও।

খ) ১ মিলি করে রানের মাংসে ইনজেকশন দাও।

গ) ২ মাস বয়সে ১ম বার এবং ৬ মাস পর পর এই টিকা প্রয়োগ করো।

চিত্র: ৩.৩৯ আরডিডি টিকা

৭.৩ গামবোরো রোগের টিকা প্রদান:

ক) টিকাবীজ প্রস্তুত কারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়ালুয়েন্টের সাথে মিশাও।

খ) ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোটা করে প্রয়োগ করো।

গ) সাধারণতঃ ৩-১১ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৮-২১ দিন বয়সে ২য় ডোজ প্রয়োগ করো।

চিত্র: ৩.৪০ গামবোরো রোগের টিকা

৭.৪ ফাউল পক্স রোগের টিকা প্রদান:

ক)১০০ মাত্রার ভায়াল ৩ মিলি পাতিত পানিতে মেশাও।

খ) পাখার নিচে পালক বিহীন স্থানে বাই ফর্ক নিডল দিয়ে রক্ত শিরার উপর প্রয়োগ কর ।

গ) যদি আশে পাশের খামারে এই রোগের প্রভাব বেশী দেখা দেয় তবে ১৫ দিন বয়সে পিজিয়ন পক্স টিকা দাও ।

ঘ) ৩২তম দিন বয়সে প্রথম বার এবং ১ বছর পর বুষ্টার ডোজ প্রয়োগ কর।

চিত্র: ৩.৪১ ফাউল পক্স রোগের টিকা

৭.৫ ফাউল কলেরা রোগের টিকা প্রদান

ক) এই ভ্যাকসিন ২.৫ মাস বয়সে ১ মিলি করে রানের মাংসে ইনজেকশন দাও ।

খ) প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়ার ১৫ দিন পর পুনরায় ১ মিলি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করো।

গ) তারপর ৬ মাস পরপর ১ মিলি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করো।

চিত্র: ৩.৪২ কলেরা রোগের টিকা

৮. টিকাদানকৃত বাচ্চাকে পৃথক রাখ।

৯. গরমকালে ১ঘন্টা ও শীতকালে ২ঘন্টার মধ্যে টিকাদান শেষ করো।

১০. অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুতে ফেল।

১১. পূণর্ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করো।

সতর্কতা:

- নির্দিষ্ট মাত্র বেশি/কম কোনো টিকা প্রদান করা যাবে না।
- দিনের ঠান্ডা অংশে এবং বড় খামারের ক্ষেত্রে রাতে টিকাদান সম্পন্ন করতে হবে।
- অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

ব্যবহারিক শেষে কাজ:

- ভাইরাল টিকা কত তাপমাত্রায় সংরক্ষন করবে তার একটি তালিকা তৈরী করা।
- টিকা প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়গুলোর তালিকা তৈরী করা

২০২৩

প্রশ্নমালা (নমুনা প্রশ্ন)

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাইরাস জনিত দুটি রোগের নাম লিখ ।
২. সংক্রামক রোগ কী?
৩. রাণীক্ষেত রোগের কারণ কী?
৪. গামবোরো রোগের কারণ কী?
৫. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ কী?
৬. সোলেন হেড ডিজিজ কাকে বলে?
৭. স্টার গেজিং কাকে বলে।
৮. কার্ল-টো-প্যারালাইসিস কাকে বলে?
৯. বুস্টার ডোজ কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ লেখ।
২. গামবোরো রোগের লক্ষণ লেখ।
৩. ওফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ লেখ।
৪. কলেরা রোগের লক্ষণ লেখ।
৫. মাইকোপ্লাজমা রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?
৬. আফলা টক্সিকোসিস রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি লেখ।
৭. রক্ত আমাশয় রোগ প্রতিরোধের উপায় লেখ।
৮. এ্যাসাইটিস রোগের লক্ষণ লেখ।
৯. ভিটামিন সি এর অভাব জনিত লক্ষণ লেখ।
১০. গোলকৃমি সংক্রমণ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. রাণীক্ষেত রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
২. গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৩. ইনফেকশাস করাইজা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা করো।
৫. লেয়ারের টিকাদান কর্মসূচি উল্লেখ কর।
৬. জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি এমন রোগ প্রতিরোধে গৃহীত প্রয়োজনীয় জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

ডিম উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন

Egg production,collection, storage and marketing

ডিম একটি আমিষ সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য। আমরা বিভিন্ন উৎস যেমন- মুরগি, হাঁস ও কোয়েল থেকে খাবার ডিম বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি। মুরগির ডিম সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। তাই মুরগির ডিম উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরেক্ষণ ও বিপণনের উপর এর সুফল নির্ভর করে। আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ডিম উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ এর সংগ্রহ, সংরেক্ষণ ও বিপণন অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তাই জনস্বাস্থ্যের জন্য আমিষ সমৃদ্ধ এ উপাদানটি সুষ্ঠ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ পোল্ট্রি কর্মীর প্রয়োজন। একজন দক্ষ পোল্ট্রি কর্মী এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে। তাই দক্ষ পোল্ট্রি কর্মী গড়ে তোলা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মুরগির ডিম খামারের নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদন ও সংগ্রহ করতে পারব
- খাবার ডিম স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গ্রেডিং করতে পারব
- হ্যাচিং ডিম বাছাই করতে পারব
- খাবার ডিম বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরেক্ষণ করতে পারব
- লেয়ার মুরগির ডিম বিপণন করতে পারব

৪.১ মুরগির ডিম উৎপাদন ও সংগ্রহ (Egg Production and collection)

লেয়ার খামারে ডিম উৎপাদনেই প্রধান লক্ষ। ডিম উৎপাদনকারী মুরগিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা হয়। লিটারে ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে ময়লা ডিম ও মেঝেতে পাড়া ডিম সংগ্রহ করা মুরগি পালনের জন্য একটি বড় বাধা। এছাড়া মেঝেতে ডিম পাড়ার কারণে মুরগির ফ্লকে ডিম খাওয়ার অভ্যাস এবং মলদ্বার ঠোকরানো অভ্যাস দেখা দিতে পারে। এর ফলে খামারের প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। যদি ডিমপাড়া মুরগির ঘরে সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বা সংখ্যায় ডিম পাড়া বাক্স স্থাপন করা যায়, তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব।

৪.১.১ লিটার পদ্ধতির ক্ষেত্রে (In the case of the Litter method):

(ক) ডিম পাড়ার বাসা স্থাপনঃ

লিটার পদ্ধতিতে প্রতি ৪-৫ টি মুরগির জন্য ১টি ডিম পাড়ার বাক্স বরাদ্দ করতে হবে, যার পরিমাপ হবে ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ×১৪ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) । মুরগির ঘরের এক পার্শ্বে অন্ধকারযুক্ত স্থানে (কম আলো) যেখানে মুরগিদের চলাফেরা কম এমন স্থানে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

চিত্র :৪.১ মুরগির ঘরে ডিম পাড়ার বাসা।

পুলেট মুরগির ডিম পাড়া শুরুর ৪-৫ সপ্তাহ পূর্বে লিটার ও মাচাতে পালিত মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত পরিমাপের বাসা স্থাপন করতে হবে। ফলে মুরগিগুলো ডিম পাড়া বাসার সাথে পরিচিত হবে।ডিম পাড়ার সময়ে মুরগিগুলো একটি নিরিবিলি জায়গা খোজে,যেখানে সে ঝামেলা ছাড়াই ডিম পাড়তে পারবে। যদি ডিম পাড়া বাসা ঝামেলামুক্ত ও আরামপ্রদ না হয় বা সংখ্যায় অপর্যাপ্ত পরিমাণ ও পরিমাপে সঠিক না হয় তাহলে মুরগিগুলো ঘরের ছায়াযুক্ত কোণায় বা খাবার পাত্র বা পানির পাত্রের নিচে

বসে ডিম পাড়ে। মেঝেতে ডিম পাড়ার সময় অন্য মুরগি তার ডিম্বনালির শেষ অংশ ঠোকর দিয়ে ডিম্বনালি বের করতে পারে। ডিম পাড়া অবস্থায় মুরগির মাথা বাইরের দিকে থাকবে।

(খ) ডিম পাড়ার বাসার আকর্ষণীয়তা:

ডিম পাড়া শুরু করার পূর্বে মুরগির ঘরে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করে বাক্সের মধ্যে শুকনো, নরম ও আরামদায়ক বিছানা তৈরি করতে হবে। তাতে মুরগির কাছে বাসাগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। আবার একইসাথে সব বাসায় খড়ের টুকরা দেওয়া উচিত না। বাসার ভেতর ডিম পাড়তে অভ্যস্ত করার জন্য পূর্ব থেকে কোনো সিদ্ধ ডিম বা কৃত্রিম ডিম রাখা যেতে পারে। রাতে বাক্সের দরজা বন্ধ রাখতে হবে ও সকালে দরজা খুলতে হবে।

(গ) মেঝেতে ডিম পাড়ার কারণসমূহ:

- সঠিক সময়ে মুরগির ঘরে ডিম পাড়া বাক্স স্থাপন না করলে।
- কম পরিমাণে ডিম পাড়া বাসা স্থাপন করলে।
- ডিম পাড়া বাসার পরিমাপ সঠিক না হলে।
- বাসা ঘরের নির্জন শান্ত ছায়াযুক্ত স্থানে না হলে।
- বাসা যথেষ্ট গভীর ও আরামপ্রদ না হলে।
- ডিম পাড়ার বাসায় ব্যবহৃত লিটার দ্রব্যের ত্রুটি থাকলে।
- ডিম পাড়ার বাসার ধরন সঠিক না হলে।
- খাদ্য প্রদান সময়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঝেতে ডিম পাড়ার অভ্যাস কমানো যায়।

৪.১.২ ডিম পাড়া বাক্স বা বাসা

দুই ধরনের হয়, যথা-

(ক) পৃথক বা একক বাক্স:

- ভারী জাতের ক্ষেত্রে ১৪ইঞ্চি×১০ইঞ্চি×১৪ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) এবং হালকা জাতের ক্ষেত্রে ১২ইঞ্চি×১২ইঞ্চি×১৪ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মাপের ১ টি বাক্সেই ৪-৫ টি মুরগি ডিম পাড়ার জন্য যথেষ্ট।
- তবে ডিম পাড়া একক বাক্স বহুতল বিশিষ্ট করা যায়, সেক্ষেত্রে বাক্সের সামনে সমান্তরাল সিঁড়ি দিতে হয়।
- একক বাসা পাশাপাশি স্থাপন করা যায়।
- বাসা কাঠ বা আয়রন শিট দিয়ে তৈরি করা যায়।
- বাসার উপরিভাগে ঢালু থাকে, ফলে মুরগি বসে পায়খানা করে নোংরা করতে পারে না।
- বাসার সামনে মুরগির দাঁড়ানোর প্লাটফরম থাকে। রাত্রে প্লাটফরম ভাঁজ করে বাসায় ঢোকার রাস্তা বন্ধ করা যায়।

- রাত্রে বাসার ভেতর মুরগি বসতে পারলে ত্রুটি হতে পারে এবং পায়খানার করে নোংরা করতে পারে।
- ঘরের নির্জন ছায়াযুক্ত, ঠান্ডা ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল সম্পন্ন জায়গায় বাসা দিতে হবে। প্রয়োজনে বাসাগুলো সরানো যাবে।

চিত্র:৪.২ ডিম পাড়ার বাক্স

খ) দলভিত্তিক বাক্স

- বড় বাণিজ্যিক খামারে এই ধরণের বাক্স ব্যবহৃত হয়। ৫০টি ডিমপাড়া মুরগির জন্য ৬০ইঞ্চি× ২৪ইঞ্চি× ২৪ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য× প্রস্থ × উচ্চতা) মাপের ১টি দলভিত্তিক বাক্সই যথেষ্ট।
- বাসার ভেতর এককভাবে ডিম পাড়ার জন্য কোনো পার্টিশন থাকে না।
- এই বাসার উভয় প্রান্তে মুরগি ঢোকার পথ থাকে।
- ডিম সংগ্রহের জন্য স্লাইডিং দরজা থাকে।

গ) রোল ওয়ে বাসা:

- মুরগির খাঁচার মেঝের সামনে ঢালু তৈরি করা হয়।
- খাঁচার মেঝের উপর ডিম পাড়লে গড়িয়ে খাচার বাইরে চলে আসে।
- খাঁচার বাইরে ডিম জমা হওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- যান্ত্রিকভাবে ডিম সংগ্রহের জন্য ২ সারিতে খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- উভয় সারির নিজ দিয়ে কনভেয়র বেল্ট থাকে।
- ডিম গড়িয়ে এই বেল্টের উপর পড়লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিম সংগ্রহ ঘরে চলে যায়।

৪.১.৩ খাঁচা হতে ডিম সংগ্রহ (Collect eggs from the cage)

- খাঁচায় লেয়ার পালন করলে ডিম পাড়ার জন্য আলাদা কোনো বাক্সের প্রয়োজন হয় না।
- মুরগি খাঁচায় মেঝেতেই ডিম পাড়ে। খাঁচার তল বা মেঝে এমনভাবে তৈরি করা থাকে যেন ডিম পাড়ার সাথে সাথেই গড়িয়ে সামনের দিকে চলে আসে।
- ডিম গড়িয়ে আসার পর জমা হওয়ার জন্য খাঁচার সামনের দিকে বাড়তি তলের ধার বা কোনো উপরের দিকে বাঁকা করা থাকে। বাঁকা করা স্থানে এসে ডিম স্থির হয়। মুরগি এই ডিমের নাগাল পায় না।
- লিটার পদ্ধতির মতই দিনে ২-৩ বার ডিম সংগ্রহ করে ট্রেতে রাখতে হয়।
- এক্ষেত্রে ডিম পরিষ্কার থাকে ।
- ডিম জমা হওয়ার স্থানে নরম প্যাড ব্যবহার করলে ডিমে ফাটল সৃষ্টি হয় না।

অটোমেটিক বেল্টের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে ডিম সংগ্রহ করা যায়। সেক্ষেত্রে ডিম গড়িয়ে এসে বেল্টের উপর পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর বেল্ট ঘুরতে থাকে এবং ডিম নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয়।

৪.১.৪ ডিম উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ (Factors affecting eggproduction)

মুরগির ডিম উৎপাদনের সাথে বা ডিম উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. খাদ্যঃ

খাদ্য উপাদানে পরিবর্তন ঘটলে, যেমন- খাদ্যে গম বা ভুট্টা প্রদান না করলে অথবা নতুন কোনো উপাদান হঠাৎ বেশি দিলে, খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে যেমন, ম্যাশ খাবারের পরিবর্তে পিলেট খাবার প্রদান করলে, খাদ্য প্রদানের সময় পরিবর্তন করলে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

২. খাদ্যমানঃ

খাদ্যের গুণাগুণ ভালো না হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যে সব উপাদান না থাকলে এবং খাদ্যে কোনো দোষ দেখা দিলে আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

৩. পানিঃ

পর্যাপ্ত পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ থাকলে ডিম উৎপাদন কমে যায়।

৪. মেঝের জায়গা:

ঘরে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা কম থাকলে, মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে বা গাদাগাদি হলে বা ঠোকরা-ঠুকরি করলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. তাপমাত্রা:

অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা মুরগি সহ্য করতে পারে না। ঘরের তাপমাত্রা ৫০° ফা. এর কম বা ৮০° ফা. এর বেশি হলে ডিম উৎপাদন হঠাৎ কমে যেতে পারে বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুরগি সাধারণত ৭০° ফা. তাপমাত্রায় কাম্য হারে ডিম পাড়ে।

৬. উত্তেজনা ও ভয়:

মুরগি হঠাৎ স্থান পরিবর্তন করলে, এক ফার্ম থেকে অন্য ফার্মে নিলে, এমনকি এক ফার্মে অভ্যন্তরে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিলে, নতুন কোনো অতিথি দর্শনার্থী বা একসঙ্গে বেশি লোক, বন্য জীব জন্তু বা যানবাহন, অস্বাভাবিক শব্দ ইত্যাদি হতে আতঙ্কিত হয় বা ভয় পায়। ফলে ডিম উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৭. কুঁচে ভাব ও পালক বদলানো:

মুরগির মধ্যে কুঁচে ভাব দেখা দিলে বা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পালক বদলালে উৎপাদন কমে যায়। পালক বদলানোর শুরুতে পালক বদলানো বন্ধ করার জন্য উচ্চ আমিষ যুক্ত খাদ্য প্রদান করতে হবে।

৮. রোগ-ব্যাধি:

মুরগির ঝাঁকে কোনো রোগব্যাধি দেখা দিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায়। মুরগির মধ্যে কৃমি থাকলে এবং উকুন, মাইট ও টিকের আক্রমণ হলে এদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং উৎপাদন কমে যায়। ককসিডিওসিস, রাণীক্ষেত, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস, এগড্রপ সিনড্রম ইত্যাদি রোগ হলে ডিমের সংখ্যা কমে যায়।

৯. বংশগত দোষ:

বংশগতভাবে কোনো কোনো মুরগির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দোষত্রুটি থাকতে পারে। যেমন- কিছু মুরগি ২-৩ দিন পর পর ডিম দেয়। আবার কিছু মুরগি আছে দীর্ঘদিন পর পর ডিম দেয়।

১০. আলো নিয়ন্ত্রণ:

ডিমপাড়া মুরগির ঘরে ১৬ ঘণ্টা আলো প্রদানের পরিবর্তে কম আলো প্রদান করলে ডিম উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

১১. মুরগির বয়স:

সাধারণত ১৯-২০ সপ্তাহ বয়সে মুরগি ডিম দিতে শুরু করে এবং ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত একটানা গড়ে ৭৫-৮৫% ডিম দিয়ে থাকে। মুরগির বযস বেশি হলে ডিম উৎপাদন কমে যায়।

১২. ঋতু পরিবর্তন:

শীতকাল খামার মালিকদের জন্য অধিক লাভের জন্য উপযুক্ত সময়। গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে মুরগি অধিক ডিম দিয়ে থাকে।

১৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:

খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো মেনে না চললে বা সার্বিক পরিচ্ছন্নতার অভাব ঘটলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

১৪. ডিম পাড়া বাক্স:

ডিমপাড়া বাক্স যদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় না থাকে তবে মুরগির ডিম উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এবং মেঝেতে ডিমপাড়ার হার বেড়ে যাবে।

১৫. খাবারের পরিমাণ:

খাবারের পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে ফ্যাটি লিভার সিন্ড্রম দেখা যায়। ফলে ডিমের সংখ্যা প্রচন্ডভাবে কমে যায়। খাবারের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলেও ডিমের সংখ্যা কমে যাবে। খাবারের পরিমাণ সঠিকভাবে দিলে এবং প্রোটিনের ভাগ যদি ঠিক থাকে তাহলে ডিমের সংখ্যা আবার বেড়ে যাবে।

১৬. মুরগির দেহে হরমোনের অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যায়।

৪.১.৫ ডিমের অস্বাভাবিকতা (Egg abnormalities):

মুরগির ডিম সব সময় একই আকার আকৃতির হয় না। ভিতর ও বাইরের গঠনে কিছু পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। যেমন-

(১) দ্বিকুসুম ডিম:

একটি ডিমের মধ্যে ২টি কুসুম থাকে, ফলে ডিমটি আকারে অনেকটা বড় হয়। এই ডিম ফুটানো যায় না।

(২) রক্ত ছিটা ডিম:

ডিম্বাশয় বা ডিম্বনালিতে রক্তক্ষরণের ফলে ডিমের মধ্যে বিভিন্ন অংশে অনেক সময় কিছুটা জমাট রক্ত দেখা যায়। এ ডিম খেলে ক্ষতি নেই।

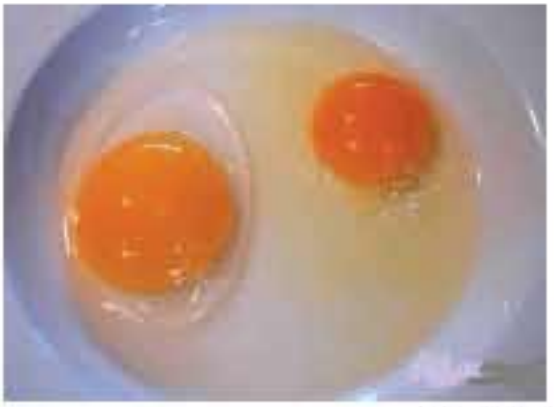

চিত্র:৪.৩ রক্ত ছিটা ডিম

(৩) চাম ডিম /খোসা বিহীন ডিম:

খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব বা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত সঠিক না থাকলে পর্দার মতো পাতলা খোসাযুক্ত ডিম হতে পারে। এছাড়া প্রথম দিকে পাড়া ডিম বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পাড়া ডিমের খোসা পাতলা হতে পারে।

চিত্র: ৪.৪ চাম ডিম

(৪) কুসুমবিহীন ছোট ডিম:

শরীরের কোনো পদার্থ বা জমাট রক্ত যদি কোনো কারণে ডিমনালির ভিতর প্রবেশ করে এবং এটি যদি কুসুমের মতই ডিমনালির বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে চলে আসে, তাহলে ঐ পদার্থটি ঘিরে ডিমের অন্য সব অংশ তৈরি হবে। কুসুমবিহীন এরূপ ডিমে কুসুমের পরিবর্তে অন্য জিনিস দেখা যায় এবং ডিমটি আকারেও কিছুটা ছোট হয়।

(৫) ডিমের ভেতর ডিম:

যদি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম কোনো কারণে ডিমনালিতে শেষ প্রান্ত থেকে পুনরায় প্রথম প্রান্তে যায় এবং আগের মত শেষ প্রান্তে নামতে থাকে, তবে ঐ ডিমের উপর ডিমনালি হতে ডিমের সাদা অংশ, খোসা ইত্যাদি সৃষ্টি হবে। ফলে ডিমের মধ্যে ডিম দেখা দিবে।

চিত্র: ৪.৫ডিমের ভেতর ডিম ও শ্বেত কুসুম ডিম

(৬) শ্বেত কুসুম ডিম:

মুরগির রক্তশূন্যতা বা রক্তস্বল্পতা বা মুরগি রোগাক্রান্ত হলে ডিমের কুসুম হলদে না হয়ে সাদা হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খাদ্যে হলুদ রং সৃষ্টিকারী খাদ্যোপাদানের অভাব হলে ডিমের রং সাদা হয়।

৪.১.৬ খামার থেকে দৈনিক ডিম সংগ্রহ

- শীতের সময় সকাল ১০-১১ টা ও বিকাল ৪.০০-৪.৩০ টার সময় ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
- গরমের সময় সকাল-বিকাল ছাড়াও দুপুরে আরও একবার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
- ডিম সংগ্রহের সময় বাক্সে ১টি ডিম রাখতে হয়।
- সন্ধ্যাবেলা বাসায় কোনো ডিম না রেখে সকালে বাসার দরজা খোলার সময় একটি করে ডিম রাখা যায়।
- ডিম পাড়ার প্রাথমিক অবস্থায় মুরগিগুলো মেঝেতে ডিম পাড়লে তা প্রতি ১ ঘন্টা পর পর সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐ মুরগিগুলোকে চিহ্নিত করে ডিম পাড়ার বাক্সে তুলে দিয়ে বাক্সে ডিম পাড়ার অভ্যাস করাতে হবে।

৪.২ ডিমের গ্রেডিং (Egg grading)

৪.২.১ ডিমের প্রাথমিক শ্রেণী বিন্যাস

ডিমকে প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা:

(ক) ফোটানোর জন্য ডিম (Hatching eggs)

(খ) খাবার ডিম (Table eggs)

(ক) ফোটানোর জন্য ডিম:

এ ধরনের ডিম উৎপাদন করতে হলে প্রতি ৮-১০ টি মুরগির জন্য ১টি করে সুস্থ প্রজনন সক্ষম মোরগ থাকতে হবে। মোরগ ও মুরগির যৌন ক্রিয়ার ৭ দিন পর থেকে বাচ্চা ফোটানোর ডিম সংগ্রহ করতে হবে। মোরগের উপস্থিতিই মূল কথা নয় মুরগির সাথে যৌন সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মোরগ ছাড়া উৎপাদিত ডিম অনুর্বর।

(খ) খাবারের জন্য ডিম:

বাণিজ্যিক মুরগির খামারে যে ডিম উৎপাদন করা হয় সেগুলো অনুর্বর ডিম। এ সব ডিম পাড়া মুরগির সাথে মোরগ থাকে না। অনুর্বর ডিম সহজে নষ্ট হয় না। ভোক্তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক খামারগুলো ডিম উৎপাদন করে থাকে। এ চাহিদা ডিমের আকার, ডিমের রং, ডিমের খোসার গড়ন, কুসুমের রংয়ের উপর নির্ভরশীল। অনেকে সাদা খোসাযুক্ত বিশেষ করে গবেষণা কাজের জন্য আবার সাধরণ ভোক্তারা বাদামি খোসাযুক্ত ডিম পছন্দ করে। অনেকের পছন্দ হলুদ বা কমলা রং এর কুসুম। ডিমের কুসুমকে হলুদ করার জন্য খাদ্যের সাথে ভূট্টা ব্যবহার করলে ডিমের কুসুম হলুদ হয়।

৪.২.২ ডিমের ওজন, আকার ও খোসার গঠনের প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস- যথা: গ্রেডিং

ক্রমিক নং	গ্রেড	ডিমের ওজন	ডিমের বিবরণ
১	গ্রেড এ এ	৬০ গ্রাম বা এর চেয়ে বেশি	অতিরিক্ত বড় ডিম
২	গ্রেড এ	৫৬-৫৯ গ্রাম	বড় ডিম
৩	গ্রেড-বি	৫০ - ৫৬ গ্রাম	মাঝারি আকারের ডিম
৪	গ্রেড-সি	ডিম কোনো নির্দিষ্ট ওজন বা আকারের হয় না	বাতিল ডিম

টেবিল: ৪.০১

১) গ্রেড এ এ- অতিরিক্ত বড় ডিমঃ

এ শ্রেণির ডিমের ওজন ৬০ গ্রাম বা এর চেয়ে বেশি হয়। ডিমের খোসা হবে সুগঠিত মসৃণ, সমতল ও মাঝারি, টেকসই। সাধারণত বাণিজ্যিক হাইব্রীড জাতের ডিম আবরণে কোনো প্রকার ফাটল থাকে না। বাজারে এ জাতের ডিমের চাহিদা বেশি এবং অধিক দামে বিক্রি হয়।

২) গ্রেড এ - বড় ডিম:

এ শ্রেণির ডিমের ওজন ৫৬-৫৯ গ্রাম পর্যন্ত হয়। ডিমের খোসা সুগঠিত, মসৃণ, সমতল ও মাঝারি, হয়। এ ডিমের খোসায় কোনো ফাটল থাকে না বা ডিমের খোসা খুব শক্ত ও মোটা হবে না।

৩) গ্রেড বি -মাঝারি আকারের ডিম:

এ শ্রেণির ডিমের ওজন ৫০ থেকে ৫৬ গ্রাম পর্যন্ত হয়। ডিমের আকার সুগঠিত। খোসা মসৃণ সমতল ও মাঝারি টেকসইয়ের হয়। এ ডিমের খোসায় কোনো ফাটল থাকে না। ডিমের খোসা খুব শক্ত বা মোটা হবে না।

৪ গ্রেড-সি - বাতিলকৃত ডিম:

যে সমস্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর অনুপযুক্ত বলে বাতিল করা হয় অথবা খাবার ডিম হিসেবে পৃথক করার পর অবশিষ্ট থাকে সেগুলো এ শ্রেণিভুক্ত। ডিমের খোসা ময়লাযুক্ত থাকে, ডিমের খোসায় ফাটল থাকতে পারে। এ শ্রেণিভুক্ত ডিম কোনো নির্দিষ্ট ওজন বা আকারের হয় না। বাজারে এ ডিমের দাম কম।

৪.২.৩ বিভিন্ন প্রজাতির ডিমের খোসার বর্ণের উপর শ্রেণী বিভাগ (Classification of Egg on the shell color of different species):

মুরগির ডিম	বাদামী, চকের মত সাদা
হাঁসে ডিম	চকচকে সাদা,সাদাটে, নীল (ক্রীমের মত)
কোয়েল ডিম	ধূসর ও কালো ছোপ

টেবিল: ৪.০২

৪.২.৪ খাবার ডিমের গ্রেডিং (Grading of Edible Egg)

ওজনের ভিত্তিতে ডিমের গ্রেডিং:

গ্রেড	ডিমের ওজন
বিশেষ গ্রেড বা অতিরিক্ত বড় ডিম	৬০ গ্রাম+
গ্রেড -এ	৫৬-৫৯ গ্রাম
গ্রেড - বি	৫০-৫৪ গ্রাম
গ্রেড -সি	৫০গ্রাম এর নীচে ও বাতিলকৃত ডিম

টেবিল: ৪.০৩

৪.২.৫ উন্নত দেশে বা আন্তর্জাতিক ডিমের গ্রেডিং
(Grading of eggs in developed countries or international)

গ্রেড	ডিমের ওজন
জাম্বো	৭৫ গ্রাম+
অতিবড়	৬৫-৭৪ গ্রাম
মাঝারী	৫৫-৬৪ গ্রাম
ছোট	৪৫-৫৪ গ্রাম
পিউই	৪৫ গ্রাম এর নীচে

টেবিল: ৪.০৪

চিত্র:৪.৬ উন্নত দেশে বা আন্তর্জাতিক ডিমের গ্রেডিং

৪.৩ হ্যাচিং ডিম বাছাই ও সংরক্ষণ (Sorting and preserving hatching eggs)

ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ডিম ফোটানো বা ইংরেজীতে হ্যাচিং বলে। তাই ফোটানোর ডিম উৎপাদন করার পরের ধাপই হচ্ছে ডিম ফোটানোর পর্ব। নিষিক্ত ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন প্রকৃতির এক বিশেষ অবদান। স্তন্যপায়ী প্রাণির ক্ষেত্রে বাচ্চা যেমন মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠে ঠিক তেমনি পোল্ট্রি ক্ষেত্রে এরা বেড়ে ওঠে ডিমের ভেতরে। এ পর্বে উৎপাদিত ফোটানোর ডিম বাছাই করতে হয় এবং এদের যত্ন নিতে হয়। ডিম দু'ভাবে ফোটানো যায়। যেমন- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে। তবে, যেভাবেই ডিম ফোটানো হোক না কেন উভয় পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটতে একই সময় লাগবে। অল্প সংখ্যক বাচ্চা ফোটানোর জন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতি সুবিধাজনক হলেও বাণিজ্যিকভিত্তিতে পোল্ট্রি থেকে বাচ্চা ফোটাতে হলে কৃত্রিম পদ্ধতি সর্বোত্তম। এক সঙ্গে বেশি বাচ্চা ফোটাতে হলে কৃত্রিম পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। কৃত্রিম পদ্ধতিতে যেখানে ডিম ফোটানো হয় তা হ্যাচারি নামে পরিচিত। হ্যাচারিতে ভালো মানের অধিক সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন করতে হলে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

৪.৩.১. হ্যাচিং ডিম বাছাইয়ের বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Considerations for hatching egg selection):

সব ডিম থেকেই বাচ্চা ফুটবে না। শুধু নিষিক্ত ডিম থেকেই বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব। তাই ফোটানোর জন্য সর্বপ্রথম নিষিক্ত ডিম বাছাই করতে হবে। যে সব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ফোটানোর ডিম বাছাই করতে হয় তা এখানে বিবৃত হলো-

ডিমের আকার:

বাচ্চার আকার ডিমের আকারের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। খুব বড় বা খুব ছোট আকারের ডিম ফোটানোর জন্য বাছাই করা উচিত নয়। এ ধরনের ডিম সেটিং ট্রেতে বসাতে অসুবিধা হয় এবং ভালোভাবে ডিম ফোটেও না।

চিত্র: ৪.৭ লিগহর্ন প্রজাতি ও জাতের মাঝারি আকারের ডিম

প্রজাতি ও জাতভেদে ডিম বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তবে সবসময় নির্দিষ্ট প্রজাতি ও জাতের মাঝারি আকারের ডিম ফোটানোর জন্য বাছাই করা উচিত।

ডিমের আকৃতি:

সব সময় ডিম্বাকৃতির ডিম ফোটানোর জন্য বাছাই করা উচিত। লম্বাটে বা গোলাকার ডিম ফোটানোর জন্য ভালো নয়।

পাতলা খোসা:

পাতলা খোসার ডিম বাছাই করা উচিত নয়। পাতলা খোসার ডিম মুরগির নিচে অথবা ইনকিউবেটরে বসালে খোসা ভেঙ্গে ডিমের ভেতরের অংশ অন্যান্য ডিমের খোসার উপর ছড়িয়ে পড়বে। এতে করে অন্যান্য ভালো ডিমের খোসার উপর আবরণ পড়ে বাচ্চা উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।

ডিম সংরক্ষণ:

গ্রীষ্মকালে ৩-৫ দিন এবং শীতকালে ৭-১০ দিনের বেশি বাচ্চা ফোটানোর ডিম সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

ডিমের খোসার রঙ:

যে জাত বা উপজাতের মুরগি যে রঙের ডিম পাড়ে হ্যাচিং এর জন্য সে রঙের খোসার ডিমই বসানো উচিত।

খোসার মসৃণতা:

সাধারণত সুষম খাদ্যের অভাবেই ডিমের খোসার মসৃণতা নষ্ট হয়ে থাকে। যে খাদ্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম অথবা ভিটামিন ডি এর অভাব থাকে সে ধরণের খাদ্য ডিমপাড়া মুরগিকে খাওয়ানো উচিত নয়। এ ছাড়া যে সব ডিমের খোসা বেশি খসখসে সেগুলো ভালো ফোটে না। কাজেই শক্ত ও মসৃণ খোসা দেখে ডিম বসানো ভালো।

ফাটা ডিম:

ডিমের খোসা যাতে ফাটা না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণত ফাটা কিংবা ভাঙ্গা খোসা বিশিষ্ট ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে না। দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে ডিম সংগ্রহ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে ইনকিউবেটরে না বসিয়ে কিছু সময় রাখার পর বসাতে হয়।

ময়লাযুক্ত ডিম:

বাচ্চা ফোটানোর জন্য ময়লাযুক্ত ডিম বাছাই করা উচিত নয়।

ডিমের ভেতরের গুণাবলী:

আলোর সাহায্যে ডিমের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করলে যদি কোনো ডিমের ভেতর রক্তের দাগ অথবা ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুম ঘোলাটে দেখা যায় তাহলে সে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না।

ঋতুর প্রভাব:

ডিমের উর্বরতা ঋতু পরিবর্তনের সাথে বদলে যায়। যেমন- বসন্তকালে ডিমের উর্বরতা বেশি ও গ্রীষ্মকালে কম।

রোগমুক্ত মুরগি:

ডিমের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় রোগ বিস্তার লাভ করে। পুলোরাম, মুরগির টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত মুরগির ডিম ফোটানোর জন্য বাছাই করা উচিত নয়।

ডিমপাড়া মুরগির পুষ্টি:

ভ্রুণের বৃদ্ধি ডিমের ভেতরের পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। সে জন্য ডিমপাড়া মুরগিকে সুষম খাদ্য দিতে হয়। সুষম খাদ্য না দিলেও মুরগি ডিম পাড়বে তবে সে ডিম থেকে যে বাচ্চা হবে তার বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না। একইভাবে সুষম খাদ্যের অভাবে মোরগের শুক্রাণু উৎপাদন কমে যাবে। উর্বরতা ও স্ফুটনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিডিং ফ্লকে ব্যবহৃত মোরগকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষজাতীয় খাবার দেয়া প্রয়োজন।

মুরগির বয়স:

ভালো ডিম পেতে হলে মুরগির বয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মুরগি ডিম দিতে শুরু করার ৩-৪ সপ্তাহ পরে প্রাপ্ত ডিমের স্ফুটনক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। মুরগির বয়স খুব বেশি বাড়ার সাথে সাথে পরবর্তী বছরগুলোতে ডিমের ফুটন ক্ষমতা কমতে থাকে। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত মুরগির বাসস্থান স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক হতে হবে। বাসস্থানের বাহির ও ভেতর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং তা মুক্ত আলোবাতাস চলাচলের উপযোগী করতে হবে।

মোরগ ও মুরগির মিলনের পর যে ডিম পাওয়া যায় তা সাধারণভাবে উর্বর বলে ধরা হয়।

হ্যাচিং ডিমের উৎস:

যে সমস্ত ফার্ম বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে সঠিক অনুপাতে মোরগ- মুরগীর মিলন ঘটিয়ে উর্বর ডিম উৎপাদন করে সে সমস্ত ফার্মই হল হ্যাচিং ডিমের উৎস। এ সমস্ত ফার্মকে ব্রিডিং/প্রজনন ফার্ম বলা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি পর্যায়ে মীরপুরে কেন্দ্রিয় পোল্ট্রি প্রজনন খামার আছে। এছাড়াও বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি প্রজনন খামার রয়েছে।

৪.৩.২ ফোটানোর ডিম সংরক্ষণ (Preservation of hatching eggs):

মুরগির ঘর থেকে ট্রে বা ঝুড়িতে করে ডিম সংগ্রহ করার পর ডিমগুলো পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে শুষ্ক অবস্থায় অথবা ঈষৎ গরম পানির সাহায্যে ডিম পরিষ্কার করা যায়। এর সাথে সাথেই জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে ডিমের খোসার পানি শুকিয়ে নিতে হবে। হঠাৎ ঠান্ডা বা গরমে ডিমের ক্ষতি হতে পারে। সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে। অসুস্থ বা স্বাস্থ্যহীন মুরগির ডিম ফোটানো উচিত নয়।

সংরক্ষণের নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে ডিম সংরক্ষণ করতে হয়, কারণ ময়লা লাগলে ডিমের খোসার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং ভ্রুণের শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়।

২. ডিম সাধারণত ১০-১৫.৬ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ডিম কখনও অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশে রাখা ঠিক নয়। বড় বড় হ্যাচারিতে ডিম সংরক্ষণ করতে হলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ব্যবহার করা উচিত। গ্রামে ডিম সংরক্ষণের জন্য ঠান্ডা ছায়াযুক্ত স্থান ব্যবহার করা উচিত।

৩. ৬০-৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা ডিম সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। ঘরের ভিতরে পানির পাত্র বসিয়ে বা ভিজা চট দিয়ে ঘরের আর্দ্রতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় । যদি ঘরের আর্দ্রতা অনেক কম হয় তবে ডিমে বাষ্পীভবন হবে, ফলে বায়ুকোষ আকারে বড় হবে এবং হ্যাচাবিলিটি কমে যাবে।

৪. ডিম সংরক্ষণের সময় ডিমের মোটা অংশের উপরের দিকে রাখতে হয়।

৫. ডিম গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন এবং শীতকালে ৭-১০ দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যায় না। বেশি দিন ডিম সংরক্ষণ করলে ডিম হতে পানি বেরিয়ে বায়ুকোষ বেশি বড় হয়, ফলে সেই ডিম ফোটে না ।

৬. ডিম ৭(সাত) দিনের বেশি সংরক্ষণ করলে দিনে ৩-৪ বার উল্টিয়ে দেয়া ভালো।

৪.৪ খাবার ডিম সংরক্ষণ ও বিপণন (Table Egg storage And Marketing)

চিত্র: ৪.৮ প্যাকেটে ডিম সংরক্ষণ

৪.৪.১ ডিম সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different methods of egg preservation):

ডিম সংরক্ষণ করার বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষত গ্রীষ্মকালে ডিম নষ্ট হওয়া বা পঁচে যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি। এ মৌসুমে বিশেষত মুরগির ডিম অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ডিম সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ ও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(ক) দেশীয় প্রথায় ডিম সংরক্ষণ:

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ মানুষরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ করে থাকে। যথা-

১) মাটির হাড়িতে ডিম সংরক্ষণ:

প্রথমে মাটির হাঁড়ির মধ্যে ডিম রাখা হয়। পরে হাঁড়ির অর্ধাংশ ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিমের মেয়াদ স্বল্পমেয়াদি বিধায় এটি তেমন কার্যকর পদ্ধতি নয়।

ঠান্ডায় সহজ পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঁচা মেঝেতে একটি গর্ত করা হয়। ঐ গর্তের মধ্যে বসানো হয় একটি মাটির হাঁড়ি। হাঁড়ির চারপাশে কাঠ কয়লা দিয়ে ভরাট করা হয়। প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে কাঠ কয়লা ভিজিয়ে দেয়া হয়। এতে হাঁড়ির মধ্যভাগ বেশ ঠান্ডা হয়ে যায়। ঐ হাঁড়ির মধ্যে ডিম রেখে মাটির সরা বা ঢাকনা দিয়ে হাঁড়িটি ঢেকে দেয়া হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম বেশ কিছুদিন ভালোভাবে টিকে থাকে। ফলে এটিকে ডিম সংরক্ষণের একটি মোটামুটি লাগসই প্রযুক্তি বলা যায়।

২) সিদ্ধ করে ডিম সংরক্ষণ:

ডিম সিদ্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানির মধ্যে ১৫ মিনিট ধরে ডিম সিদ্ধ করলেও তা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য রাখা যায়। গ্রামের হাট, ফেরিঘাট, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন প্রভৃতি জনবহুল স্থানে ফেরি করে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করা হয়। ১০০ টি সিদ্ধ ডিম একই দিনে বিক্রি না হলে তা পরদিন এবং প্রয়োজনবোধে আরও একদিন পর্যন্ত রেখেও বিক্রি করা হয়। এভাবে সিদ্ধ করার পর অন্তত ২ দিন পর্যন্ত ডিম ভালো অবস্থাতেই থাকে।

৩) ডিমের খোসার ছিদ্র বন্ধ করে ডিম সংরক্ষণ:

ডিমের খোসা বা উপরিভাগের আবরণে থাকে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। বাইরের গরম বাতাস এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা বের হয়ে আসে জলীয় বাষ্প আকারে। এসব ছিদ্র দিয়ে নানা ধরনের অণুজীব প্রবেশ করে ডিমকে পচিয়ে দেয় বা নষ্ট করে । এসব সূক্ষ্ম ছিদ্র খালি চোখে দৃশ্যমান নয়। তবে ডিমের এসব ছিদ্র যদি বন্ধ করা যায় তবে ডিমের ভেতরের গুনাগুণ অপরিবর্তিত থাকে।

(ক) সরিষার তেল ব্যবহার:

ডিমকে ১ মিনিট খাঁটি সরিষার তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের খোসার গায়ে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তেলে ডোবানো ডিম তুলে স্বতন্ত্র পাত্রে রেখে দিতে হয়। এভাবে রাখা ডিম বেশ কিছুদিন ভালো থাকলেও খাওয়ার সময় ডিমে সরিষার তেলের ঝাঁজ পাওয়া যেতে পারে।

(খ) মিনারেল তেল ব্যবহার:

বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন মিনারেল তেলের মধ্যে ডিম ডুবিয়ে পরে তুলে তা শুকিয়ে রাখতে হয়। এভাবে তেলে ডুবিয়ে পরে শুকানোর ফলে ডিমের মধ্যকার জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হতে পারে না। এভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল তেল নিতে হয়। একটি তারের জালের খাচার মধ্যে ভরে নিয়ে খাঁচাটিসহ মিনারেল তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর খাঁচাসহ তুলে নিতে হয়।

আজকাল আধুনিক পন্থায় ডিমের উপরে মিনারেল তেল উত্তমরূপে স্প্রে করা হয়। তারপর ঐ ডিম প্যাকেট বন্ধ করা হয়। এভাবে ডিম সংরক্ষিত থাকলেও ব্যবহৃত মিনারেল তেলে যদি কেন গন্ধ বা স্বাদ তবে তা ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে ।

(গ) চুনের পানি ব্যবহারঃ

কোথাও কোথাও চুনের পানির মধ্যে ডিম ডুবিয়ে রেখে পরে তা সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে চুনের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। এভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রথমে একটি পাত্রে ১ লিটার পানি নিতে হয়। পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ ভালোভাবে গুলে তারপর গরম করতে হয়। লবণ মেশানো পানি চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হয়। ঐ পানি ঠান্ডা হওয়ার পর তার মধ্যে ২৫০ গ্রাম চুন উত্তমরূপে গুলে নিতে হয়। এরপর পাত্রটি ১ দিন রেখে দিতে হয়। পাত্রের নিচে তলানি জমে। ওপরের পরিষ্কার পানি আরেকটি পাত্রে এমনভাবে ঢেলে নিতে হয় যাতে নিচের তলানি নড়ে না যায়। এরপর ঐ পরিষ্কার পানির মধ্যে তারের খাঁচাসহ ডিম ডুবিয়ে দিতে হয়। খাঁচাসহ ডিম তুলে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে দিলে ডিম শুকিয়ে যায়। ডিম সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সহজ উত্তম পদ্ধতি।

(ঘ) সোডিয়াম সিলিকেটের সাহায্যেঃ

এ পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তা গরম করে পরে আবার ঠান্ডা করতে হয়। পানি ঠান্ডা হলে ৯:১ অনুপাতে ঠান্ডা পানি ও সোডিয়াম সিলিকেট একত্রে মেশাতে হয়। তারের খাঁচাসহ ডিম ঐ সিলিকেট পানির মধ্যে ২০ মিনিট কাল ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরপর খাঁচা তুলে নিয়ে ছাঁয়ায় রাখলে ডিম শুকিয়ে যায়। ডিমের গায়ে সিলিকেট পানি শুকিয়ে গেলে ডিমের গায়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। শুকানোর পর ডিম প্যাকেটজাত করে কোনো ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়। তবে ডিমের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করে সংরক্ষণ করার ফলে এসব ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো যায় না।

ডিম সংরক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ তথ্যঃ

ডিম যদি ফেটে যায় বা ডিমের গায়ে যদি ময়লা থাকে তবে তা সংরক্ষণ করা যায় না। ডিমের খোসার গায়ে লেগে থাকা ময়লা নরম ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হয়। সামান্য কুসুম গরম পানিতে তুলা, স্পঞ্জ বা কাপড়ের টুকরা ভিজিয়ে তা দিয়ে ডিমের গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা যায়।

কোনো অবস্থাতেই ডিম পরিষ্কার করার জন্য ঠান্ডা পানি বা কোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না। রসুন, পেঁয়াজ বা গন্ধযুক্ত অন্য কোনো দ্রব্যের পাশে ডিম রাখা অনুচিত। কারণ গন্ধ খুব সহজেই এবং দ্রুত ডিমের মধ্যে শোষিত হয়।

তাত্ত্বিক কাজঃ

- চুনের পানিতে ডিম সংরক্ষণে চুন ও পানির অনুপাত -
- সোডিয়াম সিলিকেট দিয়ে ডিম সংরক্ষণে সোডিয়াম সিলিকেট ও পানির অনুপাত-

(খ) উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ(Preserve eggs in an improved manner):

১) হিমাগারে সংরক্ষণ:

বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম হিমাগারে ১ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে তাপমাত্রা রাখা হয় ১২° সেলসিয়াস। খাবার খাবার ডিম সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রাখতে হয় যথাক্রমে ০-৩° সেলসিয়াস ও ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

২) গভীর হিমায়িত ডিম:

এ পদ্ধতিতে ডিম ভেঙে ভেতরের কুসুম ও সাদা অংশ ০° সেলসিয়াস বা তার চেয়েও কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বেকারি, কনফেকশনারি এবং ন্যুডলস্ তৈরির কারখানায় ব্যবহারের জন্য এভাবে ডিম সংরক্ষণ করা হয়।

৩) শুকনো ডিম:

ডিম শুকানোর পদ্ধতিসমূহ:

(ক) ডিম ভেঙে ভেতরের তরল কুসুম ও সাদা অংশ "ক্ল্যারিফায়ার" যন্ত্রের মধ্যে দেয়া হয়।

(খ) ছাকনির সাহায্যে ডিমের চ্যালাজা এবং ভাইটিলিন পর্দাসমূহ আলাদা করে ফেলা হয়।

(গ) তারপর ৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উষ্ণ বাতাস ডিমের জলীয় অংশ শোষণ করে নেয় এবং ডিম গুঁড়া পাউডার হয়ে যায়।

এভাবে শুকানো পাউডারকৃত গুঁড়া ডিম অবিলম্বে প্যাকেটবন্ধি ও সীলমোহর করতে হয়। বাতাসে কিছুক্ষণ থাকলে ও ডিম বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। অনেক সময় ডিমের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্যাকেটে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হলে তা ডিমের মধ্যে অণুজীবের প্রবেশ এবং বংশ বিস্তার রোধ করে । প্যাকেটজাত গুঁড়ায় ২% এর অধিক আর্দ্রতা থাকা অনুচিত।

৪.৪.২ ডিম প্যাকেজিং পদ্ধতি (Egg packaging method):

- ডিমের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য ডিমের যথাযথ প্যাকেজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিম পরিবহনের ক্ষেত্রেও যেমন প্যাকেজিং দরকার, আবার ডিম বিপণনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংখ্যক ডিম প্যাকেট করা হয়ে থাকে।
- ডিম পরিবহনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের এগ ট্রে তে ডিম সাজিয়ে ডিমের ক্রেটে ভরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। বাঁশের ঝুড়িতে প্যাক করে ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের আড়তে ডিম আনা হয়।
- যদি বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যায় সুপার মার্কেটগুলোতে মোটা কাগজের বা প্লাস্টিকের ট্রেতে ১২ টা বা ৬ টা ডিম পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে

বিক্রি করা হয়। অনেক সময় পলিথিনের পরিবর্তে কাগজের প্যাকেটের মধ্যে কাগজের ট্রেতে ডিম বসিয়ে বিক্রি করা হয়। তবে খুচরা দোকান থেকে ডিম কিনতে গেলে কাগজের প্যাকেট বা পলিথিনের ব্যাগে ভরে ডিম সরবরাহ করা হয়।

৪.৪.৩ ডিমের পরিবহন (Egg transport):

দূরের বড় বাজারে ডিম পাঠাতে হলে যত্ন ও সতর্কতার সাথে প্রেরণ করতে হবে। না হলে ডিম ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে ডিম পরিবহন করে নিয়ে আসা হয় । ৩ টি পদ্ধতিতে সাধারণত ডিম পরিবহন করা হয়। যথাঃ-

ক) বাঁশের ঝুড়িতে ডিম পরিবহন:

এ পদ্ধতিতে তলা চ্যাপ্টা বাঁশের ঝুড়িতে ডিম পরিবহন করা হয়। ঝুড়ির তলাতে ২ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর তুষ বা কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে ডিম সাজাতে হয়। এর উপর আবার তুষ বিছিয়ে আবার ডিম বসানো হয় এভাবে কয়েক স্তরে ডিম সাজানো যায়। সর্ব উপরে খড়ের টুকরা দিয়ে মুখ চট দিয়ে সেলাই করতে হয়।

খ) প্লাস্টিকের ট্রেতে ডিম পরিবহন:

বর্তমানে প্লাস্টিকের তৈরি ট্রেতে নিরাপদে ডিম বসিয়ে পরিবহণ করা হচ্ছে। ১টি ট্রেতে ৩০ টি ডিম বাসানো যায়। এভাবে ২০ টি ট্রে আবার ১ টি ডিমের ক্রেটে ভরা যায়। এভাবে ক্রেট ভর্তি ডিম সহজেই রিকশা ভ্যানে, পিক আপে, ট্রাকে, বাসে, ট্রেনে, নৌকায়, সাইকেলে করেও ডিম পরিবহন করা যায়। এতে ডিম রাখার জন্য পৃথক খোপ থাকে বিধায় ডিমগুলি পরস্পর ঠোকাঠুকি খায় না।

গ) কাঠের বাক্সে ডিম পরিবহন:

হালকা ও কম দামি কাঠ দিয়ে বাক্স তৈরি করে ডিম পরিবহণ করা যায়। বাক্সের তলায় খড়ের টুকরো বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কাঠের গুঁড়া বা তুষ বিছিয়ে স্তরে স্তরে ডিম সাজাতে হবে। এরপর বাক্সের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে ডিম শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাক্সের গায়ে "সাবধান, ডিম আছে" কথাটি লিখে দেয়া ভালো।

৪.৪.৪ ডিম বিপণন (Egg marketing):

দেশে অধিকাংশ ডিম গ্রামের কৃষকের বাড়িতে উৎপন্ন হয়। কৃষক সাধারণত সাপ্তাহিক হাটে বা বাজারে বিক্রি করে । আবার ফেরিওয়ালা সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং হাট থেকে ডিম সংগ্রহ করে পাইকারদের নিকট বিক্রি করে । পাইকার খুচরা বিক্রেতা (স্থানীয়ভাবে) অথবা বড় শহরের আড়তদারের নিকট ডিম বিক্রি করে ।

তবে মাঝারী ও বড় খামারিদের নিকট থেকে ভোক্তা পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে ডিম পৌছায়:

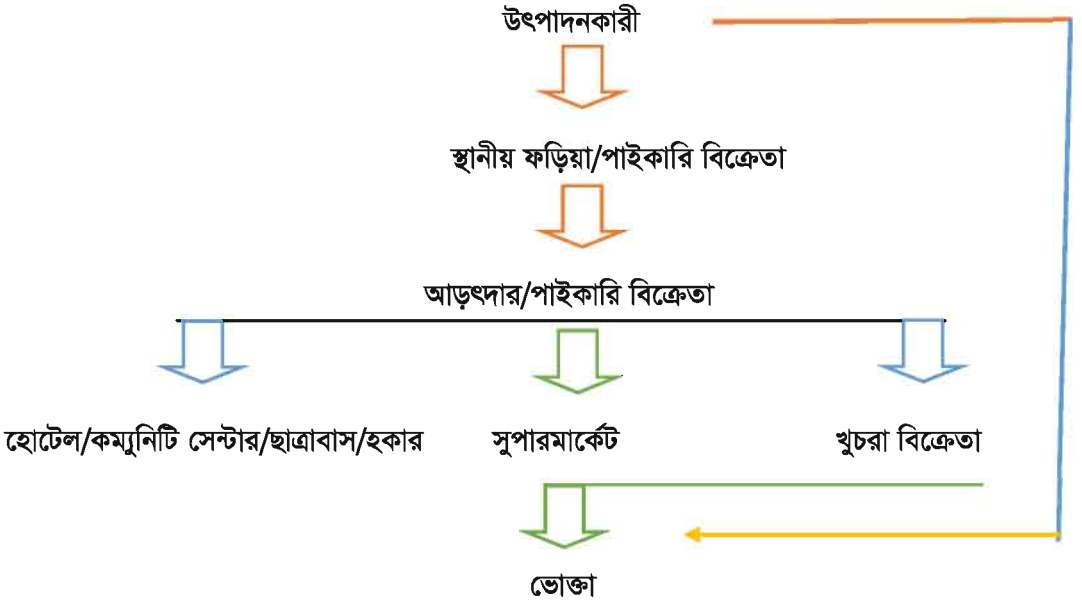

চিত্র: ৪.৯ ডিম বিপণনের চ্যানেল

তবে ডিম বিপণনের প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী অনুপস্থিত থাকলে উৎপাদানকারীগণ ন্যায্যমূল্য পাবে ও ভোক্তা সঠিক মূল্যে ডিম ক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ধারণা চালু করলে খামারিগণ উপকৃত হবে।

জব ০৬ ঃ ফোটানোর জন্য ডিম বাছাই ও সংরক্ষণ

পারদর্শিতার মানদণ্ডঃ

- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও টুলস নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- ডিমের আকৃতি, খোসার রং ও মসৃণতা, ফাটা, ময়লাযুক্ততা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হ্যাচিং ডিম বাছাই করা
- সংরক্ষণাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ ডিম সংরক্ষণ করা
- সংরক্ষণের সময় ডিমের মোটা অংশ উপর দিকে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	এগ ক্যান্ডলার	ইলেক্ট্রিক	১টি
২	রেফ্রিজারেটর	প্রয়োজনানুসারে	১টি
৩	থার্মোমিটার	সেলসিয়াস(সায়েন্টিফিক)	১টি
৪	হাইগ্রোমিটার	ডিজিটাল	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	উর্বর ডিম	মধ্যম আকার-আকৃতির	৩০টি
২	এগ ট্রে	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৩	পেন্সিল/মার্কার	ভালো মানের	১টি করে

ক) ফুটানোর ডিম বাছাই

কাজের ধারা:

১. একটি ট্রেতে ফোটানোর জন্য কিছু উর্বর ডিম নাও।
২. এগ সর্টিং মেশিনের মাধ্যমে অপরিষ্কার ও ভাঙ্গা ডিম গুলি পৃথক করো।
৩. এরপর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করে ডিম বাছাই করে ট্রেতে সংরক্ষণ করো।

চিত্রঃ ৪.১০ বাছাই কৃত ফোটানো ডিম

- **ওজনঃ** ফুটানোর ডিমের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম হতে হবে ।
- **আকারঃ** মাঝারী আকারের হতে হবে ।
- **আকৃতিঃ** ডিম্বাকৃতি হতে হবে ।
- **বর্ণ / রংঃ** জাত অনুসারে স্বাভাবিক বর্ণের হতে হবে ।
- **খোসার দৃঢ়তাঃ** খোসা খুব শক্ত বা ভঙ্গুর হবে না ।
- **খোসার গঠনঃ** খোসা মসৃন হবে ।
- **ডিমের বয়সঃ** ৩-৭ দিন হবে ।
- ডিমের খোসায় রক্তের দাগ থাকা যাবে না ।
- ৩দিনের বেশী বয়সী ডিম বাদ দাও।
- ফাটা দাগ থাকলে তা বাদ দাও।
- মোরগ-মুরগির অনুপাত ঠিক ছিল কিনা তা জেনে নাও।

উর্বর ও অনুর্বর ডিম গুলো চিহ্নিত করে পৃথক করে রাখ।

খ) ফুটানোর ডিম সংরক্ষণ

কাজের ধারা:

১. সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফুটানোর ডিম সংগ্রহ করো ও ঝুড়িতে রাখ।
২. ডিমগুলো পরিষ্কার করে ট্রেতে রাখ।
৩. ডিমের ট্রে গুলোতে মার্কিং করে লেবেল লাগাও।(জাত ও তারিখ)
৪. ডিমসহ ট্রে গুলো ১২ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ও ৬০% আর্দ্রতায় হিমাগারে বা রেফ্রিজারেটরের সাধারণ অংশে সংরক্ষণ করো। এভাবে ডিম ৭ থেকে ১০ দিন সংরক্ষণ করে রাখতে পার।

২০২৩

চিত্র: ৪.১১ হিমাগারে ডিম সংরক্ষণ

সতর্কতা:

১) ডিমের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।

২) ডিম ঝাঁকানো যাবে না এতে ডিম নষ্ট হয়।

৩) সংরক্ষণ কক্ষের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

জব ০৭ ঃ ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও টুলস নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- ডিমের আকৃতি, খোসার রং ও মসৃণতা, ফাটা, ময়লাযুক্ততা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হ্যাচিং ডিম বাছাই করা
- ইনকিউবেটর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- বাছাইকৃত ডিম ইনকিউবেটরে বসানো
- ইনকিউবেটর নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতায় ও ডিম টার্নিং পর্যবেক্ষণ করা
- ডিম সেটিং ট্রে হতে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর ও পিপিং পর্যবেক্ষণ করা
- ডিম ফোটার পর বাচ্চা ইনকিউবেটর থেকে নামানো ও বাছাই করে প্যাকেজিং করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১টি
২	জুতা	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ সেট
৩	মাস্ক	-	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	ইনকিউবেটর	১০০ ডিম ধারনক্ষমতা সম্পন্ন	১টি
২	এগ ক্যান্ডলার	মাঝারী	১টি
৩	থার্মোমিটার	সেলসিয়াস(সায়েন্টিফিক)	১টি
৪	হাইগ্রোমিটার	ডিজিটাল	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল(Raw Materials)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	উর্বর ডিম	মধ্যম আকার ,আকৃতির	৩০টি
২	এগ ট্রে	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
৩	পেন্সিল	ভালো মানের	১টি করে
৪	রেকর্ডশীট	তথ্য সম্বলিত	১টি

(খ) কাজের ধারা:

১. ইনকিউবেটরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে দেখ তা সঠিকভাবে কার্যকর আছে কি না।

২. নির্ভরযোগ্য উৎস হতে উর্বর ডিম সংগ্রহ কর এবং যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করো।

৩. ডিমগুলো পরিস্কার করে নাও।

৪. সঠিক আকার ও আকৃতির ডিম বাছাই করো।

৫. ফাটা, ভাঙ্গা, রক্তের দাগ, মেঝেতে পাড়ে এমন ডিম গুলি বাদ দাও।

৬. ইনকিউবেটরটি ফিউমিগেশনের মাধ্যমে জীবাণু মুক্ত করো।

৭. ধারণ ক্ষমতা অনুসারে ইনকিউবেটরের সেটারে ডিম বসাও। খেয়াল রাখ যেন ডিম ফেটে না যায়।

৮.এবার ফিউমিগেশনের সাহায্যে ডিম জীবাণু মুক্ত করো।

চিত্র: ৪.১২ কৃত্রিম ইনকিউবেটরের সাহায্যে মুরগির ডিম ফুটানো

৯. ইনকিউবেটরটি চালু করে তাপমাত্রা (১০১°ফা.), আদ্রর্তা (৬৫%), টার্নিং ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর এবং রেকর্ডশীটে লিপিবদ্ধ করো।

১০. ৭ম ও ১৪তম দিনে ডিমগুলি ক্যান্ডেলারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে নষ্ট ডিমগুলি বাদ দাও।

১১. এরপর ১৮তম দিনে ডিমগুলি সেটিং ট্রে হতে হ্যাচিং ট্রে তে স্থানান্তরিত কর। (মুরগির ডিমের ক্ষেত্রে)

১২. হ্যাচিং পিরিয়ডে কাঙ্খিত তাপ ও আর্দ্রতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কর, যাতে ডিম ফুটতে কোন সমস্যা না হয়। কারণ এই সময় তাপমাত্রা সামান্য কম (৯৯° ফা.) এবং আর্দ্রতা বেশী (৭৫%) প্রয়োজন হয়।

১৩. সঠিকভাবে তাপ, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং টার্নিং করলে ২০তম দিনের পর হতে পিপিং দেখা যাবে এবং ২১দিন হবে বাচ্চা ফুটা শুরু করবে।

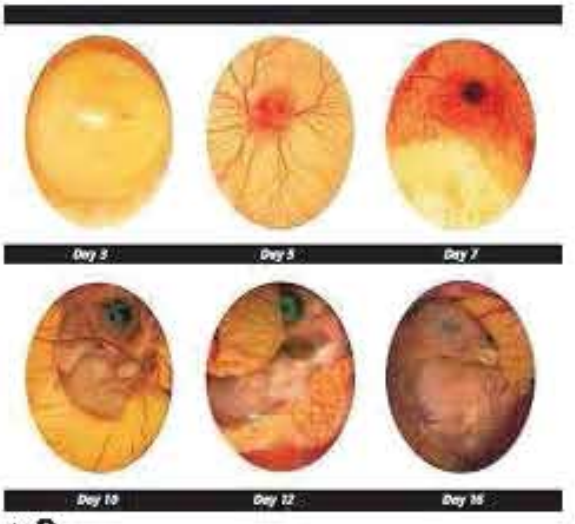

চিত্র: ৪.১৩ ডিম ক্যান্ডলিং

১৪. বাচ্চা ফুটানোর পর ইনকিউবেটরে আরো ১২ ঘন্টা রেখে দাও, যাতে বাচ্চার ডেনা পালক শুকিয়ে যায়।

১৫. এরপর বাচ্চাগুলি বাছাই কর (সেক্সারের ক্ষেত্রে সেক্স অনুসারে) এবং ভাল বাচ্চাগুলি প্যাক করে বাজারজাত করো।

সতর্কতা:

- ডিম বসানোর পূর্বে ইনকিউবেটরটি চালু করে কার্যকারিতা অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।
- সঠিকভাবে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও টার্নিং হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- হ্যাচিং ট্রেতে বাচ্চা স্থানান্তরের পর অবশ্যই টার্নিং বন্ধ করতে হবে এবং তাপমাত্রা কমিয়ে আর্দ্রতা বাড়াতে হবে।

ব্যবহারিক কাজ:

- ইনকিউবেটরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও টার্নিং নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ।
- সেটিং ট্রেতে ডিম কিভাবে বসানো অনুশীলন।
- পিপিং পর্যবেক্ষণ।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার ঘরে একক ডিম পাড়া বাক্সের পরিমাপ কত?
২. ডিম পাড়া বাসা স্থাপনের কৌশল কী?
3. ডিম সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
৪. ডিম সংরক্ষণে পানি ও সোডিয়াম সিলিকেটের অনুপাত কত?
৫. উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো কী কী?
৬. হিমাগারে ডিম সংরক্ষণে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কত?
৭. অস্বাভাবিক ডিম কত প্রকার?
৮. ডিম পাড়ার শুরুর কত দিন আগে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হবে?
৯. দলভিত্তিক বাক্সের পরিমাপ কত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১.মেঝেতে ডিম পাড়ার কারণসমূহ কী কী?
২.ডিম পাড়া বাক্স কত প্রকার ও কী কী?
৩.একক বাক্সের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১.খাঁচা হতে ডিম সংগ্রহের কৌশল বর্ণনা করো।
২.ডিম উৎপাদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ কী কী, বর্ণনা করো।
৩. ডিম পরিবহনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করো।
৪. শুকানো পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ ব্যবস্থা লেখ।

=== সমাপ্ত ===

তথ্য উৎস

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক
১	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১	মো: মাহবুবুর রশীদ
২	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২	মো: মাহবুবুর রশীদ
৩	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১	ড: এ এইচ এম মোস্তফা
৪	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২	ড: এ এইচ এম মোস্তফা
৫	ষ্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটি শীট- নবম শ্রেণী	মো: জহুরুল ইসলাম
৬	ষ্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটি শীট- দশম শ্রেণী	মো: জহুরুল ইসলাম
৭	গৃহপালিত পাখির রোগ ও প্রতিকার(বি এ ই)	ড: আ ন ম আমিনুর রহমান
৮	গৃহপালিত পাখির পালনও হ্যাচারী ব্যাবস্থাপনা	প্রফেসর ড:এস এম বুলবুল
৯	আধুনিক পদ্ধতিতে লাভজনক হাঁস-মুরগি পালন	ড: মাহবুব মোস্তফা
১০	পশুপালন ও পশুচিকিৎসা	ডা: নীলোৎপল ঘোষ
১১	গৃহপালিত পশু পাখির চিকিৎসা	ড: মো: জালাল উদ্দিন সরকার
১২	গৃহপালিত পাখির পালন	ড: মো: মোফাচ্ছের
১৩	আধুনিকহাঁস-মুরগি পালন শিক্ষা	সুভাষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪	মাছ,পশু,পাখি ও কৃষি গাইড	সিরাজুল করিম
১৫	সহজ উপায়ে হাঁস-মুরগি পোল্ট্রি	কৃষিবিদ কামাল হোসেন
১৬	হাঁস-মুরগি -কবুতর-কোয়েল পালন ও চিকিৎসা	আবদুল্লাহ্ আল-মামুন
১৭	পোল্ট্রি পালন ওচিকিৎসাবিদ্যা	ড: এম এ সামাদ
১৮	হাঁস-মুরগি -কোয়েল পালন	ড: সাহাবদ্দিন খান
১৯	ব্রয়লার মুরগি পালন চিকিৎসা ও মাংস বৃদ্ধি উপায়	ড: মো: আখতার হোসেন চৌধুরী
২০	পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা	মো: আবদুর রাজ্জাক মিয়া
২১	হাঁস-মুরগি -পালন ওচিকিৎসা	প্রভাসচন্দ্র দাস
২২	কোয়েল পালন	
২৩	আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন	মিজানুর রহমান
২৪	কৃষিশিক্ষা (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) প্রথম পত্র	ড. মো: আনিছুর রহমান
২৫	কৃষিশিক্ষা (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী)দ্বিতীয় পত্র	ড. মো: আনিছুর রহমান
২৬	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১	মুহাম্মদ কামরুল হাসান ভূঞা
২৭	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-২	মুহাম্মদ কামরুল হাসান ভূঞা

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেড (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। ইপিজেড স্থাপনের ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগসহ দক্ষ জনবল সৃষ্টি হয়েছে, বিনিয়োগে বৈচিত্র্য এসেছে এবং নতুন প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে ৮টি ইপিজেড এ বিনিয়োগকারিদের জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে তৈরি পোশাকশিল্প, বস্ত্র ও বুননশিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, প্যাকেজিং ও পানীয় তৈরির কারখানাসহ বিভিন্ন প্রকার ভারী এবং মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য